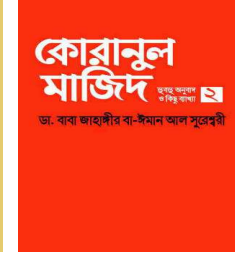
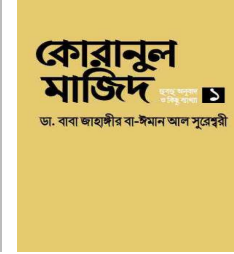
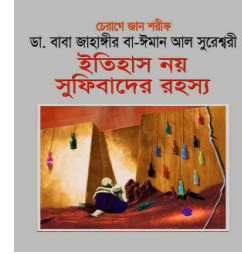
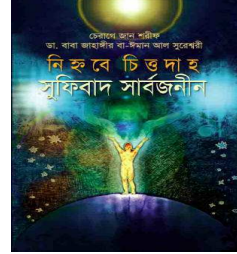
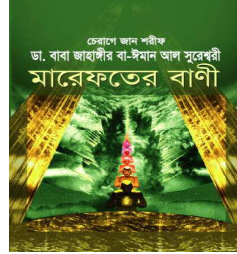
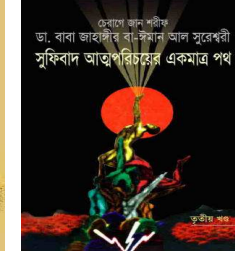
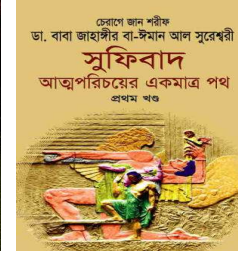
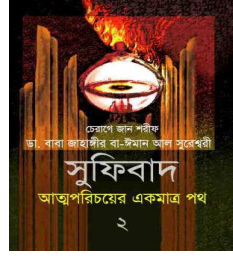
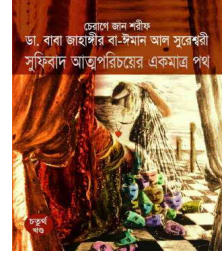
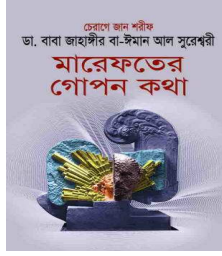




চেরাণে জ্ঞান শরীফ
ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-জ্ঞান আল-সুরেশ্বরী

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইমান আল-সুরেশ্বরী রচিত গ্রন্থাবলি



১. মারেফতের গোপন কথা
২. মারেফতের বাণী
৩. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ১ম খণ্ড
৪. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ২য় খণ্ড
৫. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ৩য় খণ্ড
৬. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ৪র্থ খণ্ড
৭. ইতিহাস নয় সুফিবাদের রহস্য
৮. নিহবে চিত্তদাহ : সুফিবাদ সার্বজনীন
৯. কোরআনুল মাজিদের বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদ- ১ম খণ্ড



সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ
(২য় খণ্ড)

সুফিবাদ প্রকাশনালয়
 প্রযত্নে : বে-ঈমান হোমিও হল
 ১০৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (২য় তলা) ঢাকা-১২০৫
 ফোন : ০১৭১১১২৮১৬৯

প্রকাশক : নাহিদ শামসেত্তারীজ
 বেদম ওয়ারসী
 তামান্নী সানাই
 (সুফিবাদ প্রকাশনালয়-এর পক্ষে)
 গ্রাম : চুনকুটিয়া, ডাক : শুভাঢ্যা
 থানা : কেরানীগঞ্জ, জেলা : ঢাকা
 ফোন : ০১৭১১১২৮১৬৯

উৎসর্গ

মাওলাউল আলা বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর কন্যা আরাফাকে, যিনি সুরেশ্বরীর নয়নের মণি ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক উচ্চ আসনে যাঁর স্থান। যিনি অধম লেখকের বড় মা, যিনি অধম লেখককে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁর পাদুকা স্নোবারক আম্মাকে উপহার দিয়েছিলেন। যিনি চোখের জলে আম্মাকে বলতেন, ‘আম্মার বাবার (স্বয়ং সুরেশ্বরীর) মুরিদানেরা কেউ আম্মাকে কাঁদাতে পারে নি। আম্মার স্বামী পীরে কামেল শাহেনশাহে ওলি শাহ সুফি সাইয়েদ গোলাম মাওলা চিশতি ওরফে শামপুরী শাহ সাহেবের মুরিদেরাও আম্মাকে কাঁদাতে পারে নি। কেবলই তুই, জাহাঙ্গীর, আম্মাকে বার বার কাঁদিয়ে গেলি। আমি তোকে ভালবাসি। সুতরাং আম্মার মনে হয়, আম্মার বাবাও তোকে ভালবাসেন।’

গুনেছি এই সুফি জগতে বলতে গেলে একজন মুরিদই তাঁর আপন পীরকে সবচেয়ে বেশি কাঁদিয়েছিলেন। সেই মুরিদের নাম হজরত আম্মির খসরু এবং তাঁর পীরের নাম মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়া।

পীরের প্রেমে মুরিদ কাঁদে, এটাই আম্মরা জানি। কিন্তু মুরিদের জন্যও যে পীর কাঁদে এটা কি একটা অবাক করা কথা নয়? সেই প্রাণপ্রিয় পরম শ্রদ্ধেয়া পরম পূজনীয়া বড় মা-র কদম স্নোবারকে এবং দাদুদের তথা বড় দাদু শাহ সুফি ডা. সাইয়েদ গোলাম মোনায়েম হোসায়নী চিশতি ওরফে

শরীফ, স্বেচ্ছ দাদু শাহ সুফি সাইয়েদ গোলাম মোকতাদের হোসায়নী চিশতি ওরফে ফারুক, স্বেচ্ছ দাদু শাহ সুফি সাইয়েদ গোলাম মুরছালিন হোসায়নী চিশতি ওরফে আবরার, চতুর্থ দাদু শাহ সুফি সাইয়েদ গোলাম মোছাব্বির হোসায়নী চিশতি ওরফে আসরার (সোনাদাদা)। প্রত্যেক দাদুই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তবে চতুর্থ দাদু, বড় মা আমাকে যে রকম স্নেহ করতেন অনেকটা সে রকম না হলেও কাছাকাছি বলতে চাই। কারণ সোনাদাদুর ফারসি ভাষার উপর যে দখল আছে আমি তার ধারে- কাছেও নাই। তাঁহাদের কদম মোবারকে আমার এই অতি নগণ্য লিখনী উৎসর্গ করে গেলাম।

মা গো! একটি মাত্র পুত্রসন্তান আমি, অধম লিখক। আর সাতটি বোন। কেরানীগঞ্জ উপজেলার মুসলমান মেয়েদের মধ্যে ১৯২৭ সালের প্রথম ম্যাট্রিক তুমি। নানু ভাই আবদুর রাজ্জাক শৈশবে পাখি শিকার করার সময়ে মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য মাটিতে নামিয়েছিলেন : তুমি, মা, নানু ভাইয়ের সঙ্গে তিনদিন কথা বলো নি। ক্লান্ত চাইবার পর নানু ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলে। সেই পুত্র সন্তানটি এই অধম লিখক। হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন তোমার ছবিটুকু দেখে পাঠকেরা ধন্য ধন্য করবে।

একটি ঘোষণা

যে কেহ এই বইটি ছাপাইয়া যে কোনো দামে বিক্রি অথবা প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে লিখক ও প্রকাশকের পক্ষ হইতে কোনো প্রকার আপত্তি রহিল না এবং থাকিবেও না। কারণ, এই বইটির মালিকানা লিখক নিজ হইতে সজ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো দেশের মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্য যে কোনো ধর্মের অনুসারীদেরকে সমানভাবে অধিকার দিবার প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া গেলেন। তা ছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যে কোনো সাময়িকীতে এই বইয়ের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক লেখকের নামে অথবা যে কোনো কারো নামে ধারাবাহিকভাবে ছাপাইতে পারিবেন। এতে লেখকের বা প্রকাশকের কোনো প্রকার আপত্তি থাকিবে না। যদি কেহ কোনোদিন বইটির মালিকানার মিথ্যা দাবি তোলেন, তাহা হইলে সেই মিথ্যা দাবি সর্বস্থানে, সর্বআদালতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আরও উল্লেখ থাকে যে, এই বইটি পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপিতে পারিবেন।

যাঁকে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে সব সময় মনে করি

প্রথমেই আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি পরম পূজনীয় শাহ সুফি সৈয়দ সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীকে, যিনি আমার আপন মেরু চাচা। আমি

বাল্যকালে আমার জন্মদাতা, কেরানীগঞ্জ উপজেলার প্রথম এমএ, বি টি হেলাল উদ্দিন আহমদকে আজ হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে হারিয়েছি। সুফিবাদের উপর ধ্যানধারণার উৎসাহটি পেয়েছি এবং হাঁটি হাঁটি পায়ে সুফিবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছি যার কারণে, তিনি আমার জগৎগুরু আপন চাচা শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী।

আমার একটি খারাপ অভ্যাস ছিল, আর সেই খারাপ অভ্যাসটি হলো, প্রতিদিন দশ-পনের ঘণ্টা লেখাপড়া করতাম। এই জন্য আমাকে আমার বন্ধুরা বইয়ের পোকাও বলত। আমি প্রচণ্ডভাবে নিরপেক্ষ একজন মানুষ। সত্যসন্ধানের পথে কোনো মতবাদের সাইনবোর্ড আমার কাঁধে তুলতে দেই নাই। তবে যুক্তির পেছনেও যে অনেক বোবা যুক্তি দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে, সেটা বিশেষ রহস্য ছাড়া জানা যায় না। ইহুদি ধর্মের মোল্লা-মুফতিরা যিশুকে শুলীতে চড়িয়ে বলেছিল যে, আমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি মৃতকে জীবিত করতে পারো; কিন্তু এবার আমরা তোমাকে শুলীতে চড়িয়েছি এবং আমাদের এই শুলী হতে যদি বেরিয়ে আসতে পারো তবেই ধরে নিব তুমি সত্য নবি। কিন্তু যিশু সেই শুলী হতে বেরিয়ে আসেন নি। এই যুক্তিটিতে যুক্তি আছে বটে, কিন্তু সত্যটি নাই। কেন নাই? যদি সত্যিই যিশু সেই শুলী হতে বেরিয়ে আসতেন তা হলে সবাই মুসলমান হয়ে যেত এবং সবাই মুসলমান হয়ে গেলে আল্লাহপাকের ‘তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছি’- কথাটির সৌন্দর্য আর থাকে না। অথচ যুক্তির

কথাগুলোর বাঁধন বড় শক্ত। এবং এই যুক্তির শক্ত বাঁধনের ফাঁদে পড়ে অনেকেই ইম্মান হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু এই শক্ত যুক্তির ভেতরে যে বিন্দুমাত্র সত্য নাই, বরং যুক্তির ভুগভুগি বাজিয়ে, যুক্তির ভেলকিবাজি দেখিয়ে, যুক্তির জাদু দেখিয়ে হিপনোটাইজ করে ফেলে। পূর্বজন্মের কর্মফলের উপর ভিত্তি করেই তকদিরটি দাঁড়িয়ে আছে। এই তকদির যে স্থানের উপযুক্ত সেখানেই নিয়ে যাবে। এটাই তকদিরে মোবরাম তথা যে তকদিরের আর বদল হয় না।

শাহ সুফি সৈয়দ সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীর মতো একজন ইসলাম গবেষক এবং গুরু এই পৃথিবীতে কমই পাওয়া যায়। তাঁর রচিত কোরান-এর তফসির তিন খণ্ডে বাজারে পাওয়া যায়। তফসিরটির নাম দিয়েছেন কোরান দর্শন। কত গভীর চিন্তার প্রতিফলন ঘটতে পারে তারই এক বিস্ময়কর নিদর্শন হলো এই রচনা। আমি অধম তাঁর মুরিদ হই নাই সত্য, কিন্তু উনিই আমার প্রথম শিক্ষাগুরু। শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ১৯১৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ কাজিম উদ্দিন চিশতী এবং মাতা বেগম ইয়ারননেছা। উনি পর্দা গ্রহণ করেন তথা ইত্তেকাল করেন ২০০৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। আমরা অনেকেই জানি, মহানবির আবির্ভাব ও পর্দাগ্রহণ ১২ রবিউল আউয়াল। মাওলাউল আলা বাবা সৈয়দ জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর জন্ম ও ওফাত দিবসটি ২ অগ্রহায়ণ। আমরা জানি, বেগম রোকেয়ার জন্ম এবং

মৃত্যুদিবসটি ৯ ডিসেম্বর। কিন্তু চোখের সামনে বাস্তবে দেখতে পেলাম, একই দিনে জন্ম এবং মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে গেল শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীর জীবনে।

একটি আবেদন

আমরা মোরাকাবা-মোশাহেদার তথা ধ্যানসাধনার একটি স্কুল খুলেছি নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের নৌকাঘাটা গ্রামে। সম্ভবত বাংলাদেশের কোনো পীর-ফকির এ রকম একটি স্কুল খোলেন নি। আপনাদের, বিশেষ করে সুফিবাদে বিশ্বাসীদের নিকট আর্থিক সাহায্য কামনা করি।

কোরান অনুবাদ প্রসঙ্গে

সর্বপ্রথম আমরা বিশাল ৯০ খণ্ডের কোরান তফসিরটির আগে হুবহু অনুবাদটি এই জন্য প্রকাশ করতে চাই যে, আপনারা কোরান-এর আর দশটি অন্যান্য অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, দেখতে পাবেন অনুবাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমরা এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে চেষ্টা করছি যে, কিছুতেই মনগড়া অনুবাদ করব না। যা কোরান-এ আছে তা হুবহু তুলে ধরে পাঠক সমাজকে দেখিয়ে দিতে চাই যে, কোরান-এর অনুবাদেই কত গরমিল! এই জন্য যতটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভব সেইটুকু প্রচেষ্টা। অনেক অর্থব্যয়ে পৃথিবী বিখ্যাত আরবি ডিকশনারি এবং কোরান-এর লোগাতসমূহ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। যেমন- জে বি

হাবা, হেন্স ওয়েরি, মিলটন, স্টিফিংগাস এবং রহি বালবাকি প্রণীত আরবি ডিকশনারিগুলি পর্যন্ত কাছে রেখে খুব সাবধানে অনুবাদ করেছি। তারই নমুনা হিসাবে সফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ-এর দ্বিতীয় খণ্ডে একটি মাত্র কোরান-এর সূরা নজমের অনুবাদ তলে ধরার পর অনেকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। যদি আপনারা মনে করেন যে, এ রকম একটি কোরান-এর অনুবাদ-গ্রন্থের খুবই প্রয়োজন তা হলে আমাদেরকে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করতে পারেন অথবা কোরবানির পণ্ডর চামড়ার মূল্যটি সদকারুপে দান করতে পারেন।

লেখকের কিংবদন্তিতুল্য অপর রচনাটি হলো কোরানুল কারিম-এর শব্দভিত্তিক অনুবাদ ও তফসির তাফসীরে কুরআনুল কারিম আততাতফহীম আল আসরী আল মুনাব্বার আল আসসালি উলুম আল জাদীদ ওয়া আল ফালসাফা আল ইসলামিয়া মিন মুফাস্সেরে জামান-

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল-সুরেশ্বরী

৯০ (নব্বই) খণ্ডে সমাপ্ত
(পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কোরান-এর তফসির)
[বি. দ্র. আর্থিক সাহায্য ছাড়া একার পক্ষে ছাপানো অসম্ভব।]

সূচি

| | |
|---|-----|
| আমি স্মরণ করি / | ৪৩ |
| যাবা সাধনায় আল্লাহ তাদের প্রতি অনুরোধ / | ৫০ |
| সুফিবাদের সর্বশেষ দর্শন / | ৫১ |
| পীরপুজাই আল্লাহর পুজা : সুফিবাদের সর্বোচ্চ দর্শনটি হজরত আমির খসরুর এই কালামে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে / | ৫২ |
| সাহায্যের আবেদন / | ৫৩ |
| কোরান অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা / | ৫৬ |
| সুরা নজমের অনুবাদ / | ৫৮ |
| সুরা তোয়াহা / | ৬৫ |
| নফস ও রুহের পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা / | ৯০ |
| মাখার জ্ঞান ও সিনার জ্ঞানের পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা / | ৯৮ |
| পীর কি এবং পীর ধরা কেন প্রয়োজন / | ১০৬ |
| অনুষ্ঠান কখনও ধর্ম নহে / | ১১০ |
| প্রারিতপ্ত আত্মার জ্ঞানাতলাভ সম্পর্কে আলোচনা / | ১১৬ |
| ইমানের ধারক বাহক কারা? / | ১১৮ |
| ভক্তি ও ভক্তির প্রকারভেদ / | ১২০ |
| বস্তুর বিজ্ঞান ও আত্মার বিজ্ঞানের স্বরূপ / | ১২৩ |
| শয়তানের অবস্থান কোথায় এবং কাভাবে? / | ১২৫ |
| আত্মপরিচয়ের জন্য সাধনপদ্ধতির স্বরূপ / | ১২৯ |
| পবিত্র কোরান-এর সার্বজনীনতার সাক্ষ্য / | ১৩৪ |
| মুসলমানদের পতনের মূল কারণ / | ১৩৭ |
| আদম ও মানুষের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা / | ১৪৬ |
| সুফিবাদের দৃষ্টিতে আমি ও আমার বলার রহস্য / | ১৫০ |
| কোরান-এর কিছু আয়াতের অংশবিশেষ যাহা প্রচলিত অনুবাদের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম / | ১৫২ |
| ইফতার বিষয়ে কতিপয় হাদিস / | ১৬২ |
| হজরত বাবা আমির খসরু রচিত কালাম-এর ভাবার্থ / | ১৬৪ |
| তিনটি কবিতা / শাহ সুফি সাইয়েদ মোহাম্মদ নাসিম / | ১৬৫ |
| তিনটি কবিতা / অধ্যাপক জামাল / | ১৬৮ |
| শাহ সুফি লকবপ্রাপ্তদের নামের তালিকা / | ১৭৫ |

আমি স্মরণ করি

এক. আমি সর্বপ্রথমে স্মরণ করছি পরম শ্রদ্ধার সাথে মহানবির আস্তাবে সুফ্যার বিখ্যাত একজন মহান সাহাবা হজরত আবু জর গিফারিকে। যিনি নির্বাসনে যাবার পরে বলেছিলেন যে, আমার লাশ (মোবারক) যেন কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি স্পর্শ না করেন। সিরিয়ার গভর্নর হিন্দার পুত্র মুয়াবিয়ার সঙ্গে সূরা বাকারার দুইশত ঊনিশ নম্বর আয়াতটির ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেবার পর হিন্দার পুত্র মুয়াবিয়া গোপনে হজরত ওসমান গনিকে আবু জর গিফারির বিষয়টি নিয়ে একটি পত্র লেখে। তার কিছুদিন পর হিন্দার ছেলে মুয়াবিয়া আবু জর গিফারিকে খলিফা হজরত ওসমান গনির কাছে পাঠিয়ে দিল। আমার কাছে এই বিষয়টি একটি রাজনৈতিক চালবাজির বস্তু মনে হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, খলিফা হজরত ওসমান গনি হিন্দার ছেলে মুয়াবিয়ার সঙ্গে একমত (?), অতএব আবু জর গিফারিকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন। অনেক ইসলাম গবেষক এই বিষয়টিকে রাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখা বলে মনে করেন। এই বিষয়টি জানবার পর অধম লেখকের মনে একটি ধাক্কা লাগে। তাই আমি এবং আমার পুত্ররা

রাজনীতি তো দূরের কথা, ভোট কেন্দ্রে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। গাছটি যেমন ফলটি তো তেমনই হবে। আর সুফিয়ান আর হিন্দা নামক গাছে যেমন মুয়াবিয়া নামক অমৃতের (?) ফলটি ধরেছিল : যে মুয়াবিয়া মহানবি এবং চার খলিফার আদর্শটিকে কবর দিয়ে রাজতন্ত্র চালু করল।

আরও একটি বেশি কথা বলতে চাই যে, অধম লিখক হাসতে হাসতে জাহান্নামে যেতে রাজি আছি, তবুও হিন্দার ছেলে মুয়াবিয়াকে সাহাবা মনে করব না এবং বিশেষ করে এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় ইসলাম গবেষক সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী সাহেবের সাথে ঐকমত্য পোষণ করি। আল্লামা ইকবাল বলেছেন, দিল ওয়া নিগাহ মুসলমান নাই তো কুছভী নাই তথা অন্তর এবং দৃষ্টিভঙ্গি যার মুসলমান তথা পরিপূর্ণ নয়, সে তো মুসলমানই নয়। (তবে তাকিয়া গ্রহণ করাটি জায়েজ আছে এবং কেউ যদি মুয়াবিয়াকে সাহাবা মনে করেন তো এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার বলে অবশ্যই মনে করতে চাই)।

দুই. আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ওলিদের ওলি, পীরদের পীর, যিনি বাক্যদান করার সঙ্গে সঙ্গে ফল ফলে যেত, প্রতিদিন যাঁর বব্রিশ মাইল হাঁটার বিস্ময়কর অভ্যাস, যাঁর মাজারের গম্বুজ বাংলাদেশে সবচাইতে উঁচু, যাঁর মাজারে সব সময় মানুষের যাতায়াত, যাঁর প্রধান মুরিদ ও খলিফা তিনজন তিনটি বিস্ময়॥ মনোহরদীর আসাদ নগরের বাবা মোজাফফর মাস্তান, ভৈরবের কালিকা প্রাসাদের সিরাজ মাস্তান, আর কিশোরগঞ্জের

শাহ সুফি বাবা আনোয়ার শাহ কলন্দর॥ সেই মাণ্ডলাউল আলা, আসরায়ে খিজির, মুজাররাত বাবা আবু আলি আক্তার শাহ কলন্দরকে (কানদইলার পীর, কুলিয়াচর) যিনি আজানগাছি পীর সাহেবের প্রধান খলিফা। তবে বলে রাখা ভালো যে, আজানগাছি পীর সাহেবের মুরিদদের মধ্যে দুইটি ধারা প্রবহমান : একটি আচার-অনুষ্ঠানপ্রিয় এবং আলুর দম দেওয়া পোলাও খায়, আর অপর দলটির মাঝে আনুষ্ঠানিকতার প্রাধান্য নাই বললেই চলে এবং নামের শেষে কলন্দর থাকে। তবে অবাক হবার কথাটি হলো, এই দুই দলের মধ্যে কোনো ঝগড়াও নাই, সমালোচনাও নাই। তবে উভয় দলের অনুসারীদের প্রশ্ন করলে বলেন যে, যার যার মনমতো চলতে দিন। আমি অধম বাবা শাহ সুফি আনোয়ার শাহ কলন্দরের যোগ্যতম মুরিদ ও খলিফা বাবা হানিফ শাহ সাহেবকে পরম শ্রদ্ধা করি। উনি নামের শেষে কলন্দর লেখেন না এবং নিজেকে আড়াল করে রাখতে ভালোবাসেন। বাংলার সুফিসাধকদের এক প্লাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য উনার প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রম সত্যিই বিস্ময়কর। হতাশা শব্দটি উনার কাছে অচল। নিজেকে ছোট করে বিলিয়ে দিয়ে তিলে তিলে কোরবানি করবার চেতনায় অগ্রসর হবার যোগ্যতাটি অবাক করে। কী করে এত ধৈর্য ধারণ করতে পারেন, কী করে প্রায় প্রতিটি দরবারে গিয়ে আপনার সুন্দরতম হাফ্জিটি একদম ছোট করতে পারেন তারই শিক্ষা অধম লিখক তাঁর নিকট শিখেছি। বয়সে অনেক বড় হতে পারি, কিন্তু ধৈর্য আর ত্যাগের প্রশ্নে তাঁকে আমার

শিক্ষাপ্তর বললেও খুব বেশি বলা হবে না। সামান্য মোবাইল ফোনে ডাক দিলে হাসি মুখে যিনি এসে পড়েন, যা দেখতে পাই তাযকেরাতুল আউলিয়া-র মাঝে। বিখ্যাত ওলি হজরত আবু বকর ওয়াস্তির কথা মনে পড়ে। বাবা ওয়াস্তির কাছে এসে অন্য ধর্মের বহু মানুষ মুরিদ হয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুফিবাদের ঝাঙাটি বাংলার বুকে তুলে ধরার সাধনাটি সার্থক হোক। মাওলা তাঁর এই সাধনা ও পরিশ্রমটির সাথে থাকুন, এই কামনা করছি। আর সেই সাথে রইল অধর্মের আন্তরিক দোয়া।

তিন. আমি স্মরণ করছি নবীনগর উপজেলার শেষ প্রান্তে অবস্থিত দূবাচাইল গ্রামের পীরে কামেল শাহ সুফি মোখলেছ বাবাজানকে। উনি বাঞ্চারামপুর উপজেলার বিখ্যাত মজ্জুব পীর বাবা রাহাত আলীর একনিষ্ঠ ভক্ত এবং উনারই গুরুভাই পীরে কামেল বাবা গনি শাহ। বাবা মোখলেছ শাহের একমাত্র যোগ্যপুত্র ফিজিক্স-এর অধ্যাপক সানু বাবা আম্মাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। আমিও পুত্রস্নেহে সুফিবাদের অনেক কিছু তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করি। দুইবার গিয়েছিলাম শ্রাবণের ওরসে। দু'বারেই আম্মাকে ভক্তদের মজলিশে কিছু বলতে হয়েছিল এবং বেশ কিছুক্ষণ বলার পর ক্লান্ত হয়ে যাই এবং গরমে কাপড় ঘামে ভিজে যায়। মনে মনে একটা ফানটা পান করতে চেয়েছিলাম। মজলিশ থেকে পায়ে হেঁটে যখন সানুদের বাসায় আসলাম, প্রায় নব্বই বছরের বৃদ্ধ বাবা মোখলেছ শাহ একটি গেঞ্জি পরে আসনে বসে আছেন আর ভক্তরা বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। আমি

হজুরের ঘরে প্রবেশ করার পর অন্য একটি আসনে আম্মাকে বসতে দিলেন এবং মুচকি হাসি হাসলেন। একজন ভক্তকে ডেকে কানের কাছে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। একটু পরেই দেখলাম, সেই ভক্ত দুটো ফানটার বোতল এনে হজুরকে দিলেন। হজুর আমার হাতে একটি ফানটার বোতল দিয়ে বললেন, উনার ফানটা খেতে মন চেয়েছে। তাই একটা আমি খাই, আর একটা আপনি খান। একদম প্রচারবিমুখ এই নব্বই বছরের বৃদ্ধ বাবা মোখলেছ শাহ সাহেবের দিকে কিছু না বলে কেবল বোবার মতো চেয়ে রইলাম। আরও অবাক হলাম, উনার প্রধান আসন ঘরটি আম্মাকে থাকতে দিয়ে ছোট আসন ঘরে তিনি চলে গেলেন। কত অনুরোধ করলাম, কিন্তু হাসিমুখে বললেন, ‘আপনি স্নেহমান এক পীর সাহেব। আপনার ইচ্ছিত দেওয়াটা নৈতিক কর্তব্য মনে করি।’ আমার পুত্রকে মুরিদ করার জন্য সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিন্তু মুরিদ না করে পুত্রকে বললেন, তোমার বাবার কাছেই থাকো।

আগের দিনে পীর সাহেবেরা একে-অন্যের সঙ্গে চলাফেরা-আসা-যাওয়া করতেন, কত রকম কথাবার্তা হতো। আর আজ? মনে হয় জাদুঘরে রেখে দেওয়া অবাক করা বিষয়। ফরিদ উদ্দিন আহমাদ যদি এ যুগে বেঁচে থাকতেন তো তাযকেরাতুল আউলিয়া নামক ফারসি ভাষায় রচিত বিখ্যাত গুলিদের জীবনী গ্রন্থটির নাম ঠাট্টার ভাষায় হয়তো লিখতেন ‘তাযকেরাতুল গাউলুল আজম আল জাদিদ’। বইটি সেই প্রায় দেড়শত বছর আগে বাংলা

ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন। আর কেউ তা পুনরায় ছাপাল না। ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের কোরান-এর প্রথম বাংলা অনুবাদটি প্রায় শত বছরের কিছু পরে ঢাকার ঝিনুক পাবলিশার্সের মালিক রুহুল আমিন নিয়ামী ছাপিয়েছিলেন। উনি অনেক কষ্টে ও পরিশ্রমে সংগ্রহ করা মূল অনুবাদটির দুর্বল কাগজে ছাপাটি আমাদের দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাযকেরাতুল আউলিয়া নামক বইটির অনুবাদ আর কোনো পুরাতন লাইব্রেরিতে পেলেন না। এমনকি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্ম সমাজের পাঠাগারেও আর পাওয়া গেল না।

পশ্চিম বাংলা হতে অনেক পরে কোরান-এর অনুবাদটি পুনরায় এক প্রকাশক প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাযকেরাতুল আউলিয়া আর ছাপা হলো না। তখনই রুহুল আমিন নিয়ামীর কথাটির সত্যতা বুঝতে পারলাম। এখন অবশ্য বাজারে একই নামে একাধিক প্রকাশকের প্রকাশিত বইখানা পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে ফরিদ উদ্দিন আক্তারের লিখার কোনো মিল নাই। বরং সেগুলো পড়লে স্পর্ধার কলেরা রোগে আক্রান্ত হতে হয়। অনুবাদক অনুবাদের নামে যদি নিজেদের কথা ঢুকিয়ে দেয়, তাদেরকে সমালোচনা করতেও রুচিতে বাধে। যেমনটি হয়েছে ইমাম গাজ্জালির নামে এহঁয়ায়ে উলুম উদ্দিন বইটির খাস্তা অনুবাদ। লিখক এবং অনুবাদকের সঙ্গে মূল বইটির বিষয়ে অমিল থাকতে পারে, কিন্তু একদম নিরপেক্ষতাই অনুবাদকের নীতি, আদর্শ ও ধর্ম হওয়া কর্তব্য। আমাদের দেশে যা

আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র। অনুবাদের বিষয়টিতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হলো ইউরোপ আর আমেরিকা। অপ্রিয় হলেও সত্য কথাটি বিবেকের তাড়নায় বলতে বাধ্য হলাম।

চার. আমি স্মরণ করি পীরে কামেল, মাওলাউল আলা, শাহজাদায়ে গাউসুল আজম হজরত বাবা জিয়াউল হক ভাণ্ডারীকে। আমার লিখনীসমগ্র পড়ার পর তাঁর মুরিদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে এক নজর দেখতে। আমি অধম অতি ব্যস্ততার কারণে যাই যাই করেও আর যাওয়া হলো না। এই মহান ওলির রওজা মোবারকে আমাকে অন্তত একবার যেতেই হবে, ক্বমা চাইবার জন্য।

পাঁচ. আমি স্মরণ করি ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলার জয়লস্কর নামক স্থানের সামান্য কিছু দূরে অবস্থিত বরহাইগুণী দরবার শরিফের পীর বাবা শাহাপীর চিশতি নিজামি বান্দা নেওয়াজিকে। আমি উনার প্রাণঢালা দোয়া পেয়েছি এবং বেশ কয়েক বছর প্রতি ওরসে ওনাকে দর্শন করতে উপস্থিত থাকতাম।

ছয়. আমি স্মরণ করি পীরে কামেল শাহজাদায়ে গাউসুল আজম বাবা শফিউল বশর আল হাসানী আল মাইজভাণ্ডারীর যোগ্যতম পুত্র পীরে কামেল শাহজাদায়ে গাউসুল আজম বাবা মুজিবুল বশর আল হাসানী আল মাইজভাণ্ডারীকে। উনি একদিন হাসতে হাসতে আমাকে দেখে বললেন যে, ওলিদের মাজারে জাঁকজমকপূর্ণ গিলাপ চড়ানো হয়, আর আপনি জীবিত

অবস্থায় জাঁকজমকপূর্ণ শেরওয়ানির গিলাপ পরেছেন। আমি দোয়া করি, আপনার নাম দেশ-বিদেশে একদিন ছড়িয়ে পড়বে, যদিও আপনি প্রচারবিমুখ এবং নিজেকে তাকিয়া নামক ঘোমটায় লুকিয়ে রাখেন।

সাত. আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পরম পূজনীয় শাহ সুফি সৈয়দ ফারুক হুসাইন কাদরি আবুল উলাইকে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি ৫৩/১ আলি নেকী দেউড়ী লেন, সাতরওজায় পাকিস্তানি আমলে (তখন বাংলাদেশ হয় নি) আনুমানিক ৪২ বছর আগে উনার খানকা শরিফে বাৎসরিক ওরসে দাওয়াত পেতাম। আমি অধম লিখক প্রতিটি ওরসে এ জন্যই যেতাম যে, উনার দরবারে ফারসি ভাষায় কাওয়ালি হতো। অধম লিখককে আদর করে পাশে বসাতেন এবং একসঙ্গে বসে কাওয়ালি শুনতাম। সেই দিনের ফারসি ভাষার বিখ্যাত কাওয়ালের নাম ছিল সাদেক। অনেক সময় উনি হালে কাঁপতে থাকতেন এবং শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়তেন। সেই মোহনীয় স্মৃতি আজও এই বৃদ্ধ বয়সে মুছে যায় নি। উনি প্রচুর পান খেতেন এবং উনার জ্ঞানের সামনে সামান্য দাঁড়াবার ক্ষমতাটি অধমের ছিল না। উনার বিনয় এবং মার্জিত ভাষা আমাকে আজও অভিভূত করে। উনারই পুত্রের মুরিদ এক স্কুল-শিক্ষিকা আমার রোগী ছিলেন। নির্দিষ্ট সময়-তারিখ করে তাঁর পুত্রকে দেখতে যাই। উনি যথেষ্ট আদর-যত্ন করলেন এবং আমাকে পরিষ্কার চিনতে পারলেন। দুঃখ এই জন্য যে, উনি পর্দা গ্রহণ করেছেন। অপ্রিয় হলেও এই কথাটি সত্য যে, আমার মতো অধমকে তাঁদের

আর কোনো অনুষ্ঠানে অজ্ঞাত কারণে দাওয়াত করেন না। তবে বর্তমান পীর সাহেব শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ মোহাম্মেল কাদুরি আবু উলায়ীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। আশা করি সুফিবাদের উপর কিছু একটা রেখে যেতে পারবেন।

আর্ট. আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জেসন ফার্মাসিউটিক্যালস গ্রুপ অব কোম্পানিজ-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব মুহম্মদ সলিমউল্লাহ সাহেবকে। আমি এ জন্যই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করছি যে, বিত্ত-বৈভবের চমক এবং ধনৈশ্বর্যের একটি প্রচ্ছন্ন উদ্ধত অহংকার যাঁর মাঝে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া আনতে পারে নি, বরং সুফিবাদের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং বাংলাদেশের বিখ্যাত পীরে কামেল সুফিসাধক খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ সাহেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। যাঁর আদর্শ সাইনবোর্ডের বৃত্তের মধ্যে ঘূর্ণায়মান নয়, বরং সার্বজনীন। মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় উনি যে এগিয়ে আসবেন, অধম লেখকের জন্য এটা ছিল একটা অষ্টম আশ্চর্য। সুফিবাদের উপর ভক্তি-সহানুভূতি প্রদর্শন করা এক বিষয়, আর মোরাকাবার ধ্যানসাধনা করাটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

সাগরে উত্তাল উর্মির অবস্থানে ব্যক্তিসত্তা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিত্ত-বৈভবের সাগরে ব্যক্তিসত্তার নৌকা প্রায়ই আত্মশ্লাঘার মেকি আভিজাত্যের বেসুরা ঝংকার তোলে, আমিত্বের কণ্ঠকুনিকায়। বিশ্লেষণের জিজ্ঞাসা এখানে পশু ও স্থবিরতার মূর্তি ধারণ করে। রাহুগ্রাসে চন্দ্র-সূর্য যেভাবে কিছুক্ষণের জন্য

আপন সত্তাকে বিবর্ণ করে, তেমনি বিত্ত-বৈভবের মালিক যারা তাদেরকেও সেইভাবে কখনও কখনও মোহাচ্ছন্ন করে তোলে। বিত্তবৈভবের নেশা যখন সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণ করে, তখন সমস্ত প্রকার মাদকদ্রব্যগুলো উজির-নাজিরের মতো কুর্নিশ করে। কিন্তু জগতে এই বিস্ময়কর বিষয়েও ব্যতিক্রম রেখে দিয়েছেন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা। খলিফা আবু বকর সিদ্দিক, জুনুননুরাইন হজরত ওসমান গনি, মর্যে অবস্থানকালে স্বর্গের সুসংবাদ পাওয়া সাহাবা আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সম্রাটের সিংহাসন থেকে স্বেচ্ছায় নেমে এসেছেন ইব্রাহিম আদহাম বলখি, শাহ সুজা কেরমানওয়ালা, আল্লামা আবদুর রহমান জামি, মোহাম্মদ ইবনে হাসান (দাতা গঞ্জে বখশ) আর এই একবিংশ শতাব্দীতেও এরই সামান্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাই কিছু কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তিতে। আশ্চর্য, তারই কি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে চিহ্নিত করা যায় না সলিম উল্লাহ সাহেবকে?

নয়. আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি আমার জন্মদাতা কেরানীগঞ্জ থানার প্রথম এমএ, বি টি, মরহুম হেলাল উদ্দিন আহমদ-এর আপন ভাই শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি ঔরফে কালু শাহ সাহেবকে। কিশোর বয়সে বাবাকে হারাবার পর যিনি আমাকে বুকে তুলে নিয়েছেন, শিক্ষাদান করেছেন এবং সুফিবাদের দেশে কেমন করে অগ্রসর হতে হয় সেই শিক্ষাটি সর্বপ্রথম তিনিই দিয়েছেন। উনি আমার আধ্যাত্মিক গুরু না হতে পারেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক গুরুর সন্মান প্রদর্শন করি। যদিও ধর্মীয়

ব্যাপারে কোনো কোনো প্রশ্নে-মতের অমিল থাকতে পারে, কিন্তু কোনো সংশয় থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না। উনার কোরান তফসিরটি পৃথিবীর বিখ্যাত যে কয়টি কোরান তফসির আছে তারই মধ্যে অন্যতম। আমার আরেক চাচা শাহীন স্কুল ও কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল এবং কেরানীগঞ্জ উপজেলার প্রথম গ্রুপ ক্যাপ্টেন মরহুম কাম্মাল উদ্দিন আহমদ সাহেবকে স্মরণ করি। আমি স্মরণ করি আমার ছোট চাচা কর্নেল, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, উকিল এবং প্রফেসর শরফুদ্দিন আহমদ সাহেবকে। আমি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারছি না যে, একজন মানুষ এতগুলো গুণের অধিকারী সমগ্র বাংলাদেশের আর একজন আছে কিনা সন্দেহ। আমি স্মরণ করি আমার প্রাণপ্রিয় ফুপু, যাঁর বুকের দুধ পান করেছি এবং যিনি পুত্রস্নেহে লালনপালন করেছেন, সেই মরহুমা শামসুন্নাহার ওরফে লোরার মাকে।

দশ. আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে চাই আমারই গ্রাম চুনকুটিয়ার চৌধুরী পাড়ায় অবস্থিত প্রাক্তন সংসদ সদস্য মরহুম আজিজুর রহমান চৌধুরী ওরফে জুলু চৌধুরীর সুযোগ্য পুত্র সুফিবাদে বিশ্বাসী এবং শামপুরী শাহ সাহেবের মুরিদ ও খলিফা, পরম পূজনীয় আমার শিক্ষাগুরু, জনাব লুৎফর রহমান চৌধুরী (এমএ, এলএলবি) সাহেবকে। যিনি আমাকে ধর্ম বিষয়ে গবেষণা করার জন্য উৎসাহ দান করেছেন এবং আমার সর্ববিষয়ে সু-পরামর্শ দান করেছেন এবং সব সময় আমার মঙ্গল কামনা করেন। আমি মাওলার কাছে তাঁর জন্য রহমত কামনা করি। আরও উল্লেখ্য যে,

ধনসম্পদ, জ্ঞানগরিমায় এবং বংশমর্যাদায় কেরানীগঞ্জ উপজেলায় এত উন্নতমানের বংশ আর দ্বিতীয়টি আছে বলে অধম লেখকের জানা নাই।

এগারো. পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি আমার দাদুকে যিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হতে আগমন করেছিলেন এবং একজন সুফি সাধক হিসেবে আসামে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর নাম কাজিম উদ্দিন আহমদ। দাদু বলেছিলেন ‘আমার বংশের কেহই ঘুষ খেতে পারবে না। অদৃশ্য শক্তি তাকে বাধা দেবে এবং তারই জ্বলন্ত প্রমাণ দেখতে পাই যখন আমার চাচাতো ভাইবোনেরা কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ইনকামট্যাক্সের ডেপুটি কমিশনার, কেউ এফআরসিএস ডাক্তার, কেউ হাইকোর্টের পেশকার ছিলেন। তাঁরা জীবনে একটি টাকাও ঘুষ খেতে পারেন নি। তাঁরা অকপটে আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে, কোনো এক অদৃশ্য শক্তি এই অবৈধ উপার্জন হতে বাধা প্রদান করে।

বারো. পরিশেষে, আমি স্মরণ করি আমার বড় মামা আবুল কালাম আজাদ এমএ, এমকম, এলএলবি। হয়তো তাঁর মনের মাঝে কিছুটা দুঃখ থাকতে পারে যে তারই আপন ভাই আবদুল মতিন গুরফে তারা মিয়া হাজি সাহেব যিনি দাড়িতে সদাসর্বদা মেহেদি লাগানোর সূন্নত পালন করেন, আমি তার নিকট হতে চার বিঘা জমি ক্রয় করেছিলাম, কিন্তু আপন মামা ডেবে দলিল করি নি। অবশেষে বিক্রয় করার বিষয়টি তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন (সোবহানাল্লাহ!)। আমার এই মহান হাজি তারা

মিয়া মাম্মাকে আমার লিখনীতে কাছেই রেখে গেলাম (সোবহানাল্লাহ!)
 এবং প্রিয় পাঠক বাবারা এবং মায়েরা আমার এই মাম্মার দেদীপ্যমান
 কীর্তিকলাপ পড়বার পর আশা করি সোবহানাল্লাহ পড়বেন।

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইম্মান আল-সুরেশ্বরী
 গ্রাম : চুনকুটিয়া (মধ্যপাড়া)
 ডাকঘর : শুভাঢ্যা, থানা : কেরানীগঞ্জ
 জেলা : ঢাকা

যারা সাধনায় আগ্রহী তাদের প্রতি অনুরোধ

আমরা, বাবার সাধক ভক্তরা, কি বলতে পারি না যে, শত বছরে জগতের
 মাঝে আর একটি এমন প্রতিভাবান জাহাঙ্গীরের জন্ম হবে কি?

ধ্যানসাধনার এত সহজ নিয়মে এগিয়ে গিয়ে রহস্যলোকের কিছু দর্শন করার নিশ্চয়তাটি কি একটি বোবা চ্যালেঞ্জ নয়? এই চ্যালেঞ্জ বাবার বইতে নাই, আছে নব্বই মিনিটের কয়টি অডিও ক্যাসেটে/সিডিতে। এই কথাটি কি কেউ সাহস করে বলতে পারবে যে, ‘ধ্যানসাধনা করে যদি কিছু না পাও তো আমাকে ফেলে অন্য গুরু ধরিও?’ এই কথাটি কি শুনেছেন যে, ‘জীবনভর বাবা বাবা ডাকবে অথচ পাবে না কিছুই, তা হলে এই বাবা ডাকার সার্থকতা কোথায়?’ আমরা শ্রদ্ধেয় ওহাবি মতবাদে বিশ্বাসীদের এবং শ্রদ্ধেয় শিয়া মতবাদে বিশ্বাসীদেরকে পর্যন্ত আশ্বাস করছি এই ধ্যানসাধনাটি করতে। কেবলমাত্র এই একটি প্রশ্নে আপনার বিবেকটিকে নিরপেক্ষভাবে জিজ্ঞেস করুন, আর কোথাও কি এ রকম বোবা চ্যালেঞ্জটি একটিবারও শুনে পেয়েছেন? আমরা পৃথিবীর যে কোনো ধর্মে বিশ্বাসীদেরকে আশ্বাস করছি, আসুন সত্যতা যাচাই করার জন্য। বারুদির শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর গুরু বাবা গফুর শাহ মুসলমান হওয়াতে কি কোনো দোষ আছে? শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-এর গুরু বাবা গেন্দু শাহ হওয়াতে কি কোনো দোষ আছে? গুরু নানকের গুরু বাবা বাহুল দানা হওয়াতে কি কোনো দোষ আছে? বাবা হরদেওর গুরু বাবা মাহবুবে এলাহি নিজাম উদ্দিন আউলিয়া হওয়াতে কি কোনো দোষ? বাবা কবিরের গুরু হিন্দু ব্রাহ্মণ হওয়াতে কি কোনো দোষ আছে? ভক্ত কবিরাম রমেশ চন্দ্র শীলের কি গাউসুল আজম বাবা ভাণ্ডারীর মুরিদ হওয়াতে কোনো

দোষ আছে? কারণ আধ্যাত্মিক গুরুর কোনো জাত থাকে না। জাত তাদেরই কাছে থাকে যারা ধর্মীয় সাইনবোর্ডে বিশ্বাসী। বাণীপাঠ করিয়ে ধর্ম বদলানো যায়, কিন্তু রক্তের ও-নেগেটিভকে কখনোই ও-পজিটিভ করা যায় না। আমাদের বাবা শিশুর মতো সরল, কোটি টাকা আর বিত্ত-বৈভবের চাকচিক্য লাখি দিয়ে ফেলে দিয়েছেন। লোভ-মোহ যাকে বিদ্ধুমাত্র গ্রাস করতে পারে নি। বাবার গুরু শাহ সুফি ম্যাওলানা শাহ জালাল নুরী আল সুরেশ্বরী বাবাকে বিনয়ের সন্মুখ বসতেন এবং বাবার গুরু ভাইয়েরা সবাই বাবাকে ভক্তি করেন। বাবা নিজেকে এমনভাবে ছোট করে ফেলেন যে, আমরা অবাক হই এবং অনেক নবাগতের মাঝে সংশয়ের ধুম্রজাল তৈরি হতে দেখি। এই যুগে আর কোনো গুরু কি অকপটে বলতে পেরেছেন যে, ‘আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রশ্নে শত শত গুরু বদলাতে পারো।’ যদি আমাদের কথাগুলো আপনার বিবেকের দরজায় আঘাত হানে তো আসুন এবং ভক্ত হয়ে সাধনা করতে দোষ কোথায়? এমন কথাটি কি জীবনে শুনেছেন যে, আপনার গুরু তিনটি স্তর তথা মোকাম পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং চরম্বে আর গুরু থাকেন না এবং শয়তানও থাকে না; চরম পর্যায় সাধক নিজেই গুরু, নিজেই শিষ্য এবং এখানেই আনা সুবহানি তথা ‘আমিই ভাসমান’। আমাদের এই অনুরোধ কেবলমাত্র ধ্যানসাধনায় যারা আগ্রহী তাদের জন্য। এবং বাবার ভাষণের মাত্র দুটো অডিও ক্যাসেট/সিডি শুনে দেখুন না, বাবা কী বলছেন?

বাবার সাধক ভক্তবৃন্দ ০৭.১২.০৩

সুফিবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন

১. সারমাদ্দ দারুদী আজব শিকাস্তা কারুদী।
এ কোন প্রচণ্ড হৃদয়ের বেদনায় কী অদ্ভুত রূপ আমার সর্বঅঙ্গে ধারণ
করিয়েছ, কেবলই তুমি।
২. ঈমা বা ফেদায়ে চাশ্মে মাস্তে কারুদী।
আমার সব কিছু এমনকি বুদ্ধি-জ্ঞান আর প্রখরতার প্রতিভাগুলো,
একদম অকেজো করে দিল কেবলই তোমার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন চোখ
দুটো।
৩. উমরে কে বায়াতো আহাদিস গুজাস্তে।
অনন্ত অনাদিকালের গোলাম হয়ে কাটিয়ে দেয়ার দয়া হতে তুমি
আমাকে বঞ্চিত করো না।
৪. রাফতি ও নেসারে বুত্ পারাশ্তে কারুদী।
কারণ, সব কিছু স্বেচ্ছায় হারিয়ে তুমি আমাকে তো কেবলই
পীরপূজারক বানিয়ে দিলে।

হজরত আমির খসরু

(মাহবুবে এলাহি নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার প্রধান খলিফা)

পীরপূজাই আল্লাহর পূজা : সুফিবাদের সর্বোচ্চ দর্শনটি হজরত আমির খসরুর এই
কালামে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে

ঈদ গাহে মা গারিবা কুয়ে তো।

এই গরিবের খুশির ঈদের মাঠটি হলো তোমারই গলিতে (সরু রাস্তা,
চিকন পথ, উঠান, দুয়ার, আঙিনা)।

উম্মেরে হাতে দিদে দিদাম কুয়ে তো।

আমার অতি পরিচিত জীবনসাথীকে তাঁর আসল রূপে তোমারই গলিতে
দেখলাম।

কাবা-এ-মান কেবলায়ে মান কুয়ে তো।

আমারই কাবা, আমারই কেবলা তো একমাত্র তোমারই গলিতে।

সেজদা গাহে মা আশেকারা আব কুয়ে তো।

প্রেমিকদের সেজদার একমাত্র স্থানটি তো শুধুমাত্র তোমারই গলিতে।

হুদ হাজারা ঈদ-ও কুরবা নাদকুনাম।

কতশত খুশির ঈদ আর কুরবানি তুচ্ছ হয়ে যায় যখন তোমারই গলিতে
অবস্থান করি।

আয় হেলালে মা আব কুয়ে তো।

মারেফতের রহস্যের সদ্য উদ্ভিত চাঁদ দেখা পাবার স্থানটি তো তোমারই
গলিতে।

দাস্তে কুশা জানিবে বেদম পীরে মা আব রিনদানে হিন্মতে মা কুয়ে তো।
 তোমারই হাতের সোহাগ-মাখা স্পর্শ, ওগো আমার পীর, আমার অন্ধত্ব
 দূর করে দেয়। আর জীবনটা থেকেও মৃত্যুর ছোঁয়ায় রহস্যের আলোতে
 শিহরিত হয়,

ক্লমে ক্লমে অজানা জিজ্ঞাসায় কেঁপে ওঠে। যিনি পা হতে মাখা পর্যন্ত নূরে
 নূরময়, সেই তুমিই তো আমার পীর। তোমারই নূরের সাহসী ধারা
 অর্জন করতে পেরেছি বলে কেবল তোমারই গলিতে পড়ে থাকি।

ইয়া নিজাম উদ্দিন মাহবুবে খোদা।

ওগো নিজাম উদ্দিন, খোদার বন্ধু।

জুমলা মাহবুবা গোলামে কুয়ে তো।

কেবলই প্রেমসী হয়ে আছ তাদের কাছে, যারা দাসত্বের

শৃঙ্খল তোমারই গলিতে আপন ইচ্ছায় বরণ করে নিতে পেরেছে।

সাহায্যের আবেদন

সুফিবাদে যারা বিশ্বাসী কেবল তাদেরকে বলতে চাই যে, সুফিবাদের
 কিছুটা প্রচার হওয়া প্রয়োজন। আমি অকপটে বলছি যে, বাংলাদেশের
 কোনো পীর-ফকিরের আর্থিক সাহায্য আশা করি না। কারণ আমার

ভালো করেই জানা আছে যে, পীর-ফকিরেরা আহা! উহ! করে সমবেদনা জানাবে বারবার, কিছু সাহায্য চাইতে গেলেই ডেস্কু জুরে আক্রান্ত হয়। দুঃখ করে বলছি না, সুফিবাদের প্রচার এক রকম নাই বললেই চলে। যাও কিছুটা আছে তা একান্ত খানকাকেন্দ্রিক। ওহাবিদের প্রবল প্রচার ও চাপের মুখে সুফিবাদের বিশাল দুয়ারটি আশ্বে আশ্বে তাদের দখলে চলে যাচ্ছে এবং সেই বিষয়ে কারো ইশ নেই বললেই চলে। প্রচারেই প্রসার, এই কথা আমরা কমবেশি সবাই ভুলতে বসেছি। কিছু বাংলাদেশের পীর-ফকিরেরা একবার ভুলেও ভুলতে পারেন না যে, কেমন করে মুরিদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কোন কৌশল অবলম্বন করলে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মুরিদ হবে। বেতন দিয়ে রাখা কিছু তোতাপাখি-মার্কা মোল্লা-মোলবি নিয়ে জেলায় জেলায় ওয়াজ মাহফিলের নামে কেমন করে মুরিদ বানাতে হয়, সেই প্রশ্নে ইনারা ঝানু পণ্ডিত এবং ঘাণ্ড বুদ্ধিমান। সুতরাং এদের কাছে আর্থিক সাহায্য চাওয়া আর জঙ্গলে বসে বসে হাউমাউ করে কাঁদা একই কথা। আমরা ভুলতে বসেছি, ওহাবিদের প্রচণ্ড আঘাতের ঝড় আসার আলামত খুব একটা দূরে নয়। তা ছাড়া এক পীরের সঙ্গে আরেক পীরের একমত হওয়াটা যেন সোনার হরিণ দেখার মতো। সবাই বড় পীর, কেউ ছোট পীর হতে চান না। রাজার সঙ্গে রাজার ব্যবহার পাবার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং অন্য পীরকে দেখলে ক্রীতদাসের মতো আচরণের ভাবটি ফুটে উঠতে চায়। হাতেগোনা কয়টি দরবারের পীর সাহেবেরা একতার প্রশ্নে ইচ্ছা করে ছোট

হতে গিয়ে এক প্লাটফর্মে আনতে না পেরে বিষণ্ণতা নামক মানসিক রোগে ভুগতে বাধ্য হচ্ছেন। আমি অধমও সেই রকম একজন বলতে পারেন। তাই তো সুফিবাদে যারা বিশ্বাসী কেবলমাত্র তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে চাইছি। আমার ডাকে যদি কেউ আসে তো সুফিবাদে বিশ্বাসীরা আসবে বলে বিশ্বাস রেখেই এই আর্থিক সাহায্য চাওয়ার আশ্বান। এই আশ্বান কোনো পীরের খানকাকে নয়, এই আশ্বান কোনো বড় পীরের দরবারে নয়, বরং আশ্বানটি ভক্তদের কাছে : ভক্তরাই কেবল এগিয়ে আসতে পারে অটল বিশ্বাসে। নোংরা প্রতিযোগিতার অঙ্কগলিতে মাওলানা রুমি, শামসে তাব্রিজ, হাফিজ সিরাজি, আমির খসরু, ইবনুল আরাবি, আহমদ রেফায়ি, সানাই, আন্তার, মিস্রি, জামি, বাবা ফরিদ, বু-আলী শাহ কলন্দর, হাজি এমদাদুল্লাহ মোহাজের মক্কি, মোজাদ্দের আলফেসানি সিরহিন্দ, শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মুনিরি, বেদম ওয়ারসি, আশরাফ জাহাঙ্গীর, সাজ্জর গাজিপুরি, নাতেক, ইনশা, জিগার মুরাদাবাদি, কামার জালালাবাদি, তাবিশ, আনোয়ার ফারাক্কাবাদি, নাজা শোলাপুরি, আনোয়ার বেহেজাজ, বুল্লেখাহ, শাহ আবদুল লতিফ ভিটায়ি, মুমিন খান মুমিন, সাকিব, নাদের, কাতিল শাফায়ী, আরজু সাহারানপুরী, সুফি ফতেহ আলি শাহ, জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী, খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ, সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি, মুফতি ইয়ার আহম্মদ খান নঈমী, সৈয়দ মোহাম্মদ হাশমি এবং মাওলানা জলিল সাহেবেরা হারিয়ে যেতে বসেছেন। গোলাবি ওহাবি আর গোলাবি

শিয়া মতবাদ আরও ঘোলাটে, আরও জটিল, আরও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সবাইকে দিশেহারা করে তুলছে। বিশাল পদ্মা নদীতে (ইসলাম বিষয়ক) মাইলকে মাইল জুড়ে বড় জাল ওহাবি জেলেরা ফেলেছে বাংলার পীর-ফকিরদের ধরতে। এখন এই মুহূর্তে কিছুই মালুম হচ্ছে না, তবে ধরা পড়ার অশনি সংকেতটি সামান্য হলেও সবাই বুঝতে পারছে। বিরাট বিশাল জালটি আস্তে আস্তে গুটিয়ে আনছে এবং যখন অনেকখানি গুটিয়ে আনবে, তখনই পীর-ফকিরদের নাকি কান্না, নাকি চিৎকার শুরু হয়ে যাবে।

আমাদের পরীক্ষিত পদক্ষেপের সুরাহা নিম্নিত্তে বাংলাদেশে যত কলেজের অধ্যাপক আছে তাদের প্রত্যেকের হাতে সুফিবাদের উপর রচিত ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ তুলে দিতে চাই। আমরা ধরে নিয়েছি, আনুমানিক বিশ হাজার অধ্যাপকের হাতে একটি করে বই তুলে দিতে হলে বিশ হাজার বইয়ের প্রয়োজন। এভাবে উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, সাংবাদিক এবং হাই স্কুলের শিক্ষকদের হাতে বই তুলে দিতে হলে এক লক্ষ বইয়ের প্রয়োজন এবং এর আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে মাত্র বারো লক্ষ টাকা।

এই প্রচারের ফলে আর কিছু না হোক, কিছু একটা বেশ বড় রকমের ঝাঁকুনি যে খাবে তা হলফ করে বলা যায়। যদি অর্ধেক লোক ধাক্কা খায় তো আমাদের পরিশ্রম ও প্রচার সার্থক মনে করব। সুফিবাদে বিশ্বাসী বিভ-বৈভবের মালিক যিনি কেবল তাকেই অনুরোধ করব। অনুরোধ করব কৃপণতার আবরণটি খুলে, দ্বিধা-দ্বন্ধের কুয়াশা হতে আপসামুক্ত হয়ে,

ত্যাগের মহিমায় মহিমাবিত্ত হয়ে, ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটি সামনে রেখে আপনি কি একা, কেবলই একা এগিয়ে আসবেন? আপনার ছবি-নাম-ঠিকানা প্রতিটি বইতে থাকতে দিন। কিছুটা নয়, বরং সার্জনের ছুরিতে মরণপথযাত্রীকে বাঁচিয়ে তুলুন। কিছুটা অমরতার হালকা দোয়া, কিছুটা পাঠককুলের মনে বিস্ময় হয়ে থাক আপনার পবিত্র দান। সংসার সাজানোর আশার চমক আর পরিশ্রম একটি সীমিত বৃত্তে কিছুদিন অবস্থান করার পর নাতিদের কাছে নিবু নিবু স্থিতি হয়ে থাকবেন। তার চেয়ে অনেক অনেক অমরতার বারতা, অনেক অনেক শ্রদ্ধার আশীর্বাদ কি বয়ে আনবে না? এই বাংলাদেশে কি এমন একজন দানবীর পাবার আশাটি করতে পারি না যাঁর উসিলায় সুফিবাদের ব্যাপক প্রচার হবে?

পীরে সগীর আ'লা সগীর ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল-সুরেশ্বরী
গ্রাম: চুনকুটিয়া মধ্যপাড়া, ডাকঘর : শুভাঢ্যা, উপজেলা : কেরানীগঞ্জ,
ঢাকা।

১১ নভেম্বর ২০০৩ খ্রি, ২৭ কার্তিক ১৪১০ বাংলা, ১৫ রমজান
১৪২৪ হিজরি মঙ্গলবার।

এবং

বে-ঈমান হোমিও হল, ১০৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন : ০১৭১১-১২৮১৬৯।

কোরান অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা

আমরা কোরান-এর হুবহু অনুবাদ কর্মটি সর্বপ্রথম করে চলছি, আশা করি সম্পূর্ণ কোরান-এর অনুবাদটি দুই-তিন বছরের মধ্যে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারবো। আমরা অকপটে এ-ও স্বীকার করছি যে, কোরান-এর হুবহু অনুবাদ করতে গিয়ে যদি কোথাও বুঝতে না পারি, তা-ও লিখে দিব। আমরা বিশ্বাস করি, মহান রাক্বুল আলামিনের কোরান-এর সবটুকু অনুবাদ বুঝবার শক্তি আমাদের নাই। অতি দুঃখে এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই বিষয়টিও পাঠকদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, কোরান-এর অনুবাদ কেবল মনগড়া নয়, বরং সম্পূর্ণ উল্টাপাল্টা এবং বিকৃত, বানোয়াট অনুবাদ অনেক স্থানেই দেখতে পাই। আমরা এই কোরান-এর অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক আরবি ডিকশনারি এবং কোরান-এর লোগাতসমূহ বহু কষ্ট করে সংগ্রহ করেছি। আমাদের এই কোরান অনুবাদের বিরাট কার্যটি কতটুকু

সফল এবং সার্থক হয়েছে তা নির্ণয়ের ভার পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম। তবে আমাদের কাছে অনেক অনেক অনুরোধ এসেছে কোরান-এর অনুবাদটি করার জন্য। আমরা এতকাল এ জন্যই ধৈর্য ধারণ করেছি যে, এই কোরান-এর অনুবাদ করতে গেলে কোরান-এর অনেক নতুন-পুরাতন লোগাত (অভিধান) এবং প্রচলিত যত প্রকার আরবি ডিকশনারি পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করতে হবে। কেবল তাই নয়, আমরা কোরান-এর আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি এবং বাংলা তফসির সংগ্রহ করতে গিয়ে বৈরুত, মিসর, তেহরান, লাহোর, দিল্লি হতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কোরান-এর তফসির সংগ্রহ করেছি। আমরা তাড়াহড়ো করে অথবা ঝটপট করে কোরান-এর অনুবাদটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে চাই না। আমরা দৃষ্টিান্ত স্বরূপ এই বইতে কোরান-এর একটি সূরা ‘নজম’-এর অনুবাদটি হবহ তুলে ধরলাম। [বর্তমান সংস্করণে (২০০৮) সূরা ‘তোয়াহা’-র অনুবাদও দেওয়া হলো]। পাঠক বাজারে প্রচলিত অন্যান্য অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন আমাদের এই প্রয়াস কতটুকু সার্থক হয়েছে এবং সেই সঙ্গে কোরান-এর অনুবাদে যে-যে স্থানে সম্পূর্ণ উল্টাপাল্টা, মনগড়া, বিকৃত অনুবাদ করা হয়েছে সেটাও প্রচলিত অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার অনুরোধ করছি। আমাদের কথাগুলোতে একটা ঠিকত্বের গন্ধ অনেকেই নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খুঁজতে চাইবেন। কিন্তু আমরা জোর গলায় বলতে পারি যে, আপনাদের বিবেকের দৃষ্টিশক্তি বিস্তারিত হয়ে আপনাদের

কাছেই ফেরত আসবে। এরপরও আমরা অকপটে স্বীকার করব যে, আমাদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও যদি সামান্য ভুল-ত্রুটি থেকে থাকে উহা আমাদেরকে জানিয়ে দিলে আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, ভণ্ডামি করার চাইতে ভুল স্বীকার করে নেওয়া অনেক শ্রেয়।

সূরা নাজ্মের অনুবাদ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

১. ওয়ান্ নাজ্মে ইজা হাওয়া।

এবং তারকাসমূহ (ওয়ান্ নাজ্মে) যখন নিজ প্রবৃত্তির অধীন হয় (ইজা হাওয়া)।

২. মা দাল্লা সাহেবুকুম ওয়াম্মা গাওয়া।

তোমাদের সাথী (সাহেবুকুম) বিপথগামী নহে (মা দাল্লা) এবং
বিদ্বানও নহে (ওয়া মা গাওয়া)।

৩. ওয়া মা ইয়ানতেকু আনিল হাওয়া।
এবং (তিনি) কথা বলেন না (ওয়া মা ইয়ানতেকু) নিজ প্রবৃত্তি হইতে
(আনিল হাওয়া)।
৪. ইন্ হয়া ইল্লা ওয়াহযুই ইউহা।
যদিও উহা (ইনহয়া) হকুম করে (ওয়াহযুই) ওহি ছাড়া নয় (ইল্লা
ইউহা)।
৫. আল্লামাহ শাদিদুল কুয়া।
টাহাকে শিক্ষা দেওয়া হয় (আল্লামাহ) অনেক শক্তিশালী (কুয়া)
শক্তির মাধ্যমে (শাদিদ)।
৬. জু মেররাতিন, ফাস্তাওয়া।
তিনি নিজেকে দেখিয়াছেন (জু মেররাতিন)। সুতরাং তিনি স্থির
হইয়াছেন (ফাস্তাওয়া)।
৭. ওয়া হয়া বিলউফুকিল আলা।
এবং তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ (ওয়া হয়াল আলা) আকাশ দিগন্তে
(বিলউফুকে)।
৮. সুম্মা দানা, ফাতাদাল্লা।

তারপর (তিনি) নিকটে আসিলেন (সুম্না দানা) সুতরাং অতি নিকটে (ফাতাদান্না)।

৯. ফাকানা কাবা কাওসাইনে আও আদনা।

সুতরাং (তিনি) ছিলেন (ফাকানা) দুই ধনুকের ব্যবধানে (কাবা কাওসাইনে) অথবা আরও নিকটে (আও আদনা)।

১০. ফাআওহা ইলা আব্দেহী মা আওহা।

সুতরাং ওহি করিলেন (ফা আওহা) তাঁহার বান্দার দিকে (ইলা আব্দেহী) যাহা ওহি করিবার (মা আওহা)।

১১. মা কাজাবাল ফুয়াদু মা রাআ।

তাঁহার অন্তকরণ (ফুয়াদ) অস্বীকার করে নাই (মা কাজাবা) যাহা তিনি দেখিয়াছেন (মা রাআ)।

১২. আফাতুন্নাকুনাহ আলা মা ইয়ারা।

তোমরা কি তাঁহাকে অপবাদ দিবে? (আফাতুন্নাকুনাহ) যাহা উপরে (তিনি) দেখিয়াছেন (আলা মা ইয়ারা)।

১৩. ওয়া লাকাদ রাআহ নাজ্জলাতান উখরা।

এবং অবশ্যই তিনি দেখিয়াছেন (ওয়া লাকাদ রাআহ) নাজ্জেল (অবতীর্ণ) অবস্থায় (নাজ্জলাতান) দ্বিতীয়বার (উখরা)।

১৪. এনদা সেদরাতিল মুনতাহা।

নিষিদ্ধ (মুনতাহা) কুলব্ধের (বরই) নিকটে (এনদা সেদরাতে)।

১৫. এনদা হা জান্নাতুল মাওয়া।
উহা ছিল জান্নাতুল মাওয়ার নিকটে।
১৬. এজ্ ইয়াগশাস সিদরাতা মা ইয়াগশা।
যখন কুলবৃক্ষটি অন্ধকারেই আচ্ছাদিত ছিল (এজ্ ইয়াগশাস সিদরাতা) যেভাবে অন্ধকারে আচ্ছাদিত হবার (মা ইয়াগশা)।
১৭. মা জাগাল্ বাসারু ওয়া মা তাগা।
(তাঁহার) দৃষ্টিশক্তি ঢাকিয়া ছিল না (মা জাগাল্ বাসারু) এবং তিনি সীমা অতিক্রমও করেন নাই (ওয়া মা তাগা)।
১৮. লাকাদ রাআ মিন আয়াতে রাব্বেরিল কুবরা।
অবশ্যই (তিনি) দেখিয়াছেন (লাকাদ রাআ) তাঁহার রবের (নিকট) হইতে বড় আয়াত (নিদর্শন)। (মিন আয়াতে রাব্বেরিল কুবরা)।
১৯. আফারাআইতুমুল লাতা ওয়াল উজ্জা।
তোমরা কি দেখিয়াছ (আফারাআইতুম) লাত এবং উজ্জাকে?
২০. ওয়া মানাতাস্ সালেসাতাল উখরা।
এবং আরও একটি তৃতীয় মানাতকে?
২১. আলাকুম্বুজ্ জাকারু ওয়া লাহল উনসা।
তোমাদের জন্য কি পুরুষ (আলাকুম্বুজ্ জাকারু)! এবং তাঁহার জন্য কি নারী? (ওয়া লাহল উনসা)।
২২. তিলকা ইজান কেসমাতুন দিজা।

এটাই! (তিলকা) যখন বণ্টন পদ্ধতিটি হয় (ইজান কেসমাতুন) পক্ষপাতদুষ্ট (দিজা)।

২৩. ইন হিয়া ইল্লা আসমাতুন সাম্মাইতুমুহা আনতুম ওয়া আবাতকুম মা আনজালাল লাহ বেহা মিন সুলতানিন, ইন ইয়াত্তাবেউনা ইল্লাজ জান্না ওয়া মা তাহওয়াল আনফুসু, ওয়া লাকাদ জাআহম মের রাব্বেরহিমুল হদা।

এইগুলি কিছুই নয়! অথচ কিছু নামসমূহ (ইনহিয়া ইল্লা আসমাতুন) যাহাদের নামগুলি তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা রাখিয়াছিল (সাম্মাইতুমুহা আনতুম ওয়া আবাতকুম) আল্লাহ এই বিষয়ে তাঁহার বিধান হইতে কিছুই নাজেল (অবতীর্ণ) করেন নাই। (মা আনজালাল লাহ বেহা মিন সুলতানিন)। তোমরা তাহাই অনুসরণ করো অথচ যাহা তোমাদের ধারণায় আসে (ইন ইয়াত্তাবেউনা ইল্লাজ জান্না) এবং যাহা তোমাদের নফসসমূহের (প্রবৃত্তি) ইচ্ছায় আসে (ওয়া মা তাহওয়াল আনফুসু) এবং অবশ্যই তাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের রব হইতে হেদায়েত (পথ নির্দেশ)। (ওয়া লাকাদ জা আহম মের রাব্বেরহিমুল হদা)।

২৪. আম্ম লিল ইনসানে মা তামান্না।

মানুষের জন্য কি তাহা প্রযোজ্য! (আম্মলিল ইনসানে) যাহা সে আশা করে? (মা তামান্না)।

২৫. ফালিল্লাহিল আখেরাতু ওয়াল উলা।

সুতরাং আল্লাহর জন্যই শেষ এবং শুরু (আখেরাতু ওয়াল উলা)।

২৬. ওয়াকাম মিন মালাকিন ফিস সাম্মাওয়াতে লা তুগনি শাফাতুহুম শাইয়ান ইল্লা মিন বাআদে আইইয়াজানাল্লাহ লেম্মাই ইয়াশাউ ওয়া ইয়ারদা।

এবং আকাশের মধ্যে কতক ফেরেস্তা হইতে রহিয়াছে। (ওয়া কাম মিন মালাকিন ফিস সাম্মাওয়াতে)। তাহারা কেহই কোনো বিষয়েই সুপারিশ করিতে সক্ষম নয় (লা তুগনি শাফা আতুহুম শাইয়ান) একমাত্র যতক্ষণ না আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা হকুম করেন। (ইল্লা মিন বাআদে আইইয়াজানাল্লাহ) অথবা যাহার উপর তিনি ইচ্ছা করেন এবং সন্তুষ্ট থাকেন (লেম্মাই ইয়াশাউ ওয়া ইয়ারদা)।

২৭. ইন্নাল্লাজিনা লা ইউম্নেনুনা বিল আখেরাতে লাইউসাম্মুনাল মালায়িকাতা তাসমিয়াতুল উনছা।

নিশ্চয়ই যাহারা আখেরাতের প্রতি ইমান রাখে না (ইন্নাল্লাজিনা লা ইউম্নেনুনা বিল আখেরাতে) তাহারা ফেরেস্তাদের জন্য নাম রাখে নারীবাচক নাম হইতে। (লাইউসাম্মুনাল মালায়িকাতা তাসমিয়াতুল উনছা)।

২৮. ওয়াম্মা লাহুম বিহি মিন এলমিন, ইইয়াত্তাবেউনা ইল্লাজ জান্না, ওয়া ইন্নাজ জান্না লা ইউগনি মিনাল হাক্কৈ শাইয়ান।

এবং তাহাদের জ্ঞান নাই জ্ঞান হইতে কোনো বিষয়ে। (ওয়াম্মা লাহম্বি বিহি মিন এলম্বিন) তাহারা অনুসরণ করে একমাত্র অনুমানের। (ই-ইয়াত্তাবেউনা ইল্লাজ জাল্লা) এবং নিশ্চয়ই অনুমান কখনও সত্য হইতে সক্ষম নয় (ওয়া ইন্নাজ জাল্লা লা ইউগনি মিনাল হাক্কে শাইয়ান)।

২৯. ফাআরেদ আনমান তাওয়াল্লা আন জিক্রিনা ওয়া লাম্ব ইউরেদ ইল্লাল হায়াতাদ দুনিয়া।

সুতরাং যাহারা আমাদের জিকির (স্মরণ) হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে (ফা আবেদ আনমান তাওয়াল্লা আন জিক্রিনা) তাহাদেরকে (আরেদ) এড়াইয়া চলো এবং তাহারা কোনো কিছুই আশা করে না দুনিয়ার জীবন ব্যতীত। (ওয়ালাম্ব ইউরেদ ইল্লাল হায়াতাদ দুনিয়া)।

৩০. জালিকা মাবলাগ্হম্ব মিনাল এলম্বে, ইন্না রাব্বাকা হয়া আলাম্বু বেমান দাল্লা আন সাবিলিহি ওয়া হয়া আলাম্বু বেমানিহ তাদা।

জ্ঞান বিষয়ে তাহাদের দৌড় ঐ পর্যন্তই। (জালিকা মাবলাগ্হম্ব মিনাল এলম্বে) নিশ্চয়ই তোমার রব ভালোই জানেন কে বিপথগামী তাঁহার পথ হইতে। (ইন্না রাব্বাকা হয়া আলাম্বু বেমান দাল্লা আন সাবিলিহি) এবং তিনি ভালোই জানেন কে সু-পথপ্রাপ্ত (ওয়া হয়া আলাম্বু বেমানিহ তাদা)।

৩১. ওয়া লিল্লাহে মা ফিস্ সাম্মাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদে লেইয়াজযিয়াল লাজিনা আসাউ বেমা আমেলু ওয়া ইয়াজযিয়াল লাজিনা আহসানু বিলহসনা।

এবং আকাশের মধ্যে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহর জন্য। (ওয়া লিল্লাহে মাফিস্ সাম্মাওয়াতে ওয়া মা ফিল আরদে)। যাহাদের কর্মগুলো মন্দ, তাহাদের জন্য মন্দ পুরস্কার (লেইয়াজ যিয়াল লাজিনা আসাউ বেমা আমেলু) এবং যাহারা সং কর্ম করে তাহাদের পুরস্কার অতি উত্তম। (ওয়া ইয়াজযিয়াল লাজিনা আহসানু বিলহসনা)।

৩২. আল্লাজিনা ইয়াজতানেবুনা কাবাইরাল ইস্মে ওয়াল ফাওয়াহেশা ইল্লাল লামাম্মা, ইন্না রাব্বাকা ওয়াসেউল মাগফেরাতি, হয়া আলামু বেকুম্ব এজ্জান্শাআকুম্ব মিনাল আরদে ওয়া এজ্জ আনতুম্ব আজিন্নাতুন ফি বুতুনে উম্মাহাতেকুম্ব, ফালা তুজাক্কু আনফুসাকুম্ব, হয়া আলামু বেমানিত্তাকা।

যাহারা নিজেদেরকে বিরত রাখে বড় বড় পাপ এবং ফাহেশা (অশ্লীল) কর্ম হইতে ছোট পাপ ব্যতীত। (আল্লাজিনা ইয়াজতানেবুনা কাবাইরাল ইস্মে ওয়াল ফাওয়াহেশা ইল্লাল লামাম্মা)। নিশ্চয়ই তোমার রব ক্রমা বিষয়ে অপরিসীম (ইন্না রাব্বাকা ওয়াসেউল মাগফেরাতে), তিনি তোমাদের বিষয়ে ভালোই জানেন, যখন

তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন পৃথিবী হইতে (হয়া আলামু বেকুম এজ্ আনশায়াকুম মিনাল আরদে) এবং যখন তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটের মধ্যে ভ্রূণরূপে (সৃষ্টি করিয়াছেন)। (ওয়া এজ্ আনতুম আজেন্নাতুন ফি বুতুনে উন্মাহাতেকুম) সুতরাং তোমরা তোমাদের নফসের পবিত্রতা প্রকাশ করিও না (ফালা তুজাককু আনফুসাকুম) তিনিই ভালো জ্ঞানেন তোমাদের মধ্যে কে তাকওয়াকারী (হয়া আলামু বেমানিত্তাকা)।

৩৩. আফারা আইতাল্লাজি তাওয়াল্লা।

তুমি কি দেখিয়াছ তাঁহাকে! (আফারা আইতাল্লাজি) যে মুখ ফিরাইয়া নেয়? (তাওয়াল্লা)।

৩৪. ওয়া আতা কালিলান ওয়া আক্দ্দা।

এবং দান করে সামান্য এবং তাকিদ দেয় (আক্দ্দা)।

৩৫. আ-এনদাহ এলমুল গাইবে ফাহয়া ইয়ারা।

তাহার নিকট কি গায়েবের (অদৃশ্য) জ্ঞান আছে? সুতরাং সে কি উহা দেখে? (ফাহয়া ইয়ারা)।

৩৬. আম্লাম ইউনাব্বা বেমা ফি সহফে মুসা।

তাহাকে কি খবর দেওয়া হয় নাই! যাহা আছে মুসার কেতাব-এর মধ্যে? (ফি সহফে মুসা)।

৩৭. ওয়া ইব্রাহীমাল্লাজি ওয়াফ্ফা।

এবং ইব্রাহিম, যিনি (দায়িত্ব) পরিপূর্ণকারী (ওয়াফা)।

৩৮. আল্লা তাঈর ওয়াজেরাতুন বিজরা ওখরা।
সাবধান (আল্লা) একে-অপরের বোঝা বহন করিবে না (ওয়াজেরাতুন বিজরা ওখরা)।
৩৯. ওয়া আল্ লাইসা লিল্ ইনসানে ইল্লা মাসাআ।
এবং মানুষের জন্য কিছুই নাই, তাহার প্রচেষ্টা (সাআ) ব্যতীত।
৪০. ওয়া আন্না সাইয়াহ সাওফা ইউরা।
এবং নিশ্চয়ই তাহার প্রচেষ্টাকেই (সাইয়াহ) অচিরেই (সাওফা) সে দেখিবে (ইউরা)।
৪১. সুন্না ইউজ্জাহল জাজাআল আওফা।
তারপর তাকে পুরস্কৃত করা হইবে (ইউজ্জাহ) একটি পরিপূর্ণ পুরস্কার (জাজাআল আওফা)।
৪২. ওয়া আন্না ইলা রাব্বিকাল মুনতাহা।
এবং নিশ্চয়ই তোমার রবের দিকেই তোমার শেষ পরিণতি (মুনতাহা)।
৪৩. ওয়া আন্নাহু হুয়া আদহাকা ওয়া আবকা।
এবং নিশ্চয়ই তিনিই (তোমাকে) হাসান (আদহাকা) এবং (তোমাকে) কাঁদান (আবকা)।
৪৪. ওয়া আন্নাহু আমাতা ওয়া আহইয়া।

এবং নিশ্চয়ই তিনি (তোমাকে) মৃত্যু (আম্বাতা) দেন এবং জীবন (আহিয়া) দান করেন।

৪৫. ওয়া আন্নাহ খালাকাজ্ জাওজাইনিজ্ জাকারা ওয়াল উনছা।
এবং নিশ্চয়ই তিনিই নারী (উনছা) এবং পুরুষ (জাকারা) যুগল (জাওজাইনে) সৃষ্টি করিয়াছেন।

৪৬. মিন নুত্ফাতিন ইজা তুম্না।
বীর্য (নুত্ফাতিন) হইতে যাহা ছিল ঘুমন্ত (তুম্না)।

৪৭. ওয়া আন্না আলাইহিন্ নাশাতাল উখ্ৰা।
এবং নিশ্চয়ই আমরা চাইব (নাশাতা) আর একবার (উখ্ৰা) তাহার উপরে (আলাইহে)।

৪৮. ওয়া আন্নাহ হয়া আগ্না ওয়া আক্না।
এবং নিশ্চয়ই তিনি সম্পদশালী (আগ্না) করেন এবং প্রাচুর্যতা (আক্না) দান করেন।

৪৯. ওয়া আন্নাহ হয়া রাব্বুশ শেরা।
এবং নিশ্চয়ই তিনিই শক্তিশালী নরকের (শেরা) রব।

৫০. ওয়া আন্নাহ আহলাকা আদানিল উলা।
এবং নিশ্চয়ই তিনিই প্রথম (উলা) আদ জাতিকে ধ্বংস (আহলাকা) করিয়াছেন।

৫১. ওয়া সামুদা ফাম্ম আব্কা।

এবং সামুদ্র জাতিকে সুতরাং (রহিল না কেহ) অবশিষ্ট (আবকা)।

৫২. ওয়া কাওমা নুহিন মিন কাবলি ইন্নাহম কানু হম আজলামা
ওয়া আত্গা।

এবং পূর্ব হইতেই (ছিল) নুহের কাওম, নিশ্চয়ই তাহারা ছিল অধিক
জালেম (আজলামা) এবং অধিক অবাধ্য (আত্গা)।

৫৩. ওয়াল মোতাকাতা আহওয়া।

এবং বস্তুগুলিকে (মোতাকাতা) উল্টাইয়া দিলেন (আহওয়া)।

৫৪. ফা গাশ্শাহা, মা গাশ্শা।

সুতরাং উহাদেরকে অন্ধকারে ঢাকিয়া দিলেন (ফা গাশ্শাহা) যেভাবে
অন্ধকারে ঢাকার প্রয়োজন ছিল (মা গাশ্শা)।

৫৫. ফাবেআইয়ে আলায়ে রাব্বিকা তাতামারা।

সুতরাং তুমি তোমার রবের কোন নেয়ামতকে (আলায়ে) মিথ্যা
প্রতিপন্ন করিবে (তাতামারা)?

৫৬. হাজা নাজিরুম মিনান নুজুরিল উলা।

এই ভয় প্রদর্শনকারী তো (নাজিরুম) প্রথম ভয় প্রদর্শনকারীগণ
হইতে? (মিন নুজুরিল উলা)।

৫৭. আজ্জেফাতিল আজ্জেফাতু।

যাহা আসিবার (আজ্জেফাত) তাহা আসিবেই (আজ্জেফাতু)।

৫৮. লাইসা লাহা মিন দুনিলাহে কাশেফাতুন।

তাদের জন্য কেহই নাই (লাইসা) আল্লাহ্ ছাড়া প্রকাশ করার
(কাশেফাতুন)।

৫৯. আফামিন হাজ্জাল হাদিসে তাজাবুনা।

তোমরা কি এই কথা হইতে অবাক হইতেছ (তাজাবুনা)?

৬০. ওয়া তাদ্হাকুনা ওয়ালা তাব্কুনা।

এবং (তোমরা) কি হাসাহাসি করিতেছ (তাদ্হাকুনা)! এবং
কান্নাকাটি করিবে না (তাব্কুনা)।

৬১. ওয়া আনতুম সাম্মেদুনা।

এবং তোমরা তো (সবাই) উদাসীন (সাম্মেদুনা)

৬২. ফাসজুদু লিল্লাহে ওয়াবুদু।

সুতরাং আল্লাহর জন্য সেজদা করো এবং এবাদত করো।

সূরা তায়্যাহা
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

১. তোয়াহা (ইহার অর্থ সিনার এলেক্সের অধিকারী ব্যক্তির নিকট হইতে জানিয়া লইতে হয়)।
২. আমরা নাজেলা করি নাই কোরান আপনার উপর কষ্ট দিবার জন্য।
(মা আনজালনা আলাইকাল কোরআনা লিতাশ্কা)।
৩. একমাত্র যাহারা ভয় করে (তাহাদের জন্য) উপদেশ।
(ইল্লা তাঙ্কেরাতাল্ লিমাঈ ইয়াখশা)।
৪. একটি নাজেলা তাঁহার (আল্লাহ) হইতে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পৃথিবী
এবং ঊঁচু আকাশসমূহ।
(তান্জিলাম্ মিম্ মান্ খালাকাল্ আরদা ওয়াস্ সাম্মাওয়াতিল্ উলা)।
৫. রহমান (যিনি) আরশের উপরে বসিয়া আছেন।
(আর্ রাহমানু আলাল্ আরশিস্ তাওয়া)।
৬. তাঁহারই জন্য আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে (আরদ্ব অর্থে মাটিকেও
বোঝানো হয় এবং মানবদেহটিকেও বোঝানো হয়) এবং দুইয়ের
মাঝখানে যাহা কিছু আছে এবং যাহা কিছু জমিনের নিচে আছে।
(লাহ্ মাফিশ্ সাম্মাওয়াতি ওয়াম্মা ফিল্ আরদি ওয়াম্মা বাইনাহম্মা
ওয়াম্মা তাহতাসারা)।
৭. এবং যদি আপনি ঊঁচু গলায় কথা বলেন সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি জানেন
গোপন এবং গোপনের গোপন।

(ওয়া ইন্ তাহ্‌হার বিল্‌কাউলি ফাইন্‌নাহ ইয়ালামুস্‌ সিররা ওয়া আখ্‌ফা)।

৮. তিনিই আল্লাহ, নাই কোনো ইলাহ একমাত্র তিনি ছাড়া, তাঁহারই জন্য সুন্দর নামগুলি।

(আল্লাহ্‌ লা ইলাহা ইল্লাহ্‌ লাহল্‌ আস্‌মাউল্‌ হুস্‌না)।

৯. এবং আপনার কাছে আসিয়াছে কি মুসার খবর?

(ওয়া হাল্‌ আতাকা হাদিসু মুসা)।

১০. যখন দেখিলেন আগুন (ইজ্‌ রাত্‌আ নারান্‌) সুতরাং বলিলেন তাঁহার আহালদেরকে (পরিবারবর্গকে) (ফাকাল্লা লি আহ্‌লে) তোমরা অপেক্ষা করো, নিশ্চয়ই আমি আগুন দেখিয়াছি, হয়তো উহা হইতে আমি তোমাদের জন্য লইয়া আসিব জ্বলন্ত আগুনের কথা (কাবাসুন)। অথবা পাইব আগুন হইতে কোনো পথপ্রদর্শক (হদান)। (ইজ্‌ রাত্‌আ নারান্‌ ফাকাল্লা লি আহ্‌লি ইম্‌ কুসু ইন্‌নি আনাস্তু নারান্‌ লা আল্‌লি আতিকুম্‌ মিন্‌ হা বিকাবাসিন্‌ আওআজ্‌জিদু আলান্‌নারি হদান)।

১১. সুতরাং যখন আসিলেন আগুনের নিকট, তখন ডাক দেওয়া হইল (নুদিয়া) (অদৃশ্য হইতে), হে মুসা।

(ফালাম্মা আতাহা নুদিয়া ইয়া মুসা)।

১২. নিঃসন্দেহে আমি আপনার রব (পালনকর্তা) সূতরাং আপনার জুতা দুইটি খুলিয়া ফেলুন। কেননা আপনি এখন তুয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় (ওয়াদিল) অবস্থান করিতেছেন।
(ইন্নি আনা রাব্বুকা ফাখলা নালাইকা। ইন্নাকা বিল্ ওয়াদিল্ মুকাদ্দাসি তুয়া)।
১৩. এবং আমি আপনাকে মনোনীত করিয়াছি সূতরাং শুনুন যাহা আপনার উপরে ওহি করা হইয়াছে।
(ওয়া আনাখ্ তারতুগা ফাস্তাম্মি লিম্মা ইউহা)।
১৪. নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, নাই কোনো ইলাহ (কর্তা, নেতা, অধিকারী, মাবুদ) একমাত্র আমিই, সূতরাং আমারই এবাদত করুন এবং সালাত কায়েম করুন জিকিরের (সংযোগ, যোগাযোগ) জন্য।
(ইন্নানি আনাল্লাহ্ লাইলাহা ইল্লা আনা ফাবুদুনি ওয়া আকিমুস্ সালাতা লি জিক্রি)।
১৫. নিশ্চয়ই সেই সময়টি আসিতেছে (সেই সংঘটন মুহূর্তটি) গোপন রাখিয়া দেই যাহাতে প্রত্যেক নফস (জীবাত্মা) পায় আপন আপন (নফসের) কর্মের ফল।
(ইন্না সাআতা আতিয়াতুন আকাদু উখফিহা লিতুজ্জা কুল্লু নাফসিন্ বিম্মাতাস্আ)।

[সূরা তোয়াহা ১৫ নম্বর আয়াতটি গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে ‘সাত্মাত’ শব্দটি দিয়ে একটি নফসের মৃত্যু-ঘটনার কথাটি পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যভাবে ‘সাত্মাত’-কেও কেয়ামত বলা চলে। কিন্তু কোরান-কেয়ামত শব্দটি ব্যবহার না করে ‘সাত্মাত’ শব্দটি ব্যবহার করে প্রত্যেকটি নফসের কর্মফলগুলোকে গোপন রেখে আপন আপন নফসের কর্ম অনুযায়ী ফলটি দেবার কথাটি ঘোষণা করা হয়েছে। এই অর্জিত কর্মফলের চাকায় বারবার পিষ্ট হতে হতে নফস একদিন সব রকম জঞ্জাল ও বুটঝামেলা হতে মুক্তি পাবার আশাটি করতে পারে। আমার মনে হয়, এই রকমই একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কথাটিকে গোপন রাখা হয়। কেউ যদি ‘সাত্মাত’-কে কেয়ামতও বলতে চান তাতেও আমাদের আপত্তি থাকে না। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করার বিষয়টি হলো, কেবলমাত্র নফসের উপরেই ‘সাত্মাত’-এর কথাটি বলা হয়েছে। কোনো পাহাড়-পর্বত, কোনো নদী-নালা-সাগরের উপর ‘সাত্মাত’ নামক ঘটনাটি ঘটে যাবার কথাটি কোরান-এর একটি স্থানেও আমরা পাই না। কেবলমাত্র প্রতিটি নফসের উপরে তথা জীবাত্মার উপরে ‘সাত্মাত’-এর ঘটনাটি ঘটে যাবার কথাটি কোরান স্পষ্ট ঘোষণা করছে]।

১৬. সুতরাং তোমার উপর ইমান আনে না, এবং অনুসরণ করে তাহার খেয়ালখুশিমতো, (হাওয়া হ) তাহা হইলে বিনাশ (ফাতারদা) অবধারিত।

(ফালা ইয়া সুদান্নাকা আনহা মাল্লা উইমিনু বিহা ওয়াত্তারাআ হাওয়া হ ফাতারদা)।

[(সাত্তার উপরে) সুতরাং বিশ্বাস করতে পারে না বলেই যারা নিজেদের খেয়ালখুশিমতো চলে তাদের বিনাশ যে অবধারিত এই কথাটি আমরা এই আয়াতে পাই। আপন খেয়ালখুশিমতো চলাটাই হলো ইসলামে একমাত্র অপরাধ। আর কোনো অপরাধ ইসলামে নাই বললেই চলে। কারণ খেয়ালখুশির সঙ্গে খান্নাসরুপী শয়তানের অবস্থান আছে বলেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার তথা বিনাশ হয়ে যাওয়ার সাবধান বাণীটি কোরান আম্মাদেরকে জানিয়ে দিল। খেয়ালখুশির সঙ্গেই খান্নাসরুপী শয়তান অবস্থান করে বলেই আল্লাহর দরবারে খেয়ালখুশিমতো চলাটিকে গুরুতর অপরাধ না বলে একমাত্র অপরাধ বলা হয়েছে এবং এই একমাত্র অপরাধের পরিণাম যে সম্মূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া তথা বিনাশ হয়ে যাওয়া, সেই কথাটি কোরান প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিল। যদি খেয়ালখুশির সঙ্গে খান্নাসরুপী শয়তানের অবস্থান না থাকত তা হলে আপন খেয়ালখুশিমতো না চলার জন্য কোরান সাবধান করে দিত না। কেবলমাত্র সাবধান করেই দেওয়া

হলো না, বরং এই খেয়ালখুশিমতো চলা তথা এককথায় আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করাটি যে মহাঅপরাধ এবং পরিণামটিও যে একটি মহাধ্বংস সেই সতর্কবাণীটি আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো। আমরা জানি, সমস্ত রকম পাপপঙ্কিলতার জনকই হলো খান্নাসরূপী শয়তান নামক গুরুঠাকুর। কোরান-এর বহু আয়াতে শয়তানের অনুসরণ করতে তথা এড়াতে করতে বারবার সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। কারণ জগতের যত রকম আকাম-কুকাম তথা অপকর্মগুলো এই খান্নাসরূপী শয়তান নামক গুরুঠাকুরই করিয়ে থাকে এবং এর পরিণামগুলো যে কত বড় ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছে প্রাচীন ইতিহাস হতে আজও এর ভয়ঙ্করতাটি মর্মে মর্মে বুঝতে পারি। তাই কোরান বলছে, ‘ফাতারদা’ তথা তোমার ধ্বংস হয়ে যাবার পরিণতিটি অতি নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটু বলতে হয় যে, যারা নিজেদের খেয়ালখুশিমতো চলে তাদেরকে ‘নফসে আঙ্গারা’-র অধিকারী বলা হয়েছে। ‘আঙ্গারা’ অর্থ হলো খান্নাসরূপী শয়তানযুক্ত নফস। এখানে নফস অপবিত্র নয়, বরং নফস পবিত্র; কিন্তু এই নফসের সঙ্গে যখন খান্নাসরূপী শয়তানের অবস্থানটি থাকে তখনই নফসটি কলুষিত হয়ে পড়ে। আমি এখানে বারবার নফস শব্দটি ব্যবহার করলাম, যদিও বাংলা ভাষায় এই নফসটিকে জীবাত্মা বলা হয়। জীবাত্মা মোটেই কোনো দোষণীয় ব্যাপার নহে। অনেকেই না-বুঝে না-শুনে

জীবাত্মাটিকেই গালিগালাজ করে, কিছু জীবাত্মার সঙ্গে যখন খান্নাসরূপী শয়তানটির অবস্থান ঘটে তখনই জীবাত্মাটি কলুষিত হয়ে পড়ে এবং তখনই এই কলুষিত জীবাত্মাটি আপন খেয়ালখুশিমতো চলে এবং চলতে চায়। ইহাকেই আবার বাংলা ভাষায় অতি সংক্ষেপে ‘আমিত্ব’ বলা হয়ে থাকে। অনেক সময় ‘অহম’-ও বলা হয়। ‘আমি’ যোগ ‘ত্ব’ সম্মান সম্মান ‘আমিত্ব’। এই ‘ত্ব’-টিই হলো খান্নাসরূপী শয়তান। আমি একা, কিছু আমার সঙ্গে তথা আমার প্রাণের সঙ্গে তথা আমার নফসের সঙ্গে যখন ‘ত্ব’-টি যোগ হয় তখনই বুঝতে হবে যে আমার নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটিও বহাল তবীয়তে অবস্থান করছে। অনেক মোটা বুদ্ধির জ্ঞানীজনেরা খান্নাসরূপী শয়তানের অবস্থানটিকে উল্লেখ না করে, বিশদ ব্যাখ্যা না দিয়ে ‘আমি’-টাকেই ফেলে দেয়, তথা নফসটিকেই ফেলে দেয়, তথা নফসটাকেই ঘৃণা করতে শেখায়। ইহা নিঃসন্দেহে একটি জঘন্য ভুল। মারাত্মক ভ্রম। আমি তথা নফস কোনোদিন কোনোকালেও অপবিত্র নই এবং কোরান-এ একটি স্থানেও কেবলমাত্র নফসটির অবস্থানকে অপবিত্র, কলুষিত বলা হয় নাই। নফস একা, নিছক একা। আরবিতে এই নিছক একা নফসটিকে বলা হয় ‘উদ্‌উনি’। যেইমাত্র একমাত্র নফসটির সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটি যুক্ত হয়ে যায়, তখনই দুইজনের অবস্থানটি বোঝানো হয়ে থাকে, যাকে বলা হয় ‘উদ্‌উনা’। তাই

আমরা কোরান-এর সূরা মোমিনের ষাট নম্বর আয়াতে দেখতে পাই যে আল্লাহ জাল্লা শানাহ বলেছেন, ‘আম্মাকে একা ডাকো, ডাকের জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাবে।’ যেহেতু আম্মার নফসটির সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটি বহাল তবীয়তে অবস্থান করছে তাই আমি তথা আম্মার নফসটি মোটেই একা নয়, বরং দুইজন। দুইজনকে আরবি ভাষায় ‘উদউনা’ বলা হয়। এই দুইজনের অবস্থানটি থাকা অবস্থায় মেজাজি এবাদত-বন্দেগি অনেক করা যায়, কিন্তু ফলটি শূন্য। সমগ্র কোরান এই একটিমাত্র কথাটিকে বোঝাবার জন্য এত কথা, এত আদেশ, এত উপদেশ, এত সতর্কতা নামক আরও বহু বিশেষণে বান্দাকে সাবধান করে দিয়েছে। তিরিশ পারা কোরান-এ মাত্র একটি আদেশ, মাত্র একটি উপদেশ, আর সেই আদেশ ও উপদেশটি হলো: হে মানুষ, তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য এই দুনিয়াতে তোমার সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে দেওয়া হয়েছে। ইহাকে তাড়িয়ে দাও। তাড়াতে পারলেই চঞ্চলতা, অস্থিরতা, অহংকার, গর্ব, ঠাটবাঁট, সব কিছুর অবসান হয়ে নফসটি এতমেনান লাভ করে। এই এতমেনান অর্জনকারী নফসটিকে জাল্লাতে প্রবেশ করার সুসংবাদ দিচ্ছে কোরান।

১৭. এবং ওইটা কী তোমার ডান হাতে, (বিইয়ামিনিকা), হে মুসা?
(ওয়াম্মা তিল্কা বিইয়ামিনিকা ইয়া মুসা)।

১৮. তিনি বলিলেন, ইহা আমার লাঠি (আসাইয়া) ইহার উপরে আমি ভর দেই, এবং পাতা ঝারি, তাহা দিয়া, আমার ছাগলদের উপর (গানামি) এবং আমার আছে তাহার দ্বারা আরও প্রয়োজনগুলি। (কাল হিয়া আসাইয়া আতাওয়াক্কাউ আলাইহা ওয়া আহশু বিহা আলা গানামি ওয়ালিয়া ফিহা মাআরিবু উখরা)।
১৯. (আল্লাহ) বলিলেন, আপনি ইহা নিক্ষেপ করুন, হে মুসা। (কাল আল কেহা ইয়া মুসা)।
২০. সুতরাং তিনি নিক্ষেপ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহা সাপ হইয়া চলিতে লাগিল। (ফাআল্কাহা ফাইজা হিয়া হাইয়াতুন তাস্যা)।
২১. (আল্লাহ) বলিলেন (কাল) তাহা ধরুন (খুজ্হা) এবং ভয় করিবেন না (ওয়া লা তাকাফ), উহাকে আমরা ফিরাইয়া দিব (সানুইদুহা) তাহার আগের অবস্থায় (সিরাতাহাল উলা)।
২২. এবং চাপাইয়া ধরুন (ওয়াদমুন) আপনার হাত (ইয়াদাকা) আপনার বগলের দিকে (ইলা জানাহিকা) বাহির হইবে (তাখরুজ) সাদা (বাইদোয়াআ) খুঁত ছাড়া (মিন্ গাইরি সুইন্) এবং আরেকটি দৃষ্টান্ত (আয়াতান উখরা)।
২৩. আপনাকে যেন আমরা দেখাই (লিনুরিইয়াকা) আমাদের বড় বড় (কুবরা) নিদর্শন হইতে (মিন্ আয়াতিনাল)

(লিবুরিইয়াকা মিন্ আয়াতিল্ কুব্‌রা)।

২৪. আপনি যান (ইজ্‌হাব্) ফেরাউনের দিকে (ইলা ফিরআউনা) নিশ্চয়ই সে (ইন্নাহ্) সীমালঙ্ঘন করিয়াছে (তোয়াগা)।
২৫. (মুসা) বলিলেন (কাল) ‘আম্মার রব (রাব্বি) প্রসারিত করুন (ইশ্‌রাহ্) আম্মার জন্য (লি) আম্মার বুক (সাদরি)।
২৬. এবং (ওয়া) সহজ করুন (ইয়াস্‌সির্) আম্মার জন্য (লি) আম্মার কাজ (আম্মরি)।
২৭. এবং খুলিয়া দিন (ওয়াহলুল্) আম্মার তোতলাম্বি (জুড়তা) (উক্‌দাতাম্) আম্মার জিহ্বার (মিল্লিসানি)।
২৮. তাহারা বোঝে (ইয়াব্‌কাহ্) আম্মার কথা (কাউলি)।
২৯. এবং বানাইয়া দাও (ওয়াজ্‌আল্) আম্মার জন্য (লি) একজন সাহায্যকারী (ওয়াজিরাম্) আম্মার পরিবারের মধ্য হইতে (মিন্ আহ্‌লি)।
৩০. হারুনকে (হারুনা) আম্মার ভাই (আখি)।
৩১. মজবুত (শক্ত, কঠিন) করুন (উশ্‌দুদ্) তাহাকে দিয়া (বিহি) আম্মার শক্তি (আজ্‌রি)।
৩২. এবং (ওয়া) তাহাকে শরিক করুন (আশ্‌রিক্‌হ্) আম্মার কাজের মধ্যে (ফি আম্মরি)।

৩৩. যেন (কাই) আমরা আপনার গুণকীর্তন করিতে পারি
(নুসাববিহাকা) বেশি বেশি (কাশিরা)।
৩৪. এবং (ওয়া) আমরা আপনার জিকির করিতে পারি
(নাঙ্কুরুকা) বেশি বেশি (কাশিরা)।
৩৫. নিশ্চয়ই আপনি (ইন্নাকা) আছেন (কুন্তা) আমাদের উপর
(বিনা) দর্শনকারী (বাসিরা)।
৩৬. বলিলেন (কাল) নিশ্চয়ই (কাদ) আপনাকে দেওয়া হইল
(উতিতা) আপনার চাওয়া (সুলাকা) হে মুসা (ইয়া মুসা)।
৩৭. এবং নিশ্চয়ই (ওয়া লাকাদ) আমরা অনুগ্রহ করিয়াছিলাম
(মানান্না) আপনার উপর (আলাইকা) একবার (মাররাতান) আরও
(উখরা)।
৩৮. যখন (ইজ্জ) আমরা ওহি করিয়াছিলাম (আওহাইনা) দিকে
(ইলা) আপনার মাতার (উম্মিকা) যাহা ওহি করা হয় (মা উইহা)।
৩৯. যে (আনি) তাহাকে ফেলিয়া দেন (ইক্ জিফিহি) সিন্দুকের মধ্যে
(ফিত্তাবুতি) সুতরাং তাহা নিক্ষেপ করুন (ফাত্জিফিহি) নদীর মধ্যে
(ফিল্ ইয়াম্মি) সুতরাং তাহা ঠেলিয়া দিবে (ফাল্ ইউল্কিহি) নদী
(ইয়াম্মু) তীরে (বিস্সাহিলি) তাহা তুলিয়া লইবে (ইয়া খুজুহ)
আমার (আল্লাহ) শত্রু (আদউল্লি) এবং তাহার (মুসা) শত্রু (ওয়া
আদউল্লাহ) এবং আমি ঢালিয়া দিয়াছিলাম (ওয়া আল কাইতু)

আপনার উপরে (আলাইকা) ভালোবাসা (মাহাব্বাতাম্ম) আমার পক্ষ হইতে (মিন্‌নি)। এবং আপনি যেন প্রতিপালিত হন (ওয়ালি তুস্না) আমার চোখের উপরে (সাম্নে) (আলা আইনি)।

৪০. যখন তোমার বোন চলিতেছিল সুতরাং বলিয়াছিল তোমাদের খবর দিব কি? উপরে তাহাকে কে লালন-পালন করিতে পারে? (ইজ্‌তাম্মশি উখতুকা ফাতাকুলু হাল্ আদুল্লুকুম্ম আলা মাই ইয়াক্‌ফুলুহ)। সুতরাং আপনাকে আমরা (আল্লাহ) ফিরাইয়া দিলাম আপনার মায়ের দিকে (ফারাজানাকা ইলা উম্মিকা) তাহার চোখ যেন জুড়ায় (কাই তাকাররা আইনুহা) এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত (দুঃখ) না হয় (ওয়ালা তাহ্‌জান) এবং আপনি হত্যা করিয়াছিলেন একটি নফস (এক ব্যক্তি) সুতরাং আপনাকে আমরা (আল্লাহ) মুক্তি দিয়াছিলাম দুশ্চিন্তা হইতে (ওয়াকাতালতা নাফসান্ ফানায্‌জ্‌জাইনাকা মিনাল্ গাম্‌বে) এবং (ওয়া) আপনাকে আমরা (আল্লাহ) পরীক্ষা করিয়াছি (ফাতান্নাকা) পরীক্ষা (ফুতুনা) (ওয়া ফাতান্নাকা ফুতুনা) সুতরাং আপনি অবস্থান করিয়াছিলেন মাদায়েনের অধিবাসীদের মধ্যে বছর (সিনিনা) (ফালাবিস্তা সিনিনা ফি আহ্‌লে মাদ্‌ইয়ান)। তারপর আপনি আসিয়াছেন উপরে (আলা) নির্ধারিত সময়ে (কাদারিন) হে মুসা। (সুম্মা জিতা আলা কাদারি ইয়া মুসা)।

৪১. এবং আপনাকে আমি তৈরি করিয়াছি আমার নিজের জন্য (ওয়াস্তানাখতুকা লি নাক্‌সি)।

[এই আয়াতটি হবহ অনুবাদ করলাম সত্য, কিন্তু ইহার অর্থটি একদম বুঝতে পারলাম না। কারণ এই আয়াতে ইহাও প্রমাণিত হচ্ছে যে আল্লাহরও নফস আছে, অথচ আমরা জানি আল্লাহর নফস নাই। আমরা ইহাও জানি যে আল্লাহ রুহকে আদমের মধ্যে ফুৎকার করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহর নফসকে ফুৎকার করেন নি। ‘আমার নিজের জন্য’ (লি নাক্‌সি) তথা ‘আল্লাহর জন্য’ কথাটি মোটেই বুঝতে পারলাম না। সুতরাং পাঠকদের কাছে ক্লম্বা চাইলাম এ জন্য যে এই আয়াতের মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়াটা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়। অবশ্য পরে অনেক লোগাত ঘাঁটাঘাঁটি করে জানতে পারলাম যে এই ‘নিজের জন্য’ (লি নাক্‌সি) বলতে প্রাণটিকে বোঝানো হয় নি, বরং আল্লাহর জন্য বোঝানো হয়েছে। যদিও নফস শব্দটি আছে বলেই এই গোলকধাঁধায় পড়েছিলাম। আসলে নফস বলতে যে প্রাণ বোঝায় এখানে সেই অর্থে বোঝানো হয় নি, বরং বোঝানো হয়েছে শুধুমাত্র নিজের জন্য। কারণ নফসের বাংলা শব্দটি যদি প্রাণ অথবা জীবাত্মা হয় তা হলে আল্লাহর সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত করা যায় না। কারণ নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে, কিন্তু আল্লাহর বেলায় মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। সুতরাং ‘লি নাক্‌সি’ বলতে এখানে

আম্মার জন্য তথা আল্লাহর জন্য বোঝানো হয়েছে, যদিও শব্দটি একই রকম। আরবি ভাষাটি অত্যন্ত গরিব ভাষা তাই একটি শব্দের দ্বারা অনেক রকম অর্থ বোঝায়। যেমন ‘দারবুন’ শব্দটি দিয়ে পেটানো বোঝায় আবার আরও নিরানব্বই রকম অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪২. আপনি ও আপনার ভাই যান আম্মার (আল্লাহর) আয়াতসহ (নিদর্শনসহ) এবং আপনারা দুইজনে অলসতা করিবেন না আম্মার জিকিরের (স্মরণ, মনে করা) মধ্যে। (ইজ্জাহ্ আন্তা ওয়া আখুকা বিআয়াতি ওয়ালা তানিয়া ফি জিকরি)।
৪৩. দুইজনে যান ফেরাউনের দিকে, সে (ফেরাউন) নিশ্চয়ই সব রকম সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে (তথা) বিদ্রোহী (তোয়াগা)। (ইজ্জাহা ইলা ফিরআউনান্নাহ তোয়ারা)।
৪৪. সুতরাং তাকে (ফেরাউনকে) দুইজনে বলিবেন নম্রতার সহিত কথা। সে হয়তো উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে। (ফাকুলা লাহ কাউলাল্ লাইয়িনাল্ লা আল্লাহ এতাজাক্কারু আউ ইয়াখশা)।
৪৫. তাহারা দুইজনে বলিলেন, হে আম্মাদের রব (প্রতিপালক), নিশ্চয়ই আমরা ভয় করি যে, সে (ফেরাউন) বাড়াবাড়ি (দুর্ব্যবহার) করিবে (ইয়াফরুতা) আম্মাদের উপর অথবা সব রকম সীমা লঙ্ঘন করিবে।

(কাল রাব্বানা ইন্নানা নাখাফু আইইয়াফরুতা আলাইনা আউ আই ইয়াত্গা)।

৪৬. (আল্লাহ) বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে (মাতাকুমা) (আছি)। শুনি (আসমাউ) (আল্লাহ) এবং দেখি (আরা)।

(কাল লা তাখাফা ইন্নানি মাতাকুমা আসমাউ ওয়া আরা)।

৪৭. সুতরাং তাহার (ফেরাউন) কাছে দুইজনে যান সুতরাং দুইজনে বলুন, নিশ্চয়ই (আমরা) তোমার রবের দুইজন রসূল। সুতরাং পাঠাও আমাদের সাথে সুতরাং আমাদের সাথে বনী ইসরাইল(-কে) যাইতে দাও (প্রেরণ করো)।

(ফাতিআহ ফাকুলা ইন্না রাসুলা রাব্বিকা ফাআরসিল মাতানা বানি ইসরাইল)।

এবং তাহাদেরকে উৎপীড়ন (নিপীড়ন) করিও না (ওয়া লা তোয়াজ্জিব্হম)।

নিশ্চয়ই (কাদ্) তোমার (ফেরাউন) কাছে আমরা আসিয়াছি (জিনাকা) নিদর্শনসহ (বিআয়াতিম্) তোমার রবের পক্ষ হইতে (মির রাব্বিকা)।

(কাদ্ জিনাকা বিআয়াতিম্ মির রাব্বিকা)।

এবং শাস্তি (ওয়া সালামু) (তাহার) উপর যে অনুসরণ করে সঠিক পথের (হাদা)।

(ওয়া সালামু আলা মানিত্ তাবাতাল হাদা)।

৪৮. নিশ্চয়ই নিশ্চয় (ইন্ননা কাদ্) ওহি করা হইয়াছে (উহিয়া) আমাদের দিকে (ইলাইনা) যে শাস্তি (এবং) যে মিথ্যা মনে করে (মান্ কাজ্জাবা) (তাহার) উপরে এবং মুখ ফিরাইয়া (লয়) (তাওয়াল্লা)। (ইন্ননা কাদ্ উহিয়া ইলাইনা আন্নাল্ আজ্জাবা আলা মান্ কাজ্জাবা ওয়া তাওয়াল্লা)।

৪৯. (ফেরাউন) বলিল, তাহা হইলে কে তোমাদের দুইজনের রব (রাব্বুকুমা), হে মুসা? (কাল ফাম্মার রাব্বুকুমা ইয়া মুসা)।

৫০. (মুসা) বলিলেন, আমাদের রব, যিনি দিয়াছেন (আতোয়া) প্রত্যেক জিনিসকে তাঁহার সৃষ্টি (খাল্কাহ) তারপর (সুম্মা) পথ দেখাইয়াছেন (হাদা)। (কাল রাব্বুনাল্লাজি আতোয়া কুল্লা শাইয়িন, খাল্কাহ সুম্মা হাদা)।

৫১. (ফেরাউন) বলিল তাহা হইলে (পূর্বের শত শত বছরের) কওমদের (কুরুনিল) অবস্থা (বালুল) কী? (কাল ফাম্মা বালুল্ কুরুনিল্ উলা)।

৫২. (মুসা) বলিলেন তাঁহার জ্ঞান (ইলমুহা) আমার রবের (রাব্বি) নিকট (এন্দা) কেতাবের মধ্যে (আছে) আমার রব ভুল করেন না (লা ইয়া দিল্লু) এবং ভুলিয়া যান না (ওয়া লা ইয়ান্সা)।
(কালো ইলমুহা এন্দা রাব্বি ফি কেতাবিন লা ইয়াদিল্লু রাব্বি ওয়া লা ইয়ান্সা)।
৫৩. যিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য জম্বিনকে (আরদা : জম্বিন, পৃথিবী, মাটি, দেহ) বিছানা (মাহদান : গালিচা, কার্পেট) করিয়াছেন। এবং তোমাদের জন্য চালাইয়া দিয়াছেন (সালাকা) ইহার মধ্যে (ফিহা) রাস্তাসমূহ (সুবুলান) এবং আকাশ (সাম্মাআ) হইতে পানি (মাতা) বর্ষণ করেন (আনজালা)।
(আল্লাজি জাআলা লাকুমুল আরদা মাহদাউ ওয়াসালাকা লাকুম্ ফিহা সুবুলাউ ওয়া আনজালা মিনাস্ সাম্মায়িমা)।
সুতরাং আমরা (আল্লাহ) বাহির করিয়াছি (ফাখরাজনা) তাহা দিয়া (বিহা) জোড়ায় জোড়ায় (আজ্ওয়াজান) বিভিন্ন (শাত্তা) উদ্ভিদ হইতে (মিন্নাবাতিন)।
৫৪. তোমরা খাণ্ড (কুলু) এবং তোমরা চড়াণ্ড (ওয়ারাণ্ড) তোমাদের গবাদিপশুগুলিকে (আনামাকুম্)। নিশ্চয়ই (ইন্না) ওইটার (জালিকা) মধ্যে (ফি) (রহিয়াছে) নিদর্শনগুলি (লেআয়াতিন) বিবেকের (নুহা) অধিকারীদের জন্য (লিউলিন)।

[এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার মতো আর সেই বিষয়টি হলো বিবেকবানদের কথাটি এই আয়াতে বলা হয়েছে। এখানে ইমানদার, মোমিন, মুসলমান, মানুষ কাহারও নামটি উল্লেখ না করে বরং সার্বজনীনভাবে বলা হয়েছে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যারা সত্যিই বিবেকবান তাদের কথাটি এখানে সার্বজনীনভাবে বলা হয়েছে।]

৫৫. তাহা হইতে (মিন্হা) আমরা সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদের (খালাক্‌নাকুম) এবং (ওয়া) ইহার মধ্যে (ফিহা) আমরা ফিরাইয়া দিব (নুইদু) তোমাদেরকে (কুম) এবং (ওয়া) ইহার মধ্য হইতে (মিন্হা) আমরা তোমাদেরকে বাহির করিব (নুখরিজুকুম) আরও (উখরা) একবার (তারাতান)।
৫৬. এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (লাকাদ্) আমরা তাহাকে (ফেরাউনকে) দেখাইয়াছি (আরাইনাহ্) তোমাদের আয়াতসমূহ (আয়াতিনা) সমস্ত (কুল্লানা)। সুতরাং সে মিথ্যারোপ করিয়াছে (ফাকাজ্‌জাবা) এবং (ওয়া) অমান্য করিয়াছে (আবা : আরও অর্থ- অস্বীকার করা)।
৫৭. (ফেরাউন) বলিল (কাল) তোমাদের কাছে আসিয়াছ কি (আজ্জিতানা) তোমাদের বাহির করার জন্যে (লেতুখরিজানা) তোমাদের দেশ হইতে (মিন্ আরদিনা) তোমার জাদু লইয়া (বেসিহরিকা) হে মুসা (ইয়া মুসা)।

[যদিও আরদ অর্থ জমিন, মাটি, পৃথিবী, মানবদেহ, কিন্তু এখানে আরদ বলতে দেশ শব্দটি ব্যবহার করলাম]।

৫৮. সুতরাং তোমার কাছে অবশ্যই আমরা আনিব (ফালানা তিয়ান্নাকা) জাদুকে (বিসিহিরিম্) তাহার অনুরূপ (মিস্লেহি) সুতরাং স্থির করো (ফাজ্জআল) আমাদের মাঝে (বাইন্নানা) এবং (ওয়া) তোমার মাঝে (বাইন্নাকা) নির্দিষ্ট সময় (মাওইদাল) তাহা আমরা খেলাপ করিব না (লা নুক্লিফুহ) আমরা (নাহ্নু) এবং (ওয়া) তুমিও না (লা আন্তা) সমতল প্রান্তরে (মাকানান সুয়ান)।
৫৯. (মুসা) বলিলেন (কাল), তোমাদের নির্দিষ্ট সময় (মাওইদুকুম) উৎসবের দিন (ইয়াওমুজ্ জিনাতি) এবং (ওয়া) যে মানুষদেরকে সমবেত করা হইবে (আই ইউহ্শারান্ নাসা) সূর্য ওঠার সাথে (দোহান)।
৬০. সুতরাং চলিয়া গেল (ফাতাওয়াল্লা) ফেরাউন (ফিরআউনু) সুতরাং জন্ম করিল (ফাজ্জাম্মা) কৌশলসমূহ (কাইদাহ) তারপর আসিল (সুম্মা আতা)।
৬১. মুসা তাহাদেরকে বলিলেন (কাল লাহম মুসা), তোমাদের জন্য (রহিয়াছে) দুর্ভোগ (ওয়াইলাকুম) তোমরা আরোপ করিও না (লা তাফতারু) আল্লাহর উপর মিথ্যা (আলা আল্লাহে কাজিবান্) সুতরাং তোমাদের ধ্বংস করিয়া দিবেন (ফাইউস্ফিতাকুম) আজাব দিয়া

(বিআজাবিন)। এবং নিশ্চয়ই (ওয়া কাদ্) ব্যর্থ হইয়াছে (খাবা) যে মিথ্যা রচনা করিয়াছে (মানিফতার)।

৬২. তারপর তাহারা মতবিরোধ করিল (ফাতানাঝাউ) তাহাদের কাজে (আম্রাহম) তাহাদের মধ্যে (বাইনাহম) এবং গোপনে পরামর্শ করিল (ওয়া আসাররুন নাজওয়া)।

৬৩. তাহারা বলিল (কালু) নিশ্চয়ই এই দুইজন (ইন্হাজানি) অবশ্যই দুই জাদুকর (লাসাহিরানে) দুইজনে এরাদা করে (চায়) (ইউরিদানি) যে (আন) দুইজন তোমাদেরকে বাহির করিয়া দিবে (ইউখরিজাকুম) তোমাদের ভূমি হইতে (মিন্ আরদিকুম) তাহাদের দুইজনের জাদুর সাহায্যে (বিসিহরি হিমা) এবং দুইজনে রহিত করিবে (ওয়া ইয়াজ্হাবা) তোমাদের জীবন-ব্যবস্থার (বিতারিকাঠিকুম) আদর্শ (মুসলা)।

৬৪. সুতরাং তোমরা একত্রিত করো (ফাজ্জমিউ) তোমাদের কলাকৌশল (কাইদাকুম) তারপর আসো (সুম্মাহতু) কাতারবন্দি হইয়া (সোয়াফফান) এবং নিশ্চয়ই আজ সফল হইবে (ওয়াকাদ্ আফ্লাহাল্ ইয়াওমা) যে প্রাধান্য বিস্তার করিবে (মানিস্তালা)।

৬৫. (জাদুকরেরা) বলিল, হে মুসা (কালু ইয়া মুসা), হয় নিষ্ক্রেপ করো তুমি (ইম্মা আন তুলকি) এবং (না) হয় (ওয়া ইম্মা) আমরা প্রথমে নিষ্ক্রেপ করিব (আন্বাকুনা আউয়ালা মান্ আল্কা)।

৬৬. (মুসা) বলিলেন, বরং তোমরা নিক্ষেপ করো (কালো বালু আলকু) সুতরাং তখন তাহাদের রশিগুলি (ফাইজা হিবালুহন্ন) এবং তাহাদের লাঠিগুলি (ওয়া ইউসিইউহন্ন) মনে হইল (ইউখাইইয়ালু) তাঁহার দিকে (দৌড়াইয়া আসিতেছে) (ইলাইহি) তাহাদের জাদু হইতে (মিন্ সিহিরি হিন্ন) তাহা যেন দৌড়াইতেছে (আন্নাহা তাস্আ)।
৬৭. সুতরাং অনুভব করিল (ফাত্মাওজাসা) তাঁহার নফসের মধ্যে (ফি নাফসিহি) ভীতি (খিফাতান্) মুসা (মুসা)।
৬৮. আমরা (আল্লাহ) বলিলাম (কুলনা), ভয় করিবেন না (লা তাকারু) নিশ্চয়ই আপনি (ইন্নাকা) আপনিই উপরে (আন্তান্ আলা)।
৬৯. এবং নিক্ষেপ করুন (ওয়া আলকি) আপনার ডান হাতের মধ্যে যাহা (আছে) (মা ফি ইয়ামিনিকা) গিলিয়া ফেলিবে (গ্রাস করিবে) (তাল্কারু) যাহা কিছু তাহারা বানাইয়াছে (মা সানাতু)। নিশ্চয়ই যাহা কিছু তাহারা বানাইয়াছে (ইন্নামা সানাতু) (উহা তো কেবলই) জাদুকরদের কলাকৌশল (কাইদুস্ সাহেরিন) এবং জাদুকর (কখনই) সফল হয় না (ওয়া লা ইফলিহুস্ সাহেরু) যেখান থেকেই আসুক (না কেন) (হাইসু আতা)।

৭০. সুতরাং জাদুকরেরা সেজদায় পড়িয়া গেল (ফাউল্কিয়াস সাহারাতে সুজ্জাদান)। তাহারা (জাদুকরেরা) বলিল (কালু) আমরা ইমান আনিলাম (আম্মান্না) রবের উপর (বেরাব্বি) হারুন এবং মুসার (হারুনা ওয়া মুসা)।
৭১. (ফেরাউন) বলিল (কালু), তোমরা ইমান আনিয়াছ (আম্মান্নুম) তাহার উপর (লাহ) পূর্বেই (কাব্লা) যে (আন) আমি অনুমতি দিবার (আজানা) তোমাদেরকে (লাকুম)। নিশ্চয়ই সে (মুসা) তোমাদের প্রধান অবশ্যই (লা কাবিরুকুম) যে (আল্লাজি) তোমাদেরকে শিখাইয়াছে (আল্লাম্মাকুমুস) জাদু (সেহরা)। সুতরাং অবশ্যই আমি (ফেরাউন) কাটিয়া দিব (ফালা উকাত্তিয়ান্ আননা) তোমাদের হস্তগুলি (আইদিআকুম) এবং (ওয়া) তোমাদের পদগুলি (আরজুলাকুম) বিপরীত দিক হইতে (মিন্ খিলাফিন্) এবং অবশ্যই তোমাদেরকে আমি শূলে চড়াইব (ওয়া লাউসাল্লিবান্নাকুম) খেজুর গাছের কাণ্ডের মধ্যে (ফি খুজুইন্ নাখলি)। এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানিবেই (ওয়ালাতালামুননা) আমাদের মধ্যে কে (দিতে পারে) (আইউনা) কঠিন (আশাদ্দু) আজাব (আজাবাউ) এবং দীর্ঘস্থায়ী (ওয়া আব্বকা)।
৭২. তাহারা বলিয়াছিল (কালু), তোমাকে কখনোই শ্রেষ্ঠতা (প্রাধান্য) দিব না (লান্ নুশিরাকা) যাহা আমাদের কাছে আসিয়াছে

(ম্মা জাআনা) (উহার) উপর (আলা) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ হইতে (মিনাল্ বাইয়িনাতি) এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন (ওয়াল্লাজি ফাতারানা) সুতরাং তুমি তাহাই করো (ফাক্দি) যাহা কিছু (ম্মা) তুমি (আন্তা) করিতে চাও (কাদিন্)। নিশ্চয়ই তুমি করিতে পারো (ইন্নাম্মা তাক্দি) এই দুনিয়ার (পার্খিব) জীবনে (হাজ্জিহিল্ হায়াতাদ্ দুনিয়া)।

৭৩. নিশ্চয়ই আমরা (ইন্না) ইমান আনিয়াছি (আম্মান্না) আমাদের রবের উপর (বিরাব্বিনা) তিনি যেন ম্মাফ (ক্লম্মা) করেন (লিইয়াগ্ফেরা) আমাদের (লানা) গুনাহগুলি (পাপ) (খাতাইয়ানা) এবং (ওয়া) যাহা (ম্মা) আমাদেরকে বাধ্য করিয়াছে (আক্হারতানা) জাদুর উপর হইতে (আলাইহি মিনাস্ সিহর)। এবং আল্লাহ্ উত্তম এবং স্থায়ী (ওয়াল্লাহু খাইরু ওয়া আব্কা)।

৭৪. তাই নিশ্চয়ই (ইন্নাহু) যে কেহ আসিবে (ম্মাই ইয়াতি) তাহার রবের কাছে (রাব্বাহু) মুজ্‌রিম (অপরাধী) হইয়া (মুজ্‌রিম্মান্) সুতরাং নিশ্চয়ই (ফাইন্না) তাহার জন্য (লাহু) জাহান্নাম (দোজখ, নরক) (জাহান্নাম্মা)। সে মরিতে না (লা ইয়া মুতু) তাহার মধ্যে (ফিহা) এবং বাঁচিবেও না (ওয়া লা ইয়াহুইয়া)।

[‘সে মরিতে না এবং বাঁচিবেও না’ এই রকম জাহান্নামটির পরিচয় জানার পর কিছুটা অবাক হতে হয় বৈকি! যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে

হয় ইহা একটি আত্মবিরোধী কথা, কিন্তু আল্লাহর জন্য মোটেও ইহা আত্মবিরোধী নয়। প্রশ্ন আসতে পারে যে ‘মরবেও না এবং বাঁচবেও না’ এই কথাটির দ্বারা কী রকম একটি আজব পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে? কারণ মানুষ জানে যে, হয় মারা যাবে, না হয় জীবিত থাকবে, কিন্তু ইহার মাঝামাঝি অবস্থানটি যে নিঃসন্দেহে একটি ভয়ংকর অবস্থান ইহা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ধারণ করতে পারে না। এই রকম অদ্ভুত অবস্থানটি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় পদার্থ বিজ্ঞানী শ্রয়েডিস্কারের ভৌতিক বিভালের কথাটি। সে জগতে গতিবেগ আছে তো অবস্থান নাই, আবার অবস্থান আছে তো গতিবেগ নাই]।

৭৫. এবং যে তাঁহার (আল্লাহর) কাছে আসিবে (ওয়া মাইইয়াতি) মোমিন হইয়া (মুমিনান্) নিশ্চয়ই সে আমলে সালেহা করিয়াছে (কাদ্ আম্মেলাস্ সোয়ালেহাতি) সুতরাং ওইসব লোক (ফাউলাইকা) তাহাদের জন্য রহিয়াছে (লাহমুদ) সর্বোচ্চ মর্যাদাসমূহ (দারাজাতুল উলা)।

[এখানে ‘আম্মানু’ তথা ইমানদার বলা হয় নি, বরং যারা ইমানদারের চেয়েও বহু উর্ধ্বে অবস্থান করেন সেই মোমিনের কথা বলা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, আম্মানু আর মোমিন কখনোই এক কথা নয়, কারণ আম্মানুর সঙ্গে আল্লাহ থাকেন না, কিন্তু মোমিনের সঙ্গে আল্লাহ থাকেন বা আছেন এই কথাটি কোরান-এর ৮ নম্বর সূরা আনফাল-

এর ১৯ নম্বর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, ‘ওয়া আন্বাল্লাহা মাআল্ মোমেনিনা’ অধিকাংশ কোরান-এর অনুবাদক এবং তফসিরকারকেরা ‘আম্মানু’ এবং ‘মোমিন’-কে মনের অজান্তে এক করে ডাইলে-চাউলে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেন। অবশ্য এই সুক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিও আল্লাহরই দান। সুতরাং বলার কিছুই থাকে না।

৭৬. বসবাস (করবে) জান্নাতে (জান্নাতু আদ্বিন) প্রবাহিত হয় (তাজ্রি) তাহার নিচ হইতে (মিন তাহতিহাল) নহরসমূহ (নদী, জলধারা, খাল, নালা, স্রোতস্থিনী) (আনহারু) ইহার মধ্যে (তাহারা) চিরকাল থাকিবে (খালেদিনা ফিহা) এবং ওইটাই পুরস্কার (ওয়া জালিকা জাজাউ) যে পবিত্র হইবে (মান্ তাজাক্কা)।
৭৭. এবং নিশ্চয়ই আমরা ওহি করিয়াছিলাম মুসার দিকে (ওয়া লাকাদ্ আওহাইনা ইলা মুসা) যে, আমার বান্দাদেরসহ রাতে যাত্রা করুন (আন্ আস্রি ইবাদি) সুতরাং বানান (ফাদরি) তাহাদের জন্য (লাহম) পথ (তারিকান) সাগরের মধ্যে (ফিল বাহরে) গুঙ্গ (ইয়াবাসান) ভয় করিবেন না (লা তাখাফু) ধরা পড়িবার (দারাকাঠ) এবং ভয় করিবেন না (ওয়া লা তাখশা)।
৭৮. সুতরাং ফেরাউন তাহার সৈন্যবাহিনীসহ তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিল (ফাআত্বাআহম্ ফিরআউনু বিজুুদিহি) সুতরাং তাহাদেরকে

ঢাকিয়া দিল (ফাগাশিইয়াহম) সাগর হইতে (মিনাল ইয়াম্মিন) যাহা তাহাদেরকে নিমজ্জিত করিয়াছিল (মাগাশিয়াহম)।

৭৯. এবং ফেরাউন পথদ্রষ্ট করিয়াছিল তাহার কণ্ঠকে (জাতি) (ওয়া আদাল্লা ফেরাউনু কাউমাহ) এবং হেদায়েত করে নাই (ওয়া মা হাদা)।

৮০. হে ইসরাইলের সন্তানগণ (ইয়া বানি ইসরাইল), নিশ্চয়ই আমরা (আল্লাহ) তোমাদেরকে উদ্ধার করিয়াছিলাম (কাদ্ আনজাইনাকুম) তোমাদের শত্রু হইতে (মিন্ আদুউইকুম) এবং তোমাদেরকে আমরা সময় দিয়াছি (ওয়া ওয়াআদনাকুম) তুর পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে (জানিবাত্ তুরিল আইমানা) এবং আমরা নাজেল করিয়াছি (ওয়া নাজ্জালনা) তোমাদের উপর (আলাইকুমুল) মান্না এবং সালোয়া (মান্না ওয়াস্‌সাল্‌ওয়া)।

৮১. তোমরা খাও (কুলু) পবিত্র জিনিসসমূহ (তাইয়েবাত) হইতে (মিন) যাহা (মা) তোমাদেরকে আমরা (আল্লাহ) রেজেক দিয়াছি (রাজাক্‌নাকুম) এবং (ওয়া) বাড়াবাড়ি করিও না (লা তাদ্‌গাও) তাহার মধ্যে (ফিহি) সুতরাং পড়িবে (ফাইয়াহিল্লা) তোমাদের উপর (আলাইকুম) আমার গজব (খাৎস)(গাদাবি) এবং যাহার (উপরে) পড়িবে (ওয়া মাই ইয়াহিল) আমার গজব (গাদাবি) তাহার উপরে

(আলাইহি) সুতরাং নিশ্চয়ই (ফাকাদ্) (সে) ধ্বংস হইয়া যাইবে (হাওয়া)।

৮২. এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই আমি (ইন্নি) অবশ্যই ক্রমাকারী (লা গাফ্ফারুল) (তাহার) জন্য যে (লিমান) তওবা করিল (তাবা)। এবং ইমান আনিল (ওয়া আম্মানা) এবং আম্মলে সালেহা (নেকির কাজ) করিল (ওয়া আম্মেলাস্ সোয়ালেহান্) তারপর সং পথে থাকে (সুম্মাহ্ তাদা)।

৮৩. এবং কীসে আপনাকে তাড়াহুড়া করাইল (ওয়া মা আহ্জালাকা) আপনার কওম (জাতি) হইতে (আন্ কওমিকা), হে মুসা (ইয়া মুসা)।

৮৪. (মুসা) বলিলেন (কাল), ওই তো তাহারা (হম্ উলায়ি) উপরে (আলা॥ [বাক্যের সঙ্গে এই শব্দটির মিল পেলাম না অথবা ইহার অর্থ বুঝতে পারলাম না] আমার পিছনে (আসারি)। এবং আমি তাড়াতাড়ি করিয়াছি (ওয়া আজিলুতু) আপনার দিকে (ইলাইকা) হে আমার রব (রাব্বি), আপনি যেন খুশি হন (লিতারদোয়া)।

৮৫. (আল্লাহ্) বলিলেন (কাল), সুতরাং নিশ্চয়ই আমরা (আল্লাহ্) (ফাইন্না), পরীক্ষায় ফেলিয়াছি (ফাতান্না) নিশ্চয়ই (কাদ্), আপনার কওমকে (কাওমাকা) আপনার পরে (মিম্ বাদিকা) এবং

তাহাদেরকে পথদ্রষ্ট করিয়াছে (ওয়া আদাল্লাহমুস) সামেরি (সামিরি)।

৮৬. সুতরাং ফিরিয়া আসিলেন মুসা (ফারাজা মুসা) তাহার কওমের দিকে (ইলা কওমিহি) গোস্বা হইয়া (রাগাবিত হইয়া) (গাদবানা) (এবং) আফসোসকারী (আসিফান)। (মুসা) বলিলেন (কাল), হে আমার কওম, (ইয়া কাওমি) তোমাদের কি ওয়াদা দেন নাই (আলাম ইয়াইদুকুম) তোমাদের রব (রাব্বুকুম) সুন্দর ওয়াদা (ওয়াদান হাসানা)? তবে কি লগ্না হইয়াছে (আফা তোয়াল) তোমাদের উপর (আলাই-কুমুল) নির্ধারিত সময় (আহদু) অথবা (আম) তোমরা চাহিয়াছ (আরাততুম) যে তোমাদের উপর গজব পড়িবে (আই ইয়াহিল্লা আলাইকুম গাদাবুন) তোমাদের রবের পক্ষ হইতে (মির রাব্বিকুম) সুতরাং তোমরা ভঙ্গ করিয়াছ (ফাআখলাফতুম) আমার সাথে ওয়াদা (মাও ইদি)।’

৮৭. তাহারা বলিল (কালু), ‘আমরা ভঙ্গ করি নাই (মা আখলাফনা) আমাদের ইচ্ছায় আপনার সাথে ওয়াদা (মাওইদাকা বেমাল্কিনা) কিন্তু (ওয়ালাকিন্না) আমাদের উপর বোঝাপত্তি চাপানো হইয়াছিল (হম্মিল্না আওজারাম) কওমের অলঙ্কার হইতে (মিন জিনাতিল কাওমি) সুতরাং আমরা নিক্লেপ করি’ (ফাকাজাফনাহা), সুতরাং

ওইরূপে (ফাকাজালিকা) নিক্ষেপ করিল (আল্‌কাস) সামেরিও (সামেরি)।

৮৮. সুতরাং বাহির করিল (ফাআখরাজা) তাহাদের জন্য (লাহম) একটি বাছুরের (ইজলান) আকৃতি (জাসাদাল) তাহার মধ্যে (লাহ) হাশ্বা ডাক (খুআরুন) (ছিল) সুতরাং তাহারা বলিল (ফাকালু) এইটা (হাজা) তোমাদের ইলাহ (খোদা) (ইলাহকুম) এবং মুসারও ইলাহ (ইলাহ মুসা), সুতরাং (মুসা) ভুলিয়া গিয়াছিল (ফানাসিয়া)।
৮৯. সুতরাং তাহারা দেখে নাই কি (আফালা ইয়ারাওনা) তাহাদের দিকে (ইলাইহিম) কথার (কাওলান) (উত্তর দেয় না) ফিরিয়াও আসে না যে (আল্লা ইয়ারজিউ) এবং ক্ষমতা রাখে না (ওয়া লা ইয়ামলিকু) তাহাদের (লাহম) ক্ষতি (দরবাউ) এবং না উপকার (ওয়া লা নাফান)।
৯০. এবং নিশ্চয়ই (ওয়া লাকাদ্) হারুন তাহাদেরকে বলিয়াছিলেন (কাল লাহম হারুনু) পূর্বেই (মিন্ কাবলু), নিশ্চয়ই তাহার দ্বারা তোমাদের ফেত্নায় ফেলা হইয়াছে (পুতিন্তুম্বিহি) এবং তোমাদের রব নিশ্চয়ই রহমান (দয়ালু) (ওয়া ইন্না রাব্বাকুমুর রাহমান) আমার আদেশের তোমরা আনুগত্য করো এবং সুতরাং তোমরা আমাকে অনুসরণ করো (ফাত্তাবিউনি ওয়া আতিউ আমরি)।

৯১. তাহারা বলিয়াছিল (কালু), ‘কখনোই না (লান) আমরা বিরত হইব (নাবরাহা) কাহার কাছে (আলাইহি) লাগিয়া থাকিব (বাধুর পূজা করা হইতে) (আখিফিনা) যতক্ষণ না (হাত্তা) ফিরিয়া আসিবে (ইয়ারজিয়া) আমাদের নিকটে (ইলাইনা) মুসা (মুসা)।’
৯২. (মুসা) বলিলেন (কালু), ‘হে হারুন (ইয়া হারুন), কিসে (মা) তোমাকে বারণ করিল (মানাকা) যখন (ইজ) তাহাদেরকে তুমি দেখিলে (রাআইতাহম) পথদ্রষ্ট হইয়াছে (গোমরা হইয়াছে) (দোয়াল্লু)।
৯৩. ‘আম্মার (আদেশের) অনুসরণ করিলে না যে (আল্লা তাত্তাবিয়ানি) তুমি কি তবে অমান্য করিয়াছ (আফাআসাইতা) আম্মার হকুম (আম্মরি)?’
৯৪. তিনি (হারুন) বলিলেন (কালু), ‘হে আম্মার মায়ের ছেলে (ভাই) (ইয়াবনা উম্মা) আম্মার দাড়ি ধরিবেন না (লা তাখুজ্ বিলিহইয়াতি) এবং না আম্মার মাথার (চুল) (ওয়া লা বিরাসি) নিশ্চয়ই আমি (ইন্নি) আশংকা করিয়াছি (খাশিতু) যে আপনি বলিবেন (আন্তাকুলা) তুমি ফারাক করিয়াছ (বিডেদ স্ফিট করিয়াছ) (ফাররাক্তা) মধ্যে (বাইনা) ইসরাইলের সন্তানদের (বনি ইসরাইলা) এবং তুমি দাম দেও নাই আম্মার কথায় (ওয়া লাম্ তারকুব্ কাউলি)।’

৯৫. (মুসা) বলিলেন (কাল), ‘তাহা হইলে তোমার ব্যাপার কী, হে সাম্মেরি (হাম্মা খাদবুকা ইয়া সাম্মেরিউ) ?’
৯৬. (সাম্মেরি) বলিল (কাল), ‘আমি দেখিয়াছি (বাসুতু) ওই বিষয়ে যাহা (বিদ্দা) তাহারা দেখে নাই (লাম্ ইয়াফসুরু) সেই সম্পর্কে (বিহি) সুতরাং আমি মুষ্টিতে লইয়াছি (ফাকাবাত্তু) এক মুষ্টি (কাব্দোয়াতান) রসুলের পদচিহ্ন হইতে (মিন্ আসারিল রাসুলি)। সুতরাং তাহা আমি নিষ্কেপ করিয়াছি (ফানাবাস্তুহা) এবং (ওয়া) ওই রূপেই (কাজালিকা) জাগরিত করিয়াছিল (সাউয়ারাত্) আমার নফসের জন্য (লি নাফসি)।’
৯৭. (মুসা) বলিলেন (কাল), ‘সুতরাং তুমি যাও (ফাজ্জাহাব) নিশ্চয়ই এখন (ফাইন্না) তোমার জন্য (লাকা) জীবনের মধ্যে আছে (ফিল্ হায়াতি) যে তুমি বলিবে (আন্তাকুলা) (আম্মাকে) স্পর্শ করিবে না (লা ম্মেসাসা)। এবং নিশ্চয়ই (আছে) তোমার জন্য (ওয়া ইন্না লাকা) নির্দিষ্ট সময় (মাওইদাল্) কখনোই ইহার ব্যতিক্রম করা হইবে না (লান্ তোখলাফাহ)। এবং দেখো তোমার ইলার দিকে (ওয়া উন্জুর ইলাহিকাল্) যাহা তাহার কাছে তুমি হইয়াছিলে পূজারি (আল্লাজি জাল্তা আলাইহি আকিফান)। নিশ্চয়ই আমরাই জ্বালাইব উহাকে (লানুহাররিকান্নাহ) ইহার পর তাহাকে আমরা নিশ্চয়ই

এলোমেলোভাবে ছড়াইব (সুম্মা লানান্‌সিফান্নাহ) নদীর মধ্যে (ফিল্‌ ইয়াম্মে) এলোমেলো করিয়া (নাস্‌ফান)।

৯৮. তোমাদের ইলাহ কেবলই আল্লাহ (ইন্‌নাম্মা ইলাহ্‌ হকুমউল্লাহ), যিনি (আল্লাজ্জি) নাই (লা) কোনো ইলাহ (ইলাহা) তিনি ছাড়া (ইল্লাহ)। সব কিছু পরিবেষ্টিত (আল্লাহর) জ্ঞানে (ওয়াসিয়া কুল্লু শাইয়িন ইল্মান)।
৯৯. ওই রূপে (কাজালিকা) বর্ণনা করিয়াছি আমরা (নাকুস্‌সু) তোমাদের কাছে (আলাইকা) খবরসমূহ (খবরাদি) হইতে (মিন্‌ আম্বায়ি) যাহা নিশ্চয়ই অতীত হইয়াছে (ম্মা কাদ্‌ সাবাকা)। এবং নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে দিয়াছি (ওয়া কাদ্‌ আতাইনাকা) আমাদের নিকট হইতে (মিল্লাদুন্না) জিকির (উপদেশ) (জিক্রান)।
১০০. যে কেহ মুখ ফিরাইবে (মান্‌ আরাদা) তাহা হইতে (আনহ) সুতরাং নিশ্চয়ই সে (ফাইন্‌নাহ) সুতরাং নিশ্চয়ই সে (ফাইন্‌নাহ) বহন করিবে (ইয়াহ্মেলু) কেয়ামতের দিনে (ইয়াওমাল কেয়ামাতি) বোঝা (উইজরান)।
১০১. বাস করিবে (খালিদিনা) ইহার মধ্যে (ফিহি) এবং তাহাদের জন্য কত মন্দ (ওয়া সায়ালাহ্ম) কেয়ামতের দিনে (ইয়াওমাল কেয়ামাতি) বোঝা (হিমলান)।

১০২. যেই দিন (ইয়াওম্মা) ফুঁ দেওয়া হইবে (ইউন্ফাকু) সিঙ্গার মধ্যে (ফিস্‌সুরি) এবং আমরা (আল্লাহ) সমবেত করিব মুজরিম (অপরাধী)-দেরকে (ওয়া নাহ্‌গুরুল মুজরিমিনা) আপসা দৃষ্টিওয়ালা অবস্থায় সেই দিন (ইয়াওম্মাইদিন জুরকান)।
১০৩. তাহারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলিবে (ইয়াতাখাফাতুনা বাইনাহম), না তোমরা অবস্থান করিয়াছিলে (ইল্লা বিস্তুম) কেবলমাত্র (ইল্লা) দশ (দিন) (আশরান)।
১০৪. আমরা ভালো জ্ঞানি (নাহ্নু আলামু) ওই বিষয়ে যাহা তাহারা বলিবে (বিম্মা ইয়াকুলুনা), যখন বলিবে (ইজ্জ ইয়াকুলু) তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উত্তম ব্যক্তিই (আম্‌শালুহম), বুদ্ধিমত্তায় (তারিকাতান) না তোমরা অবস্থান করিয়াছিলে (ইল্লা বিস্তুম) একমাত্র একদিন (ইল্লা ইয়াওম্মান)।
১০৫. এবং আপনাকে তাহারা প্রশ্ন করে (ওয়া ইয়াস্‌আলুনাকা) পর্বতসমূহ সম্পর্কে (আনিল্‌ জিবালি) সুতরাং বলুন তাহা উড়াইয়া দিবেন ধুলা করিয়া (ফাকুল্‌ ইয়ান্‌সিফুহা) আমার রব উড়াইয়া দিতে পারেন (রাব্বি নাস্‌ফান)।
১০৬. সুতরাং তাহা পরিণত করিবেন (ফাইয়া জারুহা) সম্মতল (কাআন) রুক্ক-ধূসর মাঠে (সফ্‌সফান)।

১০৭. তুমি দেখিবে না (লা তারা) ইহার মধ্যে (ফি হা) বক্রতা (ইউয়াজাউ) এবং না অসম্মান (ওয়া লা আম্তান)।
১০৮. সেই দিন তাহারা অনুসরণ করিবে (ইয়াওমাইদি ইয়াত্তাবিউনাদ্) এক আশ্রয়কারীকে (দাইয়াহ্) না (থাকিবে) তাহার বক্রতা (লা ইউয়াজা লাহ্) এবং আওয়াজসমূহ ক্রীণ হইবে (ওয়া খাশাআতিল্ আসওয়াতু) রহমানের জন্য (লির্ রাহ্মানি), সুতরাং তুমি শুনিবে না (ফালাতাস্মাউ) একমাত্র মৃদু শব্দ (ছাড়া) (ইল্লা হাম্‌সান)।
১০৯. সেই দিন (ইয়াওমাইজিল্) উপকার দিবে না (লা তান্‌ফাউশ্) সুপারিশ (শাফায়াতু), একমাত্র যাহাকে (ইল্লা মান্) অনুমতি দিবেন (আজিনা) তাহার জন্য (লাহর) রহমান (রাহ্মান)। এবং রাজি হইবেন তাহার কথায় (ওয়া রাদিয়া লাহ্ কাওলান্)।
১১০. তিনি জানেন (ইয়ালামু) যাহা কিছু তাহাদের সামনে (আছে) (মা বাইনা আইদিহিম্), এবং যাহা কিছু তাহাদের পিছনে (আছে) (ওয়া মা খাল্‌ফাহ্) এবং ইহাকে তাহারা জ্ঞান (দিয়া) আয়ত্ত করিতে পারে না (ওয়া লা ইউহিতুনা বিহি ইল্মান্)।
১১১. এবং অবনত করা হইবে (ওয়া আনাতিল্) চেহারাগুলি (মুখমণ্ডল) (উজুহ্) অক্ষয় (চিরস্থায়ী) (এবং) অমরের (চিরজীব)

কাছে (লিল্ হাইয়িল কাইউম)। এবং নিশ্চয়ই বিফল (ব্যর্থ) হইবে (ওয়া কাদ্ খাবা) যে বহন করিবে জুলুম (মান্ হাম্মালা জুলুম্মান)।

১১২. এবং যে আমল করিবে সালেহা (নেকি) হইতে (ওয়াম্মাই ইয়াম্মাল্ মিনাস্ সোয়ালিহাতি) এবং সে মোমিন (ওয়া হুয়া মুমিনুন) সুতরাং ভয় নাই (ফালা ইয়াখাফু) জুলুমের (জুলুম্মান) এবং না ক্লতি (ওয়া লা হাদম্মান)।

[বিশেষ করে মানুষের হক নষ্ট করার বেলায় এই ‘হাদম্মান’ শব্দটি তথা ক্লতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কারণ মানুষের হক নষ্ট করলে আল্লাহ্ ক্বমা করার কোনো আইন রাখেন নি এবং বান্ধার এই হক নষ্ট করার দরুনই অধিকাংশ মানুষ নিরাশ হবে তথা জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাবে। অথচ অধিকাংশ মানুষ ইহা বুঝেও বুঝতে চায় না]।

১১৩. এবং ওইরূপে আমরা অবতীর্ণ করিয়াছি (ওয়া কাজালিকা আনজাল্ নাহ) কোরান-কে আরবিতে (কোরানান আরাবিয়ান)। এবং আমরা বিস্তারিত (বিশদভাবে) বর্ণনা করিয়াছি ইহার মধ্যে (ওয়া সাররাফ্ না ফিহি) সতর্কবাণী হইতে (মিনাল্ ওয়াইদি) যাহাতে তাহারা (লাআল্লাহম্ম) তাক্ওয়া গ্রহণ (অবলম্বন) করে (ইয়াত্ তাকুনা) অথবা সৃষ্টি করিবে (আও ইউহ্ দিসু) তাহাদের জন্য জিকির (লাহম্ম জিকরান)।

[এখানে ভালো করে লক্ষ করে দেখুন যে কোরান-কে আরবি ভাষায় নাজেল করার কথাটি বলা হয়েছে। যেহেতু হাকিকি কোরান কালি-কলম-কাগজ আর ছাপার অন্ধরে অবস্থান করে না, বরং হাকিকি কোরান হলো আল্লাহর জ্ঞাতনূর। কাগজ-কালিতে যে নূরি কোরান-টি ছাপার অন্ধরে দেখতে পাইঁ ইঁহা হলো ম্লেজাজি কোরান। এই ম্লেজাজি কোরান-কে সবাই স্পর্শ করতে পারে, কিন্তু হাকিকি কোরান-কে পবিত্র না হয়ে স্পর্শ করার কোনো ক্ষমতাই নাই। (লা ইয়া মাস্‌সাহ ইল্লাল মুত্তাহারুন)। ক্যামেরায় বাঘ-সিংহের ছবি তোলাটি দেখলে যেমন সবাই বাঘ আর সিংহই বলবে, কিন্তু ইঁহা হলো ম্লেজাজি বাঘ-সিংহ। হাকিকি বাঘ-সিংহ দেখতে চাইলে চিড়িয়াখানায় যাওয়া ছাড়া অসম্ভব। সেই রকম হাকিকি কোরান-এর সন্ধান যদি কেউ করার ইচ্ছা পোষণ করে তা হলে তাকে জাবালুন নূর পর্বতের হেরাণ্ডহার মতো নির্জন স্থানে কমপক্ষে দশ-পনেরটি বছর ধ্যানসাধনা করতে হবে। অন্যথায় কতগুলো সুন্দর সুন্দর কথা জানতে পারা যায় এবং সেই কথা দিয়ে চমকিয়ে দেওয়া যায়, সেই কথা দিয়ে জুড় করা যায়, কিন্তু নূরি কোরান-এর প্রশ্নে একদম অজ্ঞান। ইমাম গাজ্জালির পীর আবু আলি ফারমাদি ইমাম গাজ্জালিকে বলেছিলেন এই বলে যে, তুমি কালি-কলম দিয়ে ঘষে ঘষে অনেক কাগজ নষ্ট করেছ আর আমি আমার কলবের উপর

আল্লাহর জিকির দিয়ে একটানা বছরের পর বছর ঘষেছি। তবে ইহা অপ্রিয় হলেও একদম সত্য কথা যে কালি-কলম কাগজের উপর ছাপানো কোরান, যাকে আমরা মেরাজি কোরান বলি, ইহার গুরুত্ব হাকিকি কোরান হতে অনেক অনেক বেশি। চিড়িয়াখানায় গিয়ে হাকিকি বাঘ আর সিংহ দেখার সৌভাগ্যটি সবার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, কিন্তু ছবির বাঘ আর সিংহটি সবাই দেখতে পারে এবং বাঘ-সিংহের ওপর একটি মোটামুটি ধারণা জন্মে। কোরান-কে আরবি কোরান বলা হয়েছে। তা হলে কি ইঞ্জিল, জাবুর ও তাওরাত-কেও নুরি কোরান বলা যায় না? বলা যায় না কি আরও নাম-না-জানা ১০৪টি নামে লেখা কেতাবগুলোকে?]

১১৪. সুতরাং আল্লাহ মহান (ফাতাআলাল্লাহ) সত্যিকার মালিক (মালিকুল হাক্ক) এবং তাড়াহুড়া করিবেন না (ওয়া লা তাজ্জাল) কোরান-এর জন্য (বিল্ কোরআনি) পূর্ব হইতে (মিন কাবলি) যাহা সম্পূর্ণ করা হয় (আই ইউক্দা) আপনার দিকে (ইলাইকা) তাহার ওহি (ওয়াহইউহ) এবং বলুন (ওয়া কুর) হে আমার রব (রাব্বি) আমাকে অধিক দাও (জিদ্দি) জ্ঞান (ইল্মান)।

১১৫. এবং নিশ্চয়ই আমরা (আল্লাহ) নির্দেশ দিয়াছিলাম (ওয়া লাকাদ আহিদ্না) আদমের দিকে (ইলা আদামা) পূর্ব হইতে (মিন কাবলু) সুতরাং তিনি কিছু ভুলিয়া যান (ফানাসিয়া) এবং আমরা পাই নাই

(ওয়া লাম্ নাজিদ্) তাহার মধ্যে (লাহ) দৃঢ়তা (শক্ত, অটল, মজবুত)
(আজ্জমান)।

১১৬. এবং যখন আমরা (আল্লাহ) বলিয়াছিলাম (ওয়া ইজ্ কুলনা)
ফেরেশতাদেরকে (লিল্ মালাইকাতিস্) তোমরা সেজদা করো (যদু)
আদমের জন্য (লি আদাম্মা) সুতরাং তাহারা সেজদা করিল
(ফাসাজাদু) একমাত্র ইবলিস (করিল না) (ইল্লা ইবলিস)। সে
অমান্য করিল (আবা)।

[ইবলিস জিনজাতিরই একজন। মনে রাখতে হবে যে মানবজাতি এবং
জিনজাতিতেই সামান্য স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দান করা হয়েছে। আর
কোনো সৃষ্টিজীবকেই আল্লাহপাক এই নির্দিষ্ট স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি
দান করেন নি। যেহেতু ইবলিসের সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দেওয়া
হয়েছে সেই হেতু ইবলিস তার ভালো-মন্দ বিচার করার অধিকারটি
পেয়েছিল। আর তাই ইবলিস আদমকে সেজদা দিতে অস্বীকার
করল। কিন্তু ফেরেশতাদেরকে কোনো প্রকার স্বাধীনতা দেওয়াই হয়
নি। তাই ফেরেশতারা আদমকে সেজদা করবেই, কারণ আল্লাহর
হুকুম অমান্য করার অধিকারটি ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয় নি,
এখানে অবাক হবার কিছুই নাই। কারণ ফেরেশতাদের আল্লাহর
কোনো হুকুম অমান্য করার প্রশ্নই ওঠে না। আরও মনে রাখতে হবে
যে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহপাক কোনো নফস এবং কোনো রুহ দান

করেন নি। সুতরাং এককথায় বলতে গেলে ফেরেশতারা হলো আল্লাহর আজ্ঞাবহ।

১১৭. সুতরাং আমরা (আল্লাহ) বলিলাম (ফাকুলনা,) হে আদম (ইয়া আদামু), নিশ্চয়ই এইটা আপনার জন্য শত্রু (ইন্না হাজা আদুউল্ লাকা) এবং আপনার স্বীর জন্য (ওয়া লিজাউজিকা) সুতরাং আপনাদের দুইজনকে যেন বাহির করিয়া না দেয় (ফালা ইউখরিজান্নাকুমা) জ্ঞানাত হইতে (মিনাল্ জান্নাতি) সুতরাং আপনি কষ্টে পড়িবেন (ফাতাশ্কা)।

১১৮. নিশ্চয়ই আপনার জন্যে (ইন্না লাকা) তাহার মধ্যে (জ্ঞানাত) আপনি ক্লুধার্ত হইবেন না (আল্লা তাজুয়া ফিহা) এবং আপনি উলঙ্গ হইবেন না (ওয়া লা তায়ারা)।

১১৯. এবং আপনি ইহার মধ্যে পিপাসার্ত হইবেন না (ওয়া আন্নাকা লা তাজ্মাউ ফিহা) এবং বোদ্ধতপ্ত হইবেন না (ওয়ালা তাদ্হা)।

১২০. সুতরাং ওয়াস্ওয়াসা (কুম্ব্বনা) দিল শয়তান তাহাকে (ফাওয়াস্ওয়াসা ইলাইহিস্ শায়তোয়ানু) সে (শয়তান) বলিল, 'হে আদম, (কাল ইয়া আদামু), আমি (শয়তান) কি তোমাকে বলিয়া দিব (হাল্ আদুল্লুকা) চিরন্তন জীবনের এই গাছের (বৃক্ক) উপরে (আলা শাহ্জারাতিল্ খুল্তি) এবং অবিনশ্বর রাজত্বের ক্লয় হয় না (যাহা) (ওয়া মুল্কিল্ লা ইয়াব্লা)।'

১২১. সুতরাং দুইজনে খাইলেন (ফাআকাল) উহা হইতে (মিনহা) সুতরাং প্রকাশ হইল (আবাদাত) দুইজনের কাছে (লাহমা) দুইজনের লজ্জাস্থান (সাওয়াতুহমা) এবং দুইজনে শুরু করিলেন (ওয়া তোয়াফিকা) দুইজনে ঢাকিতে (ইয়াখসিফানি) দুইজনের উপর (আলাইহিমা) পাতা হইতে (মিউ ওয়ারাকিল) জাল্লাতে (জান্নাতি) এবং অমান্য করিলেন আদম (ওয়া আসা আদামু) তাঁহার রবকে (রাব্বাহ) সুতরাং তিনি দ্রমে (পতিত) হইলেন (ফাগাওয়া)।

[বিশ্ববিখ্যাত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির পীর হজরত বাবা শামসে তারিফ অবশ্য এই বিষয়টিতে অন্যরকম কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, সত্যদ্রষ্টা আদমের ভেতর নূরে মোহাম্মদি রূপে স্বয়ং আল্লাহ, যেখানে মণ্ডজুদ আছেন সেখানে বিদ্রান্ত হবার প্রশ্নই আসে না, বরং হজরত আদম (আঃ) জেনেগুনে ইচ্ছা করে খাইলেন। তিনি জানতেন যে যদি উহা ভক্ষণ না করি তাহা হইলে আল্লাহর সৌন্দর্য একটি স্থানে এসে স্থবির হয়ে দণ্ডায়মান হয়। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে হজরত আদম (আঃ)-কে যদিও দোষী সাব্যস্ত করতে হয়, কিন্তু তিনি মোটেই কোনো দোষের কাজ করেন নি। যাহা কিছু করেছেন উহা জেনেগুনেই করেছেন এবং জেনেগুনে করাটিকে অন্যায় না বলে আদা বলাই ভালো। কারণ প্রত্যেক নবি মাসুম। গুনাহ করাটা অসম্ভব। কোনো নবিই গুনাহ করতে আসেন নি, বরং তাদের উম্মতদেরকে

শিক্ষা দেবার জন্য ইচ্ছাকৃত ভুল (?) করেছেন। ইহাই আহলে
সুন্নাতুল জাম্মাতের আকিদা।

১২২. ইহার পরে (সুন্মাজ) তাঁহাকে (আদমকে) বাছাই করিলেন
তাঁহার রব (ইস্‌তাবাহ রাব্বাহ) সুতরাং মারফ (ক্লামা) করিলেন
(ফাতাবা) তাহাকে (আলাইহি) এবং রাস্তা দেখাইলেন (ওয়া হাদা)।
১২৩. (আল্লাহ) বলিলেন (কালাহ), দুইজনে নামিয়া যাও (বিতা) ইহা
হইতে (মিন্‌হা) একসাথে (জামিয়াম) তোমরা একে-অপরের জন্য
শত্রু (বাদুকুম্ লিবাদিল আদুবুন)। সুতরাং যখন (ফাইম্মা)
তোমাদের কাছে আসিবে (ইয়াতিয়ান্নাকুম্) আমার হইতে (মিন্‌নি)
হেদায়েত (হদান)। সুতরাং যে অনুসরণ করিবে (ফাম্মানিত্তাবা)
আমার হেদায়েত (হদাইয়া) সুতরাং বিভ্রান্ত হইবে না (ফালা
ইয়াদিল্লু) এবং কষ্ট পাইবে না (ওয়া লা ইয়াশ্কা)।
১২৪. এবং যে (ওয়া মান্) বিমুখ হইবে (আহ্লাদা) আমার জিকির
হইতে (আন্ জিক্‌রি) সুতরাং নিশ্চয় (ফাইন্না) তাহার জন্য (লাহ)
জীবনযাপন (মাইশাতান্) সংকুচিত (দান্কাউ) এবং আমরা তাহাকে
উঠাইব (ওয়া নাহ্‌গুরুহ) কেয়ামতের দিনে (ইয়াওমাল্ কেয়ামাতি)
অন্ধ অবস্থায় (আম্মা)।

১২৫. সে বলিবে (কাল), হে আমার রব (রাব্বি), কেন (লিমা) আমাকে উঠাইলেন (হাশারতানি) অন্ধ অবস্থায় (আমা) এবং নিশ্চয়ই (ওয়া কাদ্) আমি ছিলাম (কুনতু) চক্ষুস্বান (বাসিরান)।
১২৬. তিনি বলিবেন (কাল), ওইভাবেই (কাজালিকা) তোমার কাছে আসিয়াছিল (আতাক্কা) আমাদের আয়াতসমূহ (আয়াতুনা) সুতরাং তুমি তখন ভুলিয়া গিয়াছিলে (ফানাসিতাহা) এবং ওইভাবেই (ওয়া কাজালিকাল্) আজ (ইয়াওমা) তোমাকে ভুলিয়া যাইব (তুনশা)।
১২৭. আর ওই রূপেই (ওয়া কাজালিকা) আমরা প্রতিফল দেই (নাজ্জি) যে বাড়াবাড়ি করে (মান্ আসরাফা) এবং ইমান আনে না (ওয়া লাম ইউম্মিম্) তাহার রবের আয়াতসমূহতে (বেআয়াতি রাব্বিহি)। এবং আখেরাতের শাস্তি অবশ্যই (ওয়া লা আজাবুল্ আখিরাতি) কঠোর এবং অধিক স্থায়ী (আশাদ্দু ওয়া আব্কা)।
১২৮. তবে কি তাহাদেরকে রাস্তা (পথ) দেখায় নাই (আফালাম ইয়াহদি লাহম্) ? কতই না আমরা (আল্লাহ) ধ্বংস করিয়াছি (কাম্ আহলাক্না) তাহাদের পূর্বে (কাব্লাহম্) অনেক কণ্ঠের মধ্য হইতে (মিনাল্ কুরুনি) তাহারা চলিতেছে (ইয়াম্শুনা) মধ্য দিয়া (ফি) তাহাদের বাসস্থানসমূহে (মাসাকিলিহিম্)। নিশ্চয়ই উহার মধ্যে (ইন্না ফি জালিকা) (রহিয়াছে) অবশ্যই আয়াতসমূহ (লা আয়াতিল্) বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারীদের জন্য (লিউলিন্ নুহা)।

১২৯. এবং যদি না একটি কালিমা (বাণী) (ওয়া লাও লা কালিমাতুন) পূর্বে নির্দিষ্ট হইয়া থাকিত (সাবাকাত্) আপনার রবের পক্ষ হইতে (মির রাব্বিকা) অবশ্যই হইত (শাস্তি) (লাকানা) (এবং) অবশ্যস্তাবী (লিজামাও) এবং একটি নির্দিষ্ট সময় (আজালুম্ মুসাম্মান্) (যদি না থাকিত)।
১৩০. সুতরাং সবার করুন (ফাস্বির) তাহারা যাহা বলে (উহার) উপর (আলা মা ইয়াকুলুনা) এবং তসবিহ করুন (মহিমা ঘোষণা করুন) (ওয়া সাব্বিহ) প্রশংসার সহিত (বেহাম্দি) আপনার রবের (রাব্বিকা), সূর্য উদয়ের আগে (কাব্লা তুলুয়িস্ শামসি) এবং ডুবিয়া যাঁবার আগে (ওয়া কাব্লা গুরুবিহা)। এবং রাতের কিছু অংশ হইতে (ওয়া মিন্ আনাইল্ লাইলি) সুতরাং তসবিহ পাঠ করুন (মহিমা ঘোষণা করুন) (ফাসাব্বিহ) এবং দিনের অংশসমূহে (ওয়া আত্‌রাফান্ নাহারি) যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হন (লাআল্লাকা তার্দি)।
১৩১. এবং আপনার চোখ দুইটি প্রসারিত করিবেন না (ওয়া লা তাম্বুদান্না আইনাইকা) আমরা উপকরণ দিয়াছি যাহার প্রতি (ইলা মা মাত্তানা) সেই সম্পর্কে (বিহি) তাহাদের মধ্যকার বিভিন্ন শ্রেণীকে (আজ্‌ওয়াজাম্ মিন্ হম্) জঁকজমক (জাহারাতাল্) দুনিয়ার জীবনে (হায়াতিদ্ দুনিয়া)। ইহার মধ্যে আমরা যেন তাহাদের

পরীক্ষা করি (লিনাফ্‌তিনাহম ফিহি)। এবং আপনার রবের রেজেকই উত্তম (ওয়া রিজ্‌কু রাব্বিকা খাইরু) এবং স্থায়ী (ওয়া আব্বকা)।

১৩২. এবং নির্দেশ দেন (ওয়া মুর) আপনার পরিবারকে (আহলাকা) সালাতের সহিত (বিস্সালাতি) এবং দৃঢ় থাকুন (ওয়াস্তাবির) ইহার উপর (আলাইহা)। আমরা (আল্লাহ) আপনার কাছে চাই না (লা নাস্‌আলুকা) রেজেক (রিজ্‌কান) আমরাই (নাহ্নু) আপনাকে রেজেক দেই (নারজুকুকা)। এবং (শুভ) পরিণাম (ওয়াল্‌ আকিবাতু) মুঠাকিদের জন্য (লিত্তাকুয়া)।

১৩৩. এবং তাহারা বলে (ওয়া কালু), আমাদের কাছে আনে না কেন (লাওলা ইয়াতিনা) তাহার রবের নিকট হইতে একটি আয়াত (বিআয়াতিম্ মিন্ন রাব্বিহি)। তাহাদের কাছে আসে নাই কি (আওয়া লাম্ তাহ্‌তিহিন্) সুস্পষ্ট প্রমাণ (বাইয়িনাতু) যাহা আছে আগের দিনের সহিফাগুলির মধ্যে (মা ফিস্ সুহফিল্ উলা)।

[আমাদের কাছে বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে চারটি সহিফার নাম জানা আছে। যেমন কোরান, ইঞ্জিল, জাবুর এবং তাওরাত। ইহার পূর্বেও যে অনেক সহিফা পাঠানো হয়েছিল তারই জ্বলন্ত প্রমাণ হলো এই আয়াতটি। সেই অনেক পূর্ববর্তী সহিফাগুলোর নাম কী কী হতে পারে তার উল্লেখ আমরা কোরান-এ পাই না। কেউ হয়তো এমনও প্রশ্ন করতে পারে যে, সব রকম সহিফাই কি

মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো হয়েছে? বিশাল অখণ্ড ভারতে কি একটিও সহিফা দেওয়া হয় নি? কারণ প্রত্যেক কওমের হেদায়েতের জন্য আল্লাহপাক রসূল পাঠিয়েছেন। ইহা কোরান-এরই ঘোষণা। তা হলে অখণ্ড ভারতে অনেক কওমের আগমন ঘটেছে, কিন্তু তাদের সহিফাগুলো বর্তমান থাকলেও ধর্মীয় সাইনবোর্ড কাঁধে ঝুলাবার দরুন অনেকেই বেদ, গীতা, উপনিষদ-এর নামগুলো নিতে চায় না। ধর্মের নামে এ রকম সংকীর্ণতার গঞ্জির দেয়ালকে মানবজাতি কবে ভেঙে ফেলতে পারবে? অধম লিখক মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই কোরান-হাদিসের জ্ঞান অর্জনের জন্য গবেষণায় মনোনিবেশ করি, কিন্তু খোদা না খাস্তা আজ যদি হিন্দুর ঘরে জন্ম নিতাম তা হলে কি কোরান-হাদিসের জ্ঞান অর্জন করার এ রকম আগ্রহটি থাকত? তা হলে কি বেদ-গীতা-উপনিষদ-এর উপর জ্ঞান-গবেষণায় ভুবে থাকতাম? তা হলে বুকে হাত রেখে আপন বিবেকটিকে একদম নিরপেক্ষ রেখে এই কথাগুলোর ভিত্তিতে কি বলতে পারি না যে, আমাদের জন্মটাই আমার আজন্ম আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ?]

১৩৪. এবং যদি (ওয়া লাও) যে আমরা (আননা) তাহাদের ধ্বংস করিয়া দিতাম আমরা (আহ্লাক্নাহম্) আজাব দিয়া (বিআজাবিম্) তাহার পূর্ব হইতে (মিন্ কাবলিহি) তাহারা নিশ্চয়ই বলিত (লাকালু) হে আমাদের রব (রাব্বানা), কেননা (লাওলা) তুমি পাঠাইয়াছিলে

(আরসালতা) আম্মাদের দিকে (ইলাইনা) কোনো রসুল (রাসুলান)
 আম্মরা যাহাতে অনুসরণ করিতাম (ফাত্তাবিয়া) তোমার
 আয়াতসমূহ (আয়াতিকা) তাহার পূর্বে (মিন কাবলি) লাক্ষিত
 হইতাম আম্মরা (আন্ নাজিল্লা) এবং আম্মরা অপমানিত হইতাম
 (ওয়া নাখজা)।

১৩৫. বলুন (কুল) প্রত্যেকেই (কুললুন) অপেক্ষাকারী
 (মোতারাব্বিসুন) সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো (ফাতারাব্বাসু),
 সুতরাং তোমরা তাড়াতাড়ি জানিবে (ফাসাতালামুনা) কাহারো (মান)
 অধিকারী (আস্হাবুস) পথের (সিরাতিস) সঠিক (সাওউয়ি) এবং
 (ওয়া) কে (মানিহ) হেদায়েতপ্রাপ্ত (তাদাহ)।

নফস ও রুহের পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা

বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (বাবা শেখ ফরিদ)-এর দিওয়ান-এর ফারসি
 ভাষা ও শব্দগুলো বুঝি, যদিও পুরানো ফারসি ভাষায় রচিত। যদি দু-
 চারটা শব্দ বুঝতে না পারি তো হাতের কাছে রাখা তিন-চারটা ফারসি
 অভিধান খুলতে হয়। কারণ এমন শব্দও পাওয়া যায়, যার অর্থটি একটি

অভিধানে পেলাম না। তখন হতাশ হয়ে উর্দু অভিধান খুলি। একবার বাবা শামসে তারিঞ্জের দিওয়ান-এর একটি ফারসি শব্দ বুঝতে না পেরে অভিধান খুলে না পেয়ে হতাশ হলাম। আমার ভক্ত মাগুলানা মাহ্‌তাব উদ্দিন (ডবল টাইটেল) অবশেষে একটি পুরানো অভিধানে পেল। শব্দটি হলো ‘কেচ্‌কুলা’। অর্থটি হলো, নতুন কাপড় পরিধান করার পর আয়নায শরীরটি দেখে স্টাইলটা হাত দিয়ে ঠিক করে নেওয়া। বাক্যের সঙ্গে অর্থটির মিল পাচ্ছিলাম না। অবশেষে ফারসি ভাষায় ডক্টরেট জামাল উদ্দিন (বাঙালি নয়) বিষয়টি বুঝিয়ে দেবার পর আনন্দ পেলাম এবং অবাক হলাম বাক্য গঠনের শৈলী দেখে। অথচ বাবা শামসে তারিঞ্জ নিরঙ্কর ছিলেন। উনি ভাবে তন্ময় হয়ে বলতেন আর মুরিদ মাগুলানা জামাল উদ্দিন রুমি লিখে রাখতেন। অনেকটা আমাদের বাউলসম্রাট লালনের মতো। একতারায় গান গাইতেন আর ভক্তরা সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখতেন। শুনেছি বহু গান লিখার অভাবে হারিয়ে গেছে। কিন্তু বাবা শেখ ফরিদের একটি বাক্য অতি সহজ ফারসিতে লিখা এবং শাব্দিক অর্থটি সহজেই করা যায়। কিন্তু ভেতরের অর্থটি আজও বুঝতে পারলাম না। বাক্যটির অনুবাদ হলো, ‘পৃথিবীর সব মানুষের জীবনগুলো আমি, বুদ্ধিগুলো আমি এবং দেহগুলোও আমি।’ এর ব্যাখ্যা কী লিখব ভেবে পাই না। তবে শুনতে ভালো লাগে। কারণ বিশাল মানবতাবাদের দর্শন বলে মনে হলো। ভেতরের অর্থটি উদ্ধার করার মতো শক্তি নেই বলে এটাই মনে করে

নিতে বাধ্য হলাম। তবে এটুকু বুঝতে চেষ্টা করলাম যে, এই কথাগুলো মাথার জ্ঞান নয়, বরং সিনার জ্ঞান! সিনার জ্ঞানটিকে আমরা মাথার জ্ঞান দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি। তাই আসল কথাটি বুঝতে কষ্ট হয়। বাবা ফরিদের আপন ভাগিনা বাবা আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরির কথা আরও বুঝা যায় না। যেমন তিনি বলছেন, ‘ইউসুফের রূপ বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে শাস্তি দ্রুত করল, তাই জুলাইখা তার নিজের রূপ নিজেই কিনে নিলেন।’ অন্যত্র বলেছেন, ‘বলে দাও ফকিরের শান কী॥ এখানে মৃত, আবার একই সময়ে অন্যত্র হেঁটে চলছেন।’ এটা না হয় আমরা অনেকেই জানি যে, বাবা বাকি বিল্লাহর জানাজা তিনি নিজেই পড়েছেন, অতএব বিষয়টা জানার মতো কিছুটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু সিনার এলিমের বিষয়গুলো মাথার জ্ঞান দিয়ে প্রায়ই বোঝা যায় না। কেবল ধোঁয়াই দেখে যেতে হয়। আগুনের সঙ্কান পাওয়া যায় না। এটুকু বুঝতে পারলাম যে, এগুলো বুঝতে হলে মোরাকাবা-মোশাহেদা তথা ধ্যানসাধনার মাধ্যম ছাড়া বোঝা যাবে না। বাবা শেখ ফরিদ বলেছেন, নূরে মান দার তাংগে নান্নি তান্নজো, আফতামাব্ জ্বাররা-এ রওশন না আম। আমার দেহটি দেখে আমার ভেতরের নূর খুঁজে কোনো লাভ নাই। কারণ রহস্যলোকের যে সূর্যটি আমার ভেতরে আছে তা মস্তিষ্কপ্রসূত বিদ্যা ও জ্ঞান দিয়ে কিছুই বুঝতে পারবে না। বাবা ফরিদের ভাষায়, কলবের জ্ঞানটি মাথার বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে বোঝাটা মোটেই সম্ভবপর নয়। কারণ মাথার বুদ্ধি ও জ্ঞান

দুনিয়ার প্রতিষ্ঠা চায়। মাথার জ্ঞান-বুদ্ধির এ রকম চাওয়াটাই ধর্ম। সুতরাং মোটামুটি একটা সাধারণ জ্ঞানেও দেখতে পাই যে, মাথার জ্ঞান-বুদ্ধি শক্তির পূজা করে, প্রতিযোগিতার পূজা করে, সমাজ-সংসারে মাতব্বর হওয়ার পূজা করে এবং আরও কত কী! আদর্শের বাঁধ দিয়ে, প্রেমের দেওয়াল দাঁড় করিয়ে, শক্তির পূজারককে প্রেম-ভালোবাসার মোকামে ঢোকানোই যায় না। জোর করে ঢোকাতে গেলেই প্রেমের পূজারিরা বুঝতে পারে যে, এরা প্রেমের অভিনয় করতে এসেছে, নিখুঁত অভিনয়। ধরার কোনো ক্লু পাওয়া কষ্টকর। এরাই সুফিবাদের ক্লাসে ঢুকে সুফিবাদের গলায়, নাকে, কানে আর হাতে শাস্ত্রের নানা রকম অলংকার পরিয়ে দেয়। তাই সুফিবাদের উপর গবেষণা করতে গেলে প্রায় স্থানে দেখতে পাই লেজে-গোবরের করুণ দৃশ্যটি। সাধারণ মানুষ হতে দুনিয়াবি বিজ্ঞানের এত উঁচু মাপের কথাগুলো বুঝতে পারে না এবং না পারাটাই একান্ত স্বাভাবিক। মাথার জ্ঞানীদের মাঝে কলবের জ্ঞানীদের অনেককেই কিছুটা সমীহ করে, আবার অনেকে সমীহ করা তো দূরে থাক, বরং মিটিমিটি হাসে। হাসার কারণটি হলো, কলবের জ্ঞানটিকে কোনো জ্ঞানই মনে করতে চায় না। ভাবখানা অনেকটা এ রকম, মরার পর কী হবে সেটা ভেবে কোনো লাভ নাই। যা হবার তা তো হবেই। শাস্ত্রের আর শাস্ত্রের কথাটা এরা ভাবতে চায় না। অনেকে ভাবে, কিছু ভাবনার সঙ্গে একখানা এবাদত করার ছক বেঁধে নেয়। এবাদতের দিকটিকে মেনে চললেই হলো। এবাদতের ছকটিতে

থাকে কেবল সুখ ও ভোগ। দুনিয়ার সুখ ও ভোগের ধারণাটি দ্বিধা পরকালের সুখভোগটি বানিয়ে নেয়। এদের কথা ও কাজে কেবল ভোগ আর ভোগ। ভোগটিও যে এক ধরনের বন্ধন এটা মানতে চায় না। ভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করতে যেমন দুনিয়াতে পরিশ্রম করতে হয়, তেমনি কিছু পরকালের ভোগে থাকে না। কেবল শুয়ে-বসে খাদ্য, পানীয় আর রূপসীর রূপসুধা ভোগ করতে হবে। ভোগ ছাড়া জড়দেহটিকে টিকিয়ে রাখা যায় না। কিছু স্বর্গে ভোগ ছাড়াও দেহটিকে তো টিকিয়ে রাখা যায়। তবে ভোগের এত লোভনীয় আয়োজন কেন? নফস (জীবাত্মা) ভোগ ছাড়া অন্য কিছুই বুঝতে চায় না। পরিতৃপ্ত নফসকেই (নফসে মোত্মায়েল্লা) তো জান্নাতে আগমন করার স্বাগতম জানানো হয়। তা হলে পরিতৃপ্ত নফসের তো অতৃপ্তি থাকার কথা নয়! যে নফস তৃপ্ত তাকে আবার কেন্নন করে তৃপ্ত হতে হবে? চাওয়া-পাওয়া ভোগ-বিলাস হতে যে নফস সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সম্পূর্ণ তৃপ্ত তাকেই তো নফসে মোত্মায়েল্লা বলা হয়। তা হলে পরিতৃপ্ত নফসটিকে আবার ক্লুধার্ত রূপে কেন দেখব? ভোগ ছাড়া কি নফসটি টিকতে পারে না? ভোগ ছাড়া কি নফসটি বাঁচতে পারে না? জান্নাতে তো মৃত্যু নাই, বুড়ো হতে হবে না। টংবগে যুবকের মতো থাকতে হবে। জান্নাতে কোনো প্রকার কাজ ছাড়া কেবল সুখভোগ করাটাও তো একটি সুক্ষ্ম বন্ধন বলে মনে হতে চায়। তবে এ রকম সুখভোগটিকে নির্মল পবিত্র মহানন্দ বলা যায় এবং এটাও একটি খাস রহস্য। এটাকে অস্বীকার করা

যায় না। অস্বীকার যারা করে, তারাও নীতিহীন নীতির বচন শুনিয়ে আনন্দ পায়। সংস্কারের জটিল অংক বানিয়ে নেগেটিভ দর্শনটি প্রচার করে পণ্ডিত সাজতে চায়। সব স্থানে সব বিষয়ে পণ্ডিতি চলে না। অনেক স্থানে অনেক পরিবেশে মনের অপছন্দটিকে মেনে নিতে হয়। সুতরাং বেহেশতে অবশ্যই সুখ ও ভোগ আছে। আর আছে ভোগের অকল্পনীয় সব রকম ব্যবস্থা। নফস যতই পরিশুদ্ধ হোক না কেন, যতই পরিতৃপ্ত হোক না কেন, জান্নাতে আসবার সুসংবাদটি এ জন্যই জানানো হচ্ছে যে, নফসের ধর্মই ভোগ। সেই ভোগটি যতই মার্জিত হোক না কেন, তবুও ভোগের জন্যই নফসের সৃষ্টি। ভোগই নফসের তকদির। আশ্চর্য্য নফসের ভোগটি দুঃখের। সুতরাং জাহান্নামে গিয়ে অকল্পনীয় দুঃখ ভোগ করতেই হবে। নফসে লাগয়াম্মার ভোগটি মিশ্রিত। দুঃখ এবং সুখ দুটোই ভোগ করতে হবে। তবে প্রথমে এক বোঝা দুঃখ ভোগ করার পর সুখ-সাগরের ভোগ। ভোগের জন্যই বানানো হয়েছে নফসটিকে। কিন্তু রুহ তথা পরমাত্মা ভোগ করে না। ভোগ না করাটাই রুহের তথা পরমাত্মার তকদির। রুহ তথা পরমাত্মাটি এক এবং অখণ্ড। রুহ তথা পরমাত্মাটির বহুবচন নাই। ‘অনেক রুহ’ কোরান বলে নি। কোরান রুহকে সর্বস্থানে একবচনে ব্যবহার করেছে। রুহ বিষয়টি কোরান-এ মাত্র সতের বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং সর্বস্থানেই একবচনে রুহকে পাই। বহুবচনের প্রশ্নই ওঠে না। পক্ষান্তরে নফসকে একবচনে পাওয়া যায় না, বহুবচনে পাওয়া যায়। প্রতিটি নফসকে মৃত্যুর

স্বাদ তথা মজা গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু রুহের মৃত্যুর স্বাদ তথা মজা গ্রহণ করার কথাটি কোরান-এ নাই। নফস জন্ম-মৃত্যুর অধীন। নফস সুখ-দুঃখের অধীন। নফস পরিশ্রম ও বিশ্রামের অধীন। নফস চঞ্চল, দিশেহারা, হা-হতাশ আর হাসি-ঠাট্টার অধীন। নফস প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, উত্তর আর অতৃপ্তির অধীন। নফস নতুন নতুন ভোগ-লালসার অধীন, তাই কল্পনা ও গবেষণার অধীন। ফুলের মালা আর ফাঁসির মালা দুটোই নফসকে পরতে হয়। নফস হিংস্র, তাই হিংস্রকেই সম্মান করে। তাই হিংস্র সিংহকে বনের রাজা বানায়। বাঘের নামটি নিজের নামের আগে-পিছে দিতে গর্ববোধ করে। কারণ নফস বহুরূপী। নফস রঙ্গিলা। নফসের কার্যকলাপ একেক স্থানে একেক রকম। কোথাও ভোগী, কোথাও ত্যাগী। কোথাও শক্তির পূজায় বিভোর আবার কোথাও প্রেমের পূজায় মশগুল। কোথাও রাজসিংহাসন পাবার আশায় চক্রান্তের জটিলতা পাকায়, আবার কোথাও সিংহাসন ফেলে স্বেচ্ছায় ফকিরির মলিন বসন পরিধান করে। নফসের এ রকম উল্টাপাল্টা চরিত্রটি না থাকলে দুনিয়ার খেলাটি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু রুহ তথা পরমাত্মার কোনো কাজ থাকে না। রুহ তথা পরমাত্মার প্রত্যক্ষ অবস্থানটি কেবলমাত্র দুইটি প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করে। একটি মানুষ এবং অপরটি জিন। (অবশ্য আমাদের জানা মতে, কারণ অন্য গ্রহে যদি জীব থাকে?) রুহ তথা পরমাত্মাটি সৃষ্টির আর কোথাও নাই। তাই মানুষকেই আমরা মুনি-ঋষি, ওলি-আউলিয়া, আবদাল-আরিফ, রসুল

এবং নবিরূপে দেখতে পাই। রুহ তথা পরমাত্মাটি যখন জীবাত্মার খোলস নামের ডিম্ব হতে বেরিয়ে আসে, তখন জীবাত্মার খোলসটি কেবলই বাহনের ভূমিকা পালন করে। বাহন দেহটি সঙ্গে না থাকলে রুহ তথা পরমাত্মার পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ রুহ নিরাকার। আকার যার আছে সে নিরাকারটিকে বুঝতে পারে না। তাই রুহ মানব আকারের মধ্যে প্রকাশিত হয়। রুহ-এর কখনোই জ্ঞানাতের সুখভোগ এবং জাহান্নামের দুঃখভোগ করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ ভোগের উর্ধ্বে রুহের তকদির। তবে রুহের তকদির অসীম। নফস ভোগ করে, কিন্তু অনেকেই ভুল করে নফসের স্থলে রুহকে টেনে আনে। কারণ নফস আর রুহের উপর পরিষ্কার ধারণাটি না থাকলে এমনটি হতে বাধ্য। তাই অনেক সময় মুখ ফস্কে বলে ফেলি যে, যারা নফস আর রুহের পার্থক্যটি করতে পারে না, তারা আবার কেমন করে সুফি এবং ইসলাম-গবেষক হয়? রুহ যেমন ভোগের উর্ধ্বে, তেমনি সৃষ্টি-জগতেরও উর্ধ্বে। তাই রুহ সেখানে প্রকাশিত হবে যেখানে ফেরেশতাদের আগমন অবধারিত। রুহ জন্মগ্রহণ করে না এবং জন্ম দেয়ও না। রুহ ডোবেও না উদ্ভিতও হয় না। রুহ সব সময় ভাসমান (সোবহান)। তাই রুহের বিষয়টি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে তথা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে বীজরূপী রুহকে জাগিয়ে তোলা যায়। ধ্যানসাধনার নিয়মগুলো আপন গুরু জানিয়ে দেবে। গুরুর আদেশ অনুসারে ধ্যানসাধনা করার পর যদি ব্যর্থ হয় তো অন্য গুরু ধরা ফরজ। অবশ্য

সবার জন্য নয়। কারণ সবাই ধ্যানসাধনা করে না। যারা সাধক কেবল তাদেরকেই কথাটা বলছি। সাধক, গুরুর পর গুরু বদলাতে পারবে। গুরু যদি অন্ধকার হতে আলোর পথটি দেখাতে না পারেন, তো কেমন গুরু? সাধকের জন্য এ রকম গুরুকে বর্জন করা অবশ্যকর্তব্য। এক বস্তা কথা আর বই পড়ে সত্য পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় ধ্যানসাধনার মাধ্যমে। এই বিষয়টাই মহানবি হাতে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন হেরা গুহায় নির্জন ধ্যানসাধনা করে। মহানবি এ রকম ধ্যানসাধনার বহু উর্ধ্বে। কারণ প্রথম মানব আদম যখন কাদামাটিতে তখনও তিনি মহানবি। মহানবি নিজে আগে হেরাগুহায় ধ্যানসাধনাটি করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন। কেউ বোঝে, আবার কেউ বোঝে না। তবে এ বিষয়টি ভালো করে জেনে রাখা ভালো যে, যাদের ধ্যানসাধনার পথে এগিয়ে যাবার আগ্রহ থাকবে না তাদের গুরু পরিত্যাগ করা মোটেই সমীচীন নয় বলে মনে করি। কারণ এতে হিতে বিপরীত হয়। কারণ গুরু ধরা এবং গুরু পরিত্যাগ করাটা আগুন নিয়ে খেলা করা। কারণ এটা স্কুল-কলেজের গুরু নয় যে মাথার জ্ঞান শিক্ষা দেবে। তাই তো বু আলি শাহ কলন্ডর তাঁর মুরিদদেরকে মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করার জন্য বারবার বলেছেন। উনি তো অনেকটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। বলেছেন, আমার কথামতো মাত্র তিনটি চল্লিশ দিনের মোরাকাবা করে যদি এলমে লাদুনির সামান্য পরিচয়টুকু না পাও, তো দুই হাতে দুটি পাথর নিয়ে আমার মাজারে ছুঁড়ে মেরে দিয়ে বলে দিয়ো,

কলন্ডর মিস্ত্রিক। কলন্ডর বাবা ফরিদের মুরিদ ও খলিফা। বাবা ফরিদ বাবা কুতুব উদ্দিন বকতিয়ার কাকীর মুরিদ ও খলিফা। বাবা কুতুব উদ্দিন সুলতানুল হিদ্দ খাজা গরিব নেওয়াজের মুরিদ ও খলিফা। চিশতিয়া হতে কয়েকটি শাখা বেরিয়েছে। তার মধ্যে সাবেরিয়া ও কলন্ডরিয়া দুইটি অন্যতম প্রধান শাখা। কলন্ডরির আচার-অনুষ্ঠানের তেমন একটা গুরুত্ব দেন না। মোরাকাবার ধ্যান-সাধনাটি অনেক প্রকার। একেক গুরুর ধ্যানসাধন পদ্ধতি একেক রকম। ঘাট অনেক, পুকুর একটাই। তাই বাবা জ্ঞানশরীফ শাহ সুরেশ্বরী মোরাকাবার ধ্যান-সাধনার তেইশ রকম পদ্ধতি লিখে দিয়েছেন।

কেবল ধনসম্পদের নেশায় কাটিয়ে দিলাম জীবনটা : মাত্র একটি চল্লিশ দিনের মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করে যেতে পারলাম না। পূর্ণতা অর্জন করতে পারি নি বলে কি এলম্বে লাদুনির তথা এলম্বে কল্বের সামান্য নিদর্শনটি জ্ঞানবার সময়টুকু বের করে নিতে পারলাম না? কেবল রূপসী রমণীর দেহভোগের হেরোয়েঞ্চি হয়ে রইলাম। এমন বদনসিব নিয়ে কেবল কলুর বলদের মতো খেটে গেলাম। তাই তো লালন বলছেন, ‘এমন মানব জনম আর তো হবে না, মন জয় করো তোমার মনের বাসনা।’

কোরান নফসকে জীবাত্মা বলে নি, নফসকে নফসই বলেছে। আমরা নফসকে আমাদের বুঝবার সুবিধার জন্য জীবাত্মা বলি। সব জীবের মধ্যে নফস আছে, কিন্তু রুহ নাই। রুহ কেবলমাত্র জিন ও মানবকে দান করা

হয়েছে। রুহ সঙ্গে না থাকলে নফস সাধারণ জীবে পরিণত হয়। এ জন্য মানুষ জীব হয়েও যা করতে পারে অন্য কোনো জীব তা করতে পারে না। তার মানে হলো, অন্য কোনো জীবের মধ্যে রুহ নাই এবং এই না থাকার দরুন সব জীব সাধারণ। সাধক জীবের মধ্যে স্রষ্টার পরিচয় খোঁজে, কিন্তু আসল পরিচয়টি মানুষ ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। রুহ মানুষ এবং জিন নামক জীবের মধ্যে আছে বলেই শয়তানকে সঙ্গে রাখা হয়েছে। শয়তান সঙ্গে আছে বলেই পৃথিবীতে জাগতিক সভ্যতার প্রসার ঘটছে দিনের পর দিন, ধাপে ধাপে বিবর্তনের রূপটি ধারণ করে। শয়তান মানবসভ্যতা বিস্তারে সহায়কের ভূমিকা রাখে। শয়তানের কাঠমিস্ত্রি, মণি-মুক্তা সংগ্রহকারী এবং ডুবুরির ভূমিকা পালন করার কথাটি কোরান-এর ৩৮ নম্বর সূরা সোয়াদের ৩৭ নম্বর আয়াতে পাই। নবি দাউদ ও সোলায়মান শয়তানদের দ্বারা অনেক মানবসভ্যতার কাজ করিয়ে নিয়েছেন। দ্বান্দ্বিক দর্শনের মতো শয়তানের ভূমিকা। মানবসভ্যতা বিস্তারের ভূমিকায় শয়তান সহায়ক, কিন্তু রুহকে নিজের মধ্যে জাগ্রত করার প্রশ্নে শয়তান ঘোরতর শত্রু। এ জন্যই শয়তানের ভূমিকাটি এতই জটিল এবং সূক্ষ্ম যে, যে কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত টানতে গেলেই লেজে-গোবরে অবস্থাটি দেখা দেয়। তালগোল পাকিয়ে ফেলি। কখনও দড়িকে সর্প মনে করে হাতে নিই, আবার কখনও সর্পকে দড়ি মনে করে হাতে নিই। হাতে না নেওয়া পর্যন্ত দড়ি আর সর্পের পার্থক্যটি বুঝতে কষ্ট হয়। শয়তানই বারবার ধরণীতে পাঠিয়ে দেবার

ব্যবস্থাপত্রটি হাতে তুলে দেয়। এই প্রচণ্ড শক্তিশালী শয়তানের রকমসকম যিনি মনে-প্রাণে ধরতে পারেন তিনিই ধ্যানসাধনায় ডুব দেন। কামিয়ার হতে পারলেই মুক্তি। মুক্তিতে আগমন থাকে না। ইচ্ছাকৃত আগমনেও মুক্ত মানব। মহাপুরুষ। মুক্তির প্রচার করে যান। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। বোঝাটাও তকদির, না বোঝাটাও তকদির।

হজরত আজাজিল ছয় কোটি বছর আল্লাহর গুণগান গাইলেন। এক লক্ষ বছর কেবল ‘আল্লাহ’ জিকির করলেন। তারপর এক লক্ষ বছর ‘সোবহানাল্লাহ’ জিকির করলেন। তারপর এক লক্ষ বছর ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পড়লেন। তারপর এক লক্ষ বছর ধরে কেবল ‘আল্লাহ জাল্লাশানাহ’ পড়লেন। এভাবে আল্লাহর একেকটি গুণবাচক নাম ধরে পড়লেন। এতে আল্লাহ এতই খুশি হলেন যে, জিন জাতি হতে আগত আবুল গাভিবের ছেলে আজাজিলকে, সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি যাদেরকে ভালো-মন্দ দিয়ে তৈরি না করে কেবল ভালো গুণ দিয়ে তৈরি করেছেন, সেই ফেরেশতাদের সর্দার বানিয়ে দিলেন। মানুষের মতো জিনদেরকেও ভালো এবং মন্দের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং নির্বাচন করার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার সীমিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি কোরান মতে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নি, একমাত্র মানব এবং জিন ছাড়া। আল্লাহ ভালো করেই জানতেন যে, তেলে আর জলে কোনোদিন মিল খাবে না। তবুও জেনে-গুনেই ফেরেশতাদের সর্দার বানিয়ে

দিলেন আজাজিলকে। আজাজিল খুবই খুশি, কারণ এত বড় সম্মান আর
 ইচ্ছিত পাওয়াটা চারটিখানি কথা নয়। তেলে আর জলে যে কখনোই মিল
 খাবে না এটা কিছুদিন পরেই ধরা পড়ে গেল। এবং এক লাফে সম্মানের
 আকাশ হতে আজাজিল মাটিতে পড়ে গেল। কারণটি কী? মাত্র একটি
 কারণ। আদমকে সেজদা করতে বললেন আল্লাহ। সবাই সেজদা করেছিল,
 কিন্তু আজাজিল করে নি। এই না করার কারণটি ছিল : মাটি এবং আগুন
 কখনও এক নয় বলে সে ঘোষণা করল এবং আগুন মাটি হতে উদ্ভব বলে
 ঘোষণা করল। ফেরেশতাদের স্বাধীনতা নেই, কারণ তাদেরকে স্বাধীনতা
 দেওয়াই হয় নি। তাই বিনাবাক্যে তারা সবাই সেজদা করলো তথা
 আদমের আনুগত্য গ্রহণ করলো এই বলে যে, আদমকে যে বিশাল জ্ঞান
 দান করা হয়েছে, সেই জ্ঞানের বিন্দু-বিসর্গও তাদের জ্ঞান নাই। আদমের
 মাধ্যম ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যাবে না জানবার পরও আজাজিল সেজদা
 করতে অস্বীকার করে অহংকার করল। অহংকারটিকে কোরান-এর ভাষায়
 ‘বালাসা’ বলে। আর যে অহংকার করে তাকে কোরান-এর ভাষায় ইবলিস
 বলা হয়। ইবলিস সোজাসুজি আল্লাহকে ডাকে। মাধ্যম মানে না এবং মাধ্যম
 নিতে ঘৃণা বোধ করে। আদমকে সেজদা করতে তথা আনুগত্য গ্রহণ করতে
 তথা পূজা করতে অস্বীকার করল। কারণ ইবলিসের মতে আদমপূজা
 ইসলামেতে নাই। মুসা নবির সময় নাজাতের জন্য ইবলিসকে আদমের
 মাজার পূজা করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু ইবলিস সোজা বলে দিল যে,

আদমপূজা-মাজারপূজা ইসলামেতে নাই। এই বিষয়টি সুন্দর করে তুলে ধরেছেন হজরত আমির খসরু তাঁর রচিত কুল্লিয়াতে আমির খসরুতে। মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়া এবং খাজা গরিবে নেওয়াজ-এর পীর খাজা উসমান হারুনি এবং বাংলার বাউলসম্রাট লালন ফকির একদম সোজা ভাষায় বলে গেছেন। তবে মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার কথাগুলো অতি চমৎকার এবং বিস্ময়কর এবং বিশেষ জ্ঞানীদের জন্য গ্রহণযোগ্য। হজরত আমির খসরুর ভাষায় তাঁর পীর মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়া বলেছেন যে, তোমরা ভালো করে দেখো তো, উসুজুদুর পর তাহিয়া অথবা তাজিমি শব্দটি কোরান-এ ব্যবহার করা হয়েছে কি-না। সেজদার সঙ্গে সম্মান শব্দটি মাথার জ্ঞানীরা লাগিয়ে নেন এবং অনেক রকম কথার মারপ্যাচ দিয়ে সহজ-সরল বিষয়টিকে জটিল, ঘোলাটে করে তোলেন। তাই সাধারণ মানুষ মাথার জ্ঞানীদের মারপ্যাচের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে চলে এবং উলঙ্গ সত্যটিকে তখন আর বুঝবার তাদের জো থাকে না। মক্কার জাহেরি কাবাটিকে তোয়াফ ও সেজদা করার বিধান শরিয়তে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া মক্কা জাহেরি তিনটি শয়তান আছে। একটি বড় শয়তান, একটি মাঝারি শয়তান এবং একটি ছোট শয়তান। হাজিরা এই জাহেরি শয়তানকে ককর হুঁড়ে মারে এবং যে-ককর হুঁড়ে মারে সেইটাও জাহেরি ককর। বাতেনি শয়তান বাহিরে থাকে না। উহা থাকে প্রতিটি মানুষের অন্তরে। মানুষ এবং জিনের অন্তর ছাড়া শয়তানের থাকার

আর কোনো স্থান সৃষ্টিজগতে নাই, ইহা কোরান-এর প্রকাশ্য ঘোষণা।
 বাতেনি শয়তানের পরিচয় জানার জন্য বাহিরের শয়তানের প্রয়োজন।
 বাহিরের শয়তানকে জীবনভর কঙ্কর ছুঁড়ে মারলেও ভেতরের শয়তানটিকে
 সরিয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ বাহিরের তিনটি জাহেরি শয়তানকে পাথর
 দিয়ে বানানো হয়েছে। সেই পাথরও তৌহিদে বাস করে। কারণ সৃষ্টিজগৎ
 তৌহিদে বাস করে, ইহা কোরান-এর প্রকাশ্য ঘোষণা। সুতরাং হাজিদের
 হাতের কঙ্কর নামক পাথরের টুকরাগুলোও তৌহিদে বাস করে। জাহেরি
 কাবা-তোয়াফ করাটাও জাহেরি তোয়াফ এবং শরিয়তে সামর্থ্যবানদের
 জন্য ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাতেনি কাবাটি যে মোম্বিনের
 কাল্ব, আম্মানুর কাল্ব নয়, ইনসানের কাল্ব নয় এবং আলবাবের কাল্ব
 নয়। যিনি মোম্বিন তার কাল্বই বাতেনি কাবা। বাতেনি কাবার তোয়াফ
 বাতেনিতে করতে হয়। বাতেনির সঙ্গে জাহেরকে জড়ানো যায় না। সুতরাং
 বাতেনি কাবার তোয়াফ ও সেজদা বাতেনিতে ফরজ। মক্কার জাহেরি তিনটি
 শয়তান যেমন আসল তথা বাতেনি শয়তান নয়, বরং একদম জাহেরি এবং
 জাহের-পরস্তুদের জন্য কঙ্কর নিক্ষেপ করা ফরজ। সেই রকম জাহেরি
 কাবার জাহেরি তোয়াফ করাটি জাহের-পরস্তুদের জন্য ফরজ। তাই তো
 দিল্লির বিখ্যাত ওলি হজরত সারমাস্ত বলতেন যে, আমার কামেল গুরু বাবা
 হারে ভারেই আমার আসল কাবা, আর মক্কার কাবাতে গিয়ে দেখো,
 দেখতে পাবে একটা খালি ঘর। খাজা গরিবে নেওয়াজের পীর খাজা

উসমান হারুনি তো একদম খোলামেলা বলেই ফেলেছেন যে, আমি ফরজ এবাদত করার চেয়ে আপন গুরু হাজি শরিফ জিন্দানাকে সেজদা করতে বেশি আগ্রহী। (ফারসি ভাষায় রচিত কথাগুলোর অনুবাদ আরও উলঙ্গ, আরও খোলামেলা। তাই কিছুটা ঢাকনা দিয়ে লেখলাম)। আবার বাউলসম্রাট লালন ফকির তো একদম সোজা বলেই ফেলেছেন, আদমকে এ জন্যই সেজদা করতে হকুম দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ স্বয়ং আদমের মধ্যে নুরে মোহাম্মদিরূপে বিরাজ করছেন। সুতরাং যারা বলে যে, আদমপূজা, মাজারপূজা ইসলাম্মেতে নাই, তাদের এবাদত-বন্দেগির সঙ্গে আজাজিলের এবাদত-বন্দেগির কত চমৎকার মিল পাওয়া যায়। আপনাদের গবেষণা করার অধিকার আছে। আর আছে যুক্তি প্রদর্শন করার স্বাধীনতা। কিন্তু অন্যরা গবেষণা এবং যুক্তি প্রদর্শন করলেই কেন গাৱদাহ হয়? কামেল গুরুকে আনুগত্যের সেজদাটি অবশ্যই করতে হবে। নতুবা কিছুই পাবার আশা করা যায় না। জাহেরি সেজদা করাটা এখানে মুখ্য নয়। অনেকে করেন, অনেকে করেন না। কারণ জাহেরি সেজদা করার পর মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় এবং অনেকে নেয়। কিন্তু আনুগত্যের সেজদাটি বাতেনি এবং মুখ ফিরিয়ে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। তাই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জালালি পীর বাবা আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরি তাঁর এক ভক্তকে বলেছিলেন এই বলে যে, দেখো বাবা, জীবন দেওয়া যত সহজ, তার চেয়ে বহু গুণে কঠিন হৃদয় দেওয়া।

(বড়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বারবার বলতে হচ্ছে, বলতে হচ্ছে আপন বিবেকের বারবার বোবা চিৎকারধ্বনির পরিপ্রেক্ষিতে যে, বাংলার বুকে কি একজনও পীর নাই, যিনি ওলি-আল্লাহদের ফারসি ভাষায় রচিত মহামূল্যবান বইগুলো সংগ্রহ করে অথবা ফটোস্ট্যাট করে সেই বইগুলোর সরল বঙ্গানুবাদ করে প্রচার করবেন?)

মাথার জ্ঞান ও সিনার জ্ঞানের পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা
 ওহাবিদের বর্তমান রাজ্য সৌদি আরব কী সুন্দর বুদ্ধি করে মুসলিম জাহানের প্রতিটি মাদ্রাসা হতে ফারসি ভাষাটিকে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এবং দিয়েছে! আরও দুঃখের বিষয় যে, ইরানের মাতৃভাষা ফারসি হওয়া সত্ত্বেও তারা শিয়া ফেরকার মুসলমান। শিয়া ফেরকার মুসলমানেরা ওহাবিদের মতোই সুফিবাদ মানে না। এ যেন টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। আর যদি ইরানি শিয়া ফেরকার মুসলমানেরা সুফিবাদকে গ্রহণ করে নিতেন, তা হলে ওলি-আল্লাহদের রচিত হাজার হাজার মহামূল্যবান বইগুলো আজ আমরা অনায়াসে পেতাম। বাংলাদেশের পীর সাহেবেরা প্রত্যেকেই নিজেকে গাউসুল আজম বলে ঘোষণা করেন। জাঁকজমকপূর্ণ চোখ ঝলসানো ওরস পালন করেন প্রতি বছর এবং এর জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করেন। এই টাকার একটি ভগ্নাংশও যদি প্রচারের জন্য ব্যয় করা হতো, তা হলে ওহাবি মতবাদের ভিত্তি ভূমিকম্পের মতো থরথর করে

কেঁপে উঠত। কিছু আফসোস! আমার এই কথা, আমার এই ফরিয়াদ, আমার এই বিলাপ, বাংলার আকাশে-বাতাসে কেবলই বোবা প্রতিধ্বনি করবে। অধম লিখক আরও বলতে চাই যে, ওহাবি মতবাদের প্রচার ও প্রসার এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, একদিন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুফিবাদকে হয়তো ভুলে যেতে পারে। এমনকি প্রতিটি টেলিভিশনের চ্যানেলেও আজ ওহাবি মতবাদের প্রকাশ্য প্রচার চলছে। অথচ আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারীদের একটিও টেলিভিশন চ্যানেল নাই। শুনলে অবাক হবেন যে, কাদিয়ানিদের মতো একটি বাতিল ফেরকার নিজস্ব টেলিভিশনের চ্যানেল আছে এবং সেই টেলিভিশনের চ্যানেলে দ্বিবারাত্রি কাদিয়ানিদের মতবাদ প্রচার করা হয়। এমন একদিন হয়তো আসতে পারে যে, সুফিবাদে বিশ্বাসী পীর-ফকিরদের গাট্টিবোঁচকা হাতে নিয়ে বিদায় নিতে হবে অথবা নাকি কান্নায় ওহাবিদের কাছে আত্মসমর্পণ করে বর্ণচোরা পীর-ফকির সেজে থাকতে হবে। অধম লেখকের মনে হয়, আমার কথাগুলো তিষ্ঠ, কিছু অপ্রিয় সত্য। আহলে সুন্নাতুল জামাতের প্রখ্যাত এবং পরম শ্রদ্ধেয় সুফিবাদের ধারক ও বাহক মুফতি ইয়ার আহম্মদ খান নইমির উনিশ খণ্ডে উর্দু ভাষায় রচিত কোরান-এর তফসিরটি বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করলে ওহাবি মতবাদের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। আমরা আশা করবো বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই তফসিরটি অনুবাদ করবেন।

আদমের মাধ্যম ছাড়া যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না, সেরকমভাবে আল্লাহ সর্বশক্তিমান হবার পরও কোরান, ইঞ্জিল, জাবুর এবং তাওরাত পাঠাতে গিয়ে দুইটি মাধ্যম গ্রহণ করেছেন : একটি রুহল আমিন এবং অপরটি নবি। আমরা এই চারটি আসমানি কেতাব দুই-দুইটি মাধ্যমে পাই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তো অন্য যে কোনো প্রকারে তাঁর কলাম পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তিনি কেন জেনে- শুনে দুইটি মাধ্যম নিতে গেলেন? এখানেও তো বিরাট একটি রহস্য লুকিয়ে আছে। সৌদির বাদশাহ যদি হাজিদের বাঁধাই করা কলামপাক সোজাসুজি উপহার দিতে পারেন, তা হলে যিনি সমস্ত জগৎসমূহের বাদশাহর বাদশাহ, তিনি কি আমাদের হাতে তাঁর কলাম তুলে দিতে পারতেন না?

আজাজিলের ছয় কোটি বছরের এবাদতের সঙ্গে আমাদের এবাদতটি যেন মিলেমিশে একাকার না হয়ে যায়, সে দিকটা ভালো করে লক্ষ রাখতে হবে। আজাজিল মাধ্যম মানে নি। আর আমরাও যদি আজাজিলের মতো মাধ্যমটিকে অস্বীকার করি, তা হলে আমাদের এবাদতের পার্থক্যটি কোথায় রইল? আজাজিল খান্নাসরূপ ধারণ করে মানুষের ভিতর ঢুকবার অনুমতি পেয়েছিল, সেই খান্নাসটি কি সরাতে পেরেছি? না পারলে উভয়ের এবাদতের মাঝে মিল পাওয়াটাই স্বাভাবিক। আর তাই যদি হয়, তো যত আখেরি মোনাজাত, যত শানদার মোনাজাত, যত জালালি মোনাজাতই করা হোক না কেন, যেমনকার কপাল তেমনই থেকে যাবে। বদলাবার

লক্ষণটি যে দেখতে পাই না। কিছু ভীতু আহলে সুন্নাতুল জামাতের আলেমেরা রথও দেখতে চায়, আবার কলাও বেচতে চায়। যেন হাত বাড়ালেই অনেক মনগড়া বানোয়াট কথাবার্তার আবর্জনার স্তুপ দেখতে পাই। এই আবর্জনার স্তুপ সরাতে গিয়ে দু-চারটে ভুল করলেও ভালো, জেনেগুনে ভগ্নাঙ্গি করার চাইতে।

মক্কায় হজ্জ করতে গিয়ে আমরা যে তিনটি শয়তান দেখতে পাই, তা পাথর দিয়ে বানানো। তিন-তিনটি শয়তান তিন-তিনটি স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ স্থানে দাঁড়িয়ে-থাকা তিনটি শয়তানকে কঙ্কর ছুঁড়ে মারতেই হবে। কারণ হজ্জের কয়টি নিয়মের মাঝে এটাও একটি নিয়ম। কিন্তু আসলেই কি এই পাথর দিয়ে বানানো শয়তান তিনটি আসল শয়তান? নাকি প্রতীকী শয়তান? নাকি জাহেরি শয়তান? কারণ, কোরান মতে, শয়তান বাস করে কেবলমাত্র মানবের আর জিনের অন্তরে তথা দিলে। দিলের শয়তানটিকে কয়বার জীবনে পাথর ছুঁড়ে মারতে পেরেছি তা নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করুন। কারণ যে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে পারে না সে তো রহস্যরাজ্যে কোনোদিন প্রবেশ করতে পারে না। তা সে ডিগ্রিধারী যত বড় মাথার জ্ঞানী হোক না কেন। সাঁতার না জানলে যেমন অঁখে জলে ডুবে মরতে হয়, সে রকম সিনার এলেম হাসিল করতে না পারলে বারবার ভবনদীতে ডুবে মরতে হয়। যাকে পুনর্জন্ম, পুনরুত্থান, কেয়ামত অথবা যে নামেই বলা হোক না কেন। ইমামুল আউলিয়া বাবা বায়েজিদ বোস্তামি

মুরিদদেরকে উপদেশ দিতেন এই বলে যে, দেখো বাবা, মাথার জ্ঞান-গবেষণা যতদিন তোমার ভেতর থাকবে, ততদিন সিনার এলমের দর্শন পাবে না। কেবল পড়েই যাবে। আর যেদিন এলমে লাদুনি হাসিল করতে পারবে, সেদিন লেখাপড়া থাকবে না। কারণ তখন দর্শন লাভ করবে। তাই লেখাপড়ায় পণ্ডিত হতে পারবে, কিন্তু দর্শন পাবে না। আর যেদিন এলমে লাদুনি হাসিল করে দর্শন লাভ করবে, সেদিন শিশুর মতো বোকা বনে যাবে। হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি এলমে লাদুনি হাসিল করার পর আর কলমই ধরেন নি। অনেকটা মজ্জুবের, গালবাতে হালতে থাকতেন এবং শিশুর মতো ফ্যালফ্যাল করে কেবল চেয়ে থাকতেন। এহুইয়াউ উলুমুদ্দিন এবং কিমিয়ায়ে সাদাত ইমাম গাজ্জালির সাধনরাজ্যে গমন করার আগের রচনা। তাই কথায় বলে, কথার যেখানে শেষ, প্রেমের শুরুটা সেখান থেকেই। বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী নূরে হক গঞ্জে নূর নামক কেতাবে পুঁথির ভাষায় লিখেছেন :

শয়তান এলেম যে সাগর প্রবল

পৃথিবীর আলেমগণ এক বিকু জল ॥

কিন্তু সে (শয়তান) কাতর আছে এশকের বিদ্যায়।

আশেক মাস্তক ভেদ পাইবে কোথায় ॥

মাথার জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রচুর পড়াশুনা করতে হয় এবং প্রচুর জ্ঞান গবেষণা করতে হয় এই জ্ঞান গবেষণার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের

সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। এই জ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে মানুষ অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং মনে হয় এই এগিয়ে যাবার শেষ নাই। কিন্তু সিনার এলেন্স হাসিল করতে হলে নির্জন ধ্যানসাধনা ছাড়া সম্ভব হয় না। মাথার জ্ঞান চোখ খুলে অর্জন করতে হয়। অথচ সিনার এলেন্স হাসিল করতে হলে চোখ বুজে ধ্যানসাধনায় ডুবে থাকতে হয়। খুব কম করে হলেও মাত্র একটানা চার মাস। বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী নূরে হক গঞ্জে নূর নামক কেতাবে পুঁথির ভাষায় লিখে গেছেন :

ওস্তাদ শিখায় বিদ্যা নিরখিয়া দেখ।

মোর্শেদ কহেন বাপু চক্কু মূদে থেক ॥

চক্কু বন্ধ বিদ্যা এই খুলিলে কি হবে।

খোলা জন এই ভেদ কভু নাহি পাবে ॥

সুতরাং আবার বলছি তাদেরকেই যারা সুফিবাদে ডুব দিতে আগ্রহী : বুকে হাত রেখে বলুন তো! মক্কার ওই তিনটি পাথরের বানানো শয়তানগুলো কি আদৌ শয়তান? নাকি প্রতীকী শয়তান? জাহেরি শয়তান? যে-কাবা ঘরটিকে তোয়াফ করা হয়, উহা কি আদৌ কাবা? নাকি প্রতীকী কাবা? নাকি জাহেরি কাবা? আমরা কেবল কাবা ঘরটির উপাসনা করি না, বরং কাবা ঘরের যিনি মালিক সেই আল্লাহ্ রাক্বুল আল আম্বিনকে সেই ঘরে হাজির-নাজির জেনেই উপাসনা করি। আমরা যে প্রতীকী কাবার তোয়াফ করি, উহা কি আদৌ তোয়াফ? নাকি প্রতীকী তোয়াফ? নাকি জাহেরি

তোয়াফ? তাই তো বাবা শামসে তাব্রিজ, হাফিজ সিরাজি এবং বু-আলি শাহ কলন্দর বলেছেন, আপন পীর কাবাকে কেবলা করে তোয়াফ যেদিন করতে পারবে সেদিনই রহস্যলোকে ঢুকতে পারবে। প্রতীকী তিনটি শয়তান মক্কাতেই অবস্থান করে। সুতরাং কঙ্কর মারতে হলে সেখানেই যেতে হবে। আর যদি নিজের ভেতরের শয়তানটিকে কঙ্কর মারতে চাও তো যেখানে আছে, সেখানেই মারতে পারবে। একটি বিশেষ, অপরটি সার্বজনীন। একটি কেবল ধনীদেহের জন্য, অপরটি সবার জন্য। বাহির এবং ভেতর দুটোর মিলনের নামই ইসলাম। ভেতরটিকে বাদ দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ বিষয়টি তখন প্রাণহীন দেহের মতো হয়ে যায়। আবার দেহ নামক খোলসটিকে বাদ দিলে বিমূর্তে পরিণত হয়। মোমিনের হৃদয়ে আল্লাহর অবস্থান। তাই মোমিনের জন্য সুনিশ্চিত বিজয়, বলেছে কোরান। মাত্র হাতেগোনা তিনশত ষাটজন মোমিন : রাজা গৌরগোবিন্দ নিয়মিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ যুদ্ধ করে সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ করে আগুনের জ্বলন্ত শিখায় বাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। চারশতের কিছু বেশি মোমিন : পরশুরামের মতো প্রতাপশালী রাজা বহু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য নিয়ে শাহ সুলতান বলখিয়া রুমির মতো সাধকের কাছে পরাজয়বরণ করে আত্মহত্যা করেছিল। এ রকমভাবে বহু মোমিনের সুনিশ্চিত বিজয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো তুলে ধরা যায় : খাজা গরিবে নেওয়াজ, গেসু দেরাজ, খানজাহান আলী, আবুল হোসেন খেরকানি এবং নুর মোহাম্মদ

দারবন্দির মতো। মোমিনের জন্য সুনিশ্চিত বিজয়-কোরান-এর এই ঘোষণাটি সামনে থাকা সত্ত্বেও আজ কেন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে আর মারের পর মার খেয়ে চলছে মুসলমান? তা হলে কি আমরা মুসলমান হয়েছি? ইমান এনেছি? আলবাব তথা জ্বানী হয়েছি, কিন্তু মোমিন মুসলমান হতে পারি নি। যদি সত্যি মোমিন হতে পারতাম, তা হলে কোরান-এর কথা সত্য হতে বাধ্য। তা হলে আমরা সব রকম ফেরকাবাজি বাদ দিয়ে সব মুসলমান মিলে আমাদের ভুলগুলো কোথায় হচ্ছে তা মিলেমিশে করে বের করতে শিখব? ফেরকাবাজি করে করে আমাদের মগজ এমনভাবে ধোলাই করে ফেলেছি যে, একসঙ্গে বসার মন-মানসিকতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি।

বরিশালের পীরে কামেল শাহ সুফি বাবা শামসুদ্দিন দেওয়ানের একটি কবিতা পাঠকদের জন্য তুলে ধরলাম। কারণ তিনি প্রথমে শরিয়তের বিরাট আলেম ছিলেন এবং পরে তিনি গালবাতে হালতে থাকতেন। অনেকটা মজ্জুবের মতো। তিনি লিখেছেন, খোদার দিদার যদি চাও মন, ভজ আগে মুর্শিদের চরণ, মানুষ রতন কর যতন, চিনতে যদি চাও আপন। পীর-মোর্শেদ কেবলা কাবা, তার চরণে কর সেবা, অব-তাণ্ড উম্মিলা ধর, কর তার সাধন ভজন। জাহেরাতে মক্কা কাবা, হাকিকতে হয় মানুষ কাবা, বিশ্বাস কর মোরাকাবা-মোশাহেদায় হয় দর্শন। মোমিনের কলবে খোদা, দম থাকতে হবে না জুদা, যথা মোর্শেদ তথা খোদা, বিশ্বাস কর জিন-

এনছান। আগে তুমি মোর্শেদকে মানো, তারপরেতে নিজেকে চিনো, কোরান-হাদিস আমল কর, খোদা রয় গোপন। ছহি হাদিসে করে বয়ান, একজন খাঁটি মুসলমান মক্কা কাবা হইতে উত্তম, সদায় কর তাহার স্মরণ। অহংকারী দেমাক ছাড়ো, জায়গা চিনিয়া সেজদা করো, আগে নিয়ত ঠিক করিয়া লও, মানুষ ছাড়া খোদা নাই।

সুফিবাদের মূল এবং একমাত্র লক্ষ্যটি হলো এলম্মে লাদুনি হাসিল করা। এলম্মে লাদুনি কলবে থাকে, সিনায় থাকে। মাথায় থাকে না। মাথার জ্ঞানের মূল্য যদিও অনেক বেশি, তবে মাথার জ্ঞান দিয়ে এলম্মে লাদুনি হাসিল করা যায় না। মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটানো যায় মাথার জ্ঞান দিয়ে। পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে চলছে মাথার জ্ঞান। মাথার জ্ঞান দিয়েই বিজ্ঞানের অনেক রকম চমক দেখে চলছি এবং এই দেখার শেষ হতে পারে পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে গেলে। সুতরাং কোনো বিষয়েরই শেষ সিদ্ধান্তটি দেওয়া যায় না। তবে মাথার জ্ঞানটি অর্জন করা এলম্মে লাদুনি হাসিল করার চেয়ে অনেক সহজ। কারণ এ যুগে সব রকম সাধনপদ্ধতি জেনে একটানা নির্জন সাধনাটি করতে খুব কম লোকই এগিয়ে আসে। তার উপর এই নির্জন সাধনায় দুনিয়াবি চাকচিক্য পাওয়া তো দূরে থাক, বরং সব কিছুই হারাতে হয়। ধনসম্পদ উপার্জন, ক্রমতার কর্ণধার হওয়া, জাগতিক মানসম্মান অর্জন ইত্যাদিতে প্রায় সব মানুষই কমবেশি ভুবে যেতে চায়। তাই এলম্মে লাদুনি হাসিল করার সাধনাটি করতে চায় না। তবে অনেকে

রখণ্ড দেখতে চায়, আবার কলাণ্ড বেচতে চায়। এই প্রকার মানুষগুলো যখন সুফিবাদে আসে তখনই সুফিবাদে কমবেশি ডেজাল ঢুকতে শুরু করে দেয়। এই রকম মানুষগুলো সুফিবাদের দুয়ারে পায়খানা- পেশাব করে দেয়। সুফিবাদের শরীরে ধর্মীয় শাস্ত্রকথার এত জন্মকালো অলঙ্কার পরাতে থাকে যে, অবশেষে আসল সুফিবাদটি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন সুফিবাদের নামে নানা রকম ধর্মীয় শাস্ত্র কথার দোহাই দিতে দেখা যায়। এই সেদিন বাংলাদেশের এক বিখ্যাত ওলির মাজারে বাৎসরিক ওরসে আম্মাকে নিয়ে যাওয়া হলো। নামটি ইচ্ছে করেই গোপন রাখতে চাই। কারণ সুফিবাদের উপর সেই বিখ্যাত ওলির মহামূল্যবান কয়টি বই পড়েছিলাম। তিনি তাঁর রচিত একটি বইতে লিখেছেন যে, আম্মার পীর সাহেবের দরবারে সব সময় কাণ্ড্যালির সাম্মা মাহফিল হতো। ভালো ভালো কাণ্ড্যাল আসত। সেই কাণ্ড্যালি শুনে জুজ্বায়ে আত্মহারা হতাম। কখনও বেঁহশ হয়ে পড়তাম। সঙ্গীত যে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করতে এত প্রচণ্ড ভূমিকা রাখতে পারে তা যারা সঙ্গীত শোনে না অথবা নাজায়েজ বলে ফতোয়া দেয়, তারা মূল্যায়ন করতে পারবে না। কারণ ধর্মীয় শাস্ত্রজ্ঞান যে মাথার জ্ঞান হতে আগত। মাথার জ্ঞান দিয়ে মাওলানা হওয়া যায়, মোফাচ্ছেরে কোরান (কোরান ব্যাখ্যাকারী) হওয়া যায়, শায়খুল হাদিস হওয়া যায়, মুফতি হওয়া যায়, এজমা-কিয়াস-উসুলের বিরাট আলেম হওয়া যায়, ইসলামের ইতিহাস-জানা বিরাট পণ্ডিত হওয়া

যায়, কিন্তু এলম্নে লাদুনি, এলম্নে কাল্ব, এলম্নে মারেফত, এলম্নে আসরার হাসিল করা যায় না। কারণ এলম্নে লাদুনি যে মাথার জ্ঞান নয়, ইঁহা সিনার জ্ঞান। আর সিনার জ্ঞান হাসিল করতে হলে নির্জনবাসের মধ্য দিয়ে সাধনা করে অর্জন করতে হয়, যা মহানবি তাঁর নিজের জীবনে করে দেখিয়ে গেছেন। কারণ তৌহিদের শিক্ষাটি হলো, আগে নিজে মিষ্টি খাবার অভ্যাসটি পরিহার করতে শিখো, তারপর অপরকে উপদেশ দাও। অথচ শুনে অবাক হবেন বাংলার এই বিখ্যাত ওলি সম্ভবত আঠারো শত চুরানব্বই সালে দর্শন শাস্ত্রে এমএ পাস করেছেন। আম্মাকে যিনি নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বললেন যে, যদিও আম্মার পীর সাহেব কাওয়ালি শুনতেন, কিন্তু আম্মার ম্লোলা পীরভাইয়েরা কাওয়ালি নাজায়েজ ফতোয়া দিয়ে একদম বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি হেসে বললাম, এই বিজ্ঞানের যুগে এই ফতোয়াটিকে আর কতদিন টিকিয়ে রাখতে পারবেন? আপনাদের ঘরে জায়েজ, আর ওরসে নাজায়েজ! এই তো আপন পীরকে অনুসরণ করার চমৎকার নমুনা। অবশ্য বিজ্ঞানের দাপটে এই নমুনাটিও পদ্মার মাটি ভাঙার মতো বিজ্ঞানের পদ্মায় একদিন তলিয়ে যাবে।

আম্মরা অনেক সময় সিনার এলম্ন এবং মাথার এলম্নের বিরাট পার্থক্যটি করতে পারি না অথবা মনের অজান্তে দুটোকে এক করে ফেলি। অবশ্য এ রকম করাটা একদম স্বাভাবিক। কারণ যারা পার্থক্য করতে পারেন না তারাও তো মাথার এলম্ন অর্জন করেই পার্থক্য করেন। এটা একদম একটি

পরিষ্কার বিষয় যে, ইসলামের বিরাট ঐতিহাসিক, ইসলামিক স্টাডিজের আন্তর্জাতিক মানের অধ্যাপক তথা শিক্ষক, অনেক কোরান-তফসির জানা ঝানু মোফাচ্ছেরে কোরান (কোরান-ব্যাখ্যাদানকারী), অনেক হাদিস গ্রন্থ পড়ুয়া ঝানু শায়খুল হাদিস কেবলমাত্র মাথার জ্ঞানী। এদের মাথার জ্ঞানের লম্বা বহর দেখে মানুষ সিনার এলেম হাশিল করার আশা করে। অবশেষে কতগুলো সুন্দর সুন্দর পঁচামারা কথাই শেখে। সিনার এলেমের বিষয়টি না পেয়ে বাকি জীবনটা বোবা হতাশায় কাটিয়ে দেয়। মাথার এলেম যে সিনার এলেম হাশিল করার পথে বিরাট দেওয়াল হয়ে পড়ে, একথাটি মহানবি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন: আল-এলমুল হেজাবুল আকবর। অবশ্য মাথার জ্ঞানীরাও অনেক সময় পীর সেজে বসেন এবং পীরালি করেন এবং মাথার জ্ঞানীরা এদেরকে পীর হিসেবে লুফে নেন এবং মুরিদ হন। কারণ তারা মাথার জ্ঞানে উচ্চ শিক্ষিত, বাকপটু এবং কথার নিখুঁত মারপঁচ জানা ঝানু ওস্তাদ। আর যারা যান তারাও মাথার জ্ঞানে শিক্ষিত। সুতরাং খাপে খাপে মিলে যায় এবং মুরিদ হয়ে যান। এই জাতীয় পীরেরা এবং মুরিদেরা সুফিবাদটিকে গোলকধাঁধা দিয়ে দুর্বল করে ফেলেন। আর পীর সাহেব মাথার জ্ঞানী, না সিনার জ্ঞানী, এটা পার্থক্য করাটাও সহজ কথা নয়। এখানেই তকদিরটি দাঁড়িয়ে থাকে। আপনি যেমনটি চান, সে রকমই তো পাবেন। তাই তো মহানবি বলেছেন, তোমার হৃদয়-পেয়ালায় যে রকম পানি আছে, সে রকমটাই তো ঢালতে পারবে। আর যেহেতু

বেশিরভাগ মানুষ শক্তির পূজারি তাই ঝক্‌ঝক্‌টাই বেশি পছন্দ করেন এবং মুরিদের সংখ্যা দিয়ে পীর যাচাই করেন। সাধক-ভক্তদের এসব বিষয়গুলি নাক-কান খাড়া করে দেখে নেবার ধৈর্য ধারণ করতে হয়। আমার এক বন্ধু ঝানু মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় মুরিদ হয়েছেন? বন্ধু বললেন, বিরাট মুফতি-এ-আজমের (নামটি গোপন করতে হলো) কাছে মুরিদ হয়েছি। বললেন, এত এলিমের দরিয়া যে চমকে যাবেন। বন্ধুটিকে কিছুই বললাম না এ জন্যে যে, তিনি মাথার এলিম আর সিনার এলিমের পার্থক্য করার বিষয়টিতে একদম অজ্ঞ। বাংলাদেশের আবদুহ বাবা সোলায়মান শাহ লেংটা যে সিনার এলিমের সমুদ্র একথাটি কেমন করে বুঝাব? আর বুঝাতে গেলেও যে বুঝতে পারবেন তা মনে হলো না বলে ‘বেশ ভালো’ বলে চুপ করে রইলাম। মাছ যেমন কারেন্ট জাল দেখতে না পেয়ে আটকে যায় সে রকম অনেকেই সিনার জ্ঞানী মনে করে মাথার জ্ঞানীর ফাঁদে আটকে যায়। এখানেও তকদির। তকদিরের লিখনটি খণ্ডাবার বিধান অধম লিখকের জ্ঞান নাহি। আমার আর এক বন্ধু হাজি। বার চারেক হজ করেছেন। বললেন, হজ করতে গিয়ে তিন শয়তানকে ইচ্ছামত কব্বর মেরেছি। তাতেও মনে শান্তি না পেয়ে পায়ের জুতো দুটো ছুঁড়ে মেরেছি। বললাম, দামি জুতো দুটো ছুঁড়ে মারলেন? বললেন, আমারটা তো সামান্য, কত হাজিরা দামি দামি জুতো ছুঁড়ে মারছে! জুতার চিবি হয়ে যায়। আবার হড়োহড়িতে চাপা পড়ে কত হাজি মারা গিয়ে সোজা জান্নাতে চলে যায়।

বন্ধু আরও বললেন, তিনটি শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মেরে অনাবিল শাস্তি পেলাম। আমি আসল আর প্রতীকী শয়তানের বয়ানটি করতে গেলাম না। কারণ বন্ধুর মনের বাজারে বিক্রি নাও হতে পারে। মনে মনে ভাবলাম, হায় আল্লাহ! তকদিরের গায়ে কত চমক।

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি প্রথমে শামসে তাব্রিজকে মাথার এলেন দিয়ে যাচাই করতে গিয়ে নিজের ভুলটি বুঝতে পেরে মুরিদ হয়েছিলেন। যখন সিনার এলেন যে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন বিষয় বলে পরিষ্কার ধারণা করতে পারলেন, তখনই পীরের দেওয়া সাধনায় ডুব দিলেন। সিনার এলেনের রহস্যটি বুঝবার পরই তিনি মসনবি শরিফ রচনা করলেন। চুয়াল্লিশ হাজার আটশত ঊনত্রিশ পঙক্তির বিরাট গ্রন্থ মসনবি। মানুষের রচিত ফারসি ভাষার কোরান বলে ঘোষণা দিলেন এবং বললেন যে, কোরান-এর মূল বিষয়টি তুলে নিয়ে শুকনো হাড়গুলো কুকুরদের জন্য রেখে দিলাম। রুমির ফারসি ভাষায় বর্ণনাটি হুবহু তুলে দিলাম, মান আজ কোরআন মাজারা বরদাস্তাম, এসতে খাওয়া পেশে সাঁগে আন্দাখতাম। ‘আমি কোরানের মগজ বাহির করে নিয়েছি আর কুকুরদের জন্য হাড়িগুলো ফেলে রেখেছি।’ মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি অন্যত্র সিনার এলেনের গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলেছেন, হুদ কিতাবো হুদ ওয়ারাক দর নারে কুন, সিনারা আজ নুরে হক গোলজারে কুন। অর্থাৎ ‘শত কেতাব এবং শত পৃষ্ঠা আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করো। তোমার সিনাকে (পীরের ধ্যান দ্বারা) সত্য নুর দিয়ে

ফুল বাগানে পরিণত করো।' মাগুলানা রুমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, পীরের গোলামি না করলে সিনার এলেন্ন হাসিল করা সম্ভব নয়। কারণ সিনার এলেন্নের রহস্যটি আজাজিলের জানা ছিল না। আজাজিল মাথার এলেন্নের ঝানু মহাপণ্ডিত। আর মাথার এলেন্নে থাকে প্রতিযোগিতা, অহংকার করা গাধার চিৎকার, আর হিংসার কুটনীতির বিষমাখা মার্জিত ভাষা। এর ছোবলে বিবেকের প্রায় মৃত্যু ঘটে। আবার বৈষয়িক মানবসভ্যতারও জনক হলো মাথার জ্ঞান, দেহ আর মনটি মাথার জ্ঞান অর্জন করাটাকেই একমাত্র জ্ঞান বলে মনে করে। এই মনে করাটাই মারাত্মক ভুল। অবশ্য সবার চোখে ধরা পড়ার কথা নয়। যাদের কাছে কিছুটা হলেও ধরা পড়ে তারা কমবেশি সিনার এলেন্ন বিষয়টি নিয়ে ভাবে। তারপর কিছু লোক সুফিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাই রুমির মসনবির নিরপেক্ষ অনুবাদটি খুবই প্রয়োজন। সাইনবোর্ডের চাপটি ফেলে মসনবি-র অনুবাদটি আজও করা হয় নি। দু-একটা যাও বাজারে পাওয়া যায়, তাও সাইনবোর্ডের উগ্র গন্ধে নিজেদের কথা ঢুকিয়ে দেবার দরুন আসল বিষয়টিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে আমাদের জন্য সুফিবাদের ধারণাটি অর্জন করার জন্য বাংলার রুমি বাউলসম্রাট বাবা লালন ফকিরই যথেষ্ট মনে করি। লালনের পীর সাহেব বাবা সিরাজ সাইও নিরাকর ছিলেন। লালন নিরাকর ছিলেন বলেই তাঁর অনেক মূল্যবান গান হারিয়ে গেছে। একটা ভাষা শেখা, আর জ্ঞান অর্জন করা মোটেই এক বিষয় নয়,

তা সেই জ্ঞানটি মাথারই হোক আর সিনারই হোক। যে কোরান লাগছে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে সেটা কোনো ভাষার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যুৎ তথা ইলেকট্রিসিটির কোনো নিজস্ব রং নাই। যে- বাস্তবের রংটি যেমন, প্রকাশটিও সে রকম। প্রকাশটি বাস্তবের বিভিন্ন রং-এর কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেখায়, কিন্তু বিদ্যুৎ মূলে এক। ডাল ভাঙার পাথুরে যাঁতাকলের কেন্দ্রে একটি ডালও ভাঙবে না। ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু তথা ঝড়ের চোখটিতে কখনোই ঝড় থাকে না। এ জন্যই কেন্দ্রে অবস্থানকারীর গুরু ধরতে হয় না। নবির কেন্দ্রে অবস্থান করেন বলে তাঁদের গুরু ধরতে হয় না। কেন্দ্রের মাধ্যমটি কেন্দ্রই। সুতরাং গুরুর প্রয়োজন নাই। কেন্দ্রের বাহিরে যারা, আঘাতটি শুধুমাত্র তাদেরই খেতে হয়। যারা আঘাতে জর্জরিত, তাদেরকেই গুরু ধরতে হয়। গুরু ছাড়া গতি ও পথ পাওয়া যায় না। সুতরাং গুরু ভক্তরা এই কথাগুলো লুফে নেবে। আবার গুরু যারা মানে না তারাই এই কথাগুলোকে বিষ বলে প্রতিবাদ করবে। তকদিরের কী অপূর্ব দ্বন্দ্বিক দর্শনের আলো-আঁধারি খেলা। যদি ধরে নেই যে, আদম গন্ধম খেলো না; আবার যদি ধরে নেই, আজাজিল আদমকে সেজদা করল। তা হলে কী অবস্থাটি দাঁড়াত? দর্শনের শেষ কথাটি যখন লাল শালু কাপড় পরে বাউল দোতারায় গেয়ে ওঠে, যেমনে নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কী দোষ? তখন চমকে উঠি! অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। ভাবি নি এত দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে অবশেষে দর্শনের শেষ কথাটি বাউলের ঠোঁটে পাব। এই সহজ-সরল

কাঁচাগলা মোমের মতো লাল শালু কাপড় পরা, হাতের দোটারায় সুরের ঝংকার তুলে যখন এই কথাগুলো গাইতে থাকে, তখন কি সেই বাউল জানতে পারে যে, এই দর্শন পবিত্র কোরান-এর সূরা নজমের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতটির ভাবার্থ গেয়ে চলছে। প্রতিযোগিতার জ্ঞানটি যে মাথায় আছে, তাই ছোট-বড় করার পার্থক্যটি শিখেছি। শক্তির পূজা করতে শিখেছি, তাই প্রেমের পূজা আঘাত দিলে টেকে না। কারণ স্থায়িত্বটা খুবই হালকা, একদম নড়বড়ে।

পীর কী এবং পীর ধরা কেন প্রয়োজন

একটা কথা পরিষ্কার করে বলে রাখা ভালো, তা না করলে সাধক ভক্তরা (সাধারণ ভক্তরা নয়) বিষয়টি পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারবে না। আর সেই বিষয়টি হলো এই যে, পীর ধরো। গুরুর ভক্ত হও। কথাগুলো বারবার বলছি। সেই পীরের অবস্থানটি কী এবং কতদিন পীরকে ধরে রাখতে হবে? পীরের অবস্থানটি সাময়িক তথা কিছুদিনের জন্য? প্রশ্ন আসতে পারে যে, পীর কতদিন মুরিদের সঙ্গে থাকবেন? পীর মাত্র তিনটি মোকাম তথা তিনটি ঘর পর্যন্ত থাকবেন। সেই তিনটি মোকাম তথা ঘরগুলোর নাম হলো, মোকামে নাসুত, মোকামে মালাকুত এবং মোকামে জাবরুত। সাধক মুরিদ যখন ধ্যানসাধনার দ্বারা এই তিনটি মোকাম অতিক্রম করতে পারবে তখন সে লাহত মোকামে অবস্থান করবে। লাহত মোকামে পা রাখার সঙ্গে

সঙ্গে ডান দিক দিয়ে আপন পীর হারিয়ে যাবেন আর বাম দিক দিয়ে খান্নাসরুপী শয়তান পালিয়ে যাবে। সাধক মুরিদ লাহত মোকাম্মে গিয়ে দেখতে পান যে, তাঁর পীরও তিনি এবং তাঁর মুরিদও তিনি। এক ছাড়া দুই দেখার অবসান হয় লাহত মোকাম্মে। এই মোকাম্মে আঁকা তথা প্রভুও থাকেন না, গোলামও থাকে না। এখানে কেবলমাত্র ‘আনা’ তথা আমিটি থাকে। তাই বাবা জ্ঞানশরীফ শাহ সুরেশ্বরী এই মোকাম্মে ঢুকে আর তাঁর পীর বাবা ফতেহ আলি শাহকে না দেখে নিজেকেই লাহতের আয়নায দেখার কথাটি ঘোষণা করছেন। বহু ওলি এই কথাটি বলেছেন, তবে বিভিন্ন ভাষার স্টাইলে। সুতরাং আপন পীরের অবস্থানটি কেবলমাত্র তিনটি মোকাম্ম পর্যন্ত। সুতরাং পীরের মুরিদ হওয়াটা আপেক্ষিক তথা কিছুদিনের জন্য। মোটেই সার্বজনীন নয় তথা সব সময়ের জন্য নয়। অনেকেই মনে করেন যে, আপন পীরকে সারাটি জীবন গলার কান্দা বানিয়ে রাখতে হবে। তবে সাধারণ মুরিদকে তা-ই করতে হবে। কারণ সাধনার কোনো ধার সে ধারতে চায় না। আমরা এই কথায় অনেকে হয়তো চমকে যাবেন। কিন্তু যতই চমকান না কেন, যে কথাটি বললাম ইহা অপ্রিয় এবং তিক্ত সত্য কথাটি বললাম। সাধক মুরিদ যখন মোকাম্মে লাহতে ঢুকবেন, তখনই আমার কথাগুলো যে বর্ণে বর্ণে সত্য কথা সেটা বুঝতে পারবেন। এর আগে সংশয়, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি মনের মাঝে উঁকিঝুঁকি মারবে। শক্তির পূজা করাটা প্রতিটি মানুষের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। সাধকের চৈতন্য বিষয়টি

যখন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় তখনই বুঝতে পারে এবং মনে মনে লজ্জা পায়। কারণ শক্তির পূজারক দুনিয়াতে কিছু পেতে চায়, আর প্রেমের পূজারিকে অনেক কিছু স্বেচ্ছায় হারাতে হয়। শক্তির পূজারকের অনেক রকম কন্ডিশন (শর্ত) থাকে, কিন্তু প্রেমের পূজারির কোনো কন্ডিশন তথা শর্ত থাকে না। প্রেমের পূজারি যত সামনে এগিয়ে যেতে থাকে বৈষয়িক মোহ-মায়ার জাল ততই ছিন্ন হতে থাকে। মুরিদেরা যদি গুরুকে বৈষয়িক ঠমকের চমকানো ধনরত্নে সুশোভিত করে, তো সমাজ দেখতে পায়। না হলে সবার অজান্তে প্রেম সুবাস ছড়িয়ে হারিয়ে যায়। আপন পীরকে সমাজের বুকে তুলে ধরার দায়িত্বটি মুরিদের এবং মুরিদেরা প্রাণপণ চেষ্টা কমবেশি করে যান। বহু মজ্জুব ওলিকে ভক্তরা সমাজের কাছে তুলে ধরতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন এবং করেন। হয়তো এ উদাহরণটি না তুললেও সবাই কমবেশি বুঝতে পারেন। অনেক মজ্জুব ওলি জীবনে একটিও মুরিদ করে যান নি, কিন্তু ভক্তরা অপূর্ব সাজে তাঁর মাজারটি সাজিয়েছেন এবং প্রতিবছর দু-একবার গুরুর আয়োজনটি বেশ ধুমধাম করেই করে যাচ্ছে। যারা আজাজিলের মতো আদমের মাধ্যমটিকে অস্বীকার করে, এ রকম কর্মকাণ্ডে তাদের গান্ধাহ শুরু হয়ে যায় এবং সমাজটিকে নানা প্রকার দোহাই ও ভুয়া দলিল দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিছু বিভ্রান্ত হয় এবং আজাজিলের মতো মাধ্যমটিকে অস্বীকার করে মনের অজান্তে ওহাবিতে

পরিণত হয়। কেয়ামতের কর্মফল যে ভোগ করতেই হবে, কারণ কেয়ামত নির্দিষ্ট তকদিরটি দিয়ে ধরাধামে পাঠিয়ে দেয়।

আমরা একটি বিষয়ে বিরাট ভুল করে বসি আর সেটা হলো, বিজ্ঞান ও এলম্মে লাদুনিকে এক করে ফেলি। মনে করি দুটো একই বিষয়। কিন্তু আসলে দুটো বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। কোরান অনেকবার একথাটি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেবার পরও ভুলটি করে বসি। সূরা বাকারার একশত চৌষটি নম্বর আয়াতটি ভালো করে বারবার পড়ে দেখুন তো! দেখতে পাবেন প্রতিটি বিষয়কে আলাদা করে দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে জ্ঞানীদের জন্য নির্দর্শন রয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়টিকে অনেক ভাগে ভাগ করা যায়। প্রতিটি ভাগের জ্ঞান অর্জন করাটা বিশেষ জ্ঞানীর প্রয়োজন। চিকিৎসাবিজ্ঞান একটি বিষয়, আবার চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। প্রতিটি শাখাপ্রশাখার জন্য রয়েছে বিশেষ জ্ঞানী। এরকমভাবে দুনিয়াতে কত যে বিষয় আছে আর আছে সেই বিষয়টির শাখাপ্রশাখা। প্রতিটি বিভাগের জন্য রয়েছে বিশেষ জ্ঞানী। এত কিছু জানবার পরও আমরা এলম্মে লাদুনির সঙ্গে বিজ্ঞানের হাজারও বিষয়ে হাজারও শাখাপ্রশাখার বিভাগগুলোকে এক করে ফেলি। এটা যে একটা মারাত্মক ভুল করা হচ্ছে, তা আমরা ইচ্ছা করেই বুঝতে চাই না। এলম্মে লাদুনির কাছে আমরা কৃষিবিজ্ঞান বিষয়টি জানতে চাই। আমরা জানতে চাই খেজুর গাছের ফলন কেমন করে বেশি ফলানো যায়। এটা এলম্মে

লাদুনির বিষয় নয়। হারুত-মারুত, লবিদ আর ডেভিড কপার ফিল্ডের জাদুবিদ্যাটি এলম্বে লাদুনির বিষয় নয়। তবু আমরা জানতে চাই। এ জন্যই ‘ফালাক’ আর ‘নাস’ নামে আল্লাহ্ কালাম পাঠান। তবুও চাই। তাই শুরু হয়ে যায় সুফিবাদের নামে খনকারি, তাবিজ লিখা এবং আরও এটা-সেটা। এদের দেওয়া চুন খেয়ে ভয়ে অনেকের সুফিবাদের উপর বিশ্বাসটি হালকা হতে শুরু করে। আফ্রিকার রাস্কুসে মাপ্তর মাছকে মরাপচা খেতে দেখে ঘৃণায় শরীরটা রি রি করে ওঠে। তারপর দেশি মাপ্তর মাছ জানা সত্ত্বেও আর খেতে পারে না। রুচিতে বিশ্রী স্থিতিটা ভেসে ওঠে। কারণ রুচির সবুজ সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ কোনো কিছুই খেতে চায় না। এলম্বে লাদুনি যিনি হাসিল করেছেন তার কাছে জানতে চাই, পৃথিবী হতে সূর্য কত দূরে। জানতে চাই, সাগরে লবণ এলো কেমন করে। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘোরে, না পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘোরে। ভূমিকম্প হয় কেমন করে। মেঘ-বৃষ্টি হয় কেমন করে। ইত্যাদি। এগুলো যে সুফিবাদের বিষয় মোটেই নয়, তা আমরা ভাবতে চাই না।

তা ছাড়া সিনার এলম্বে খুবই সহজ-সরল। অনেকটা শিশুর মতো। তাহাতে কোনো প্রকার প্যাঁচঘোচ থাকে না। তবে তাকিয়া অবশ্যই থাকে এবং থাকবে। তাই ইসা নবি বলতেন যে, শিশুর মতো না হলে আল্লাহ্ বেহেশতে প্রবেশ করতে দেবে না। অথচ মাথার জ্ঞানীরা যতই মার্জিত ভদ্র হোক না কেন, প্রতিযোগিতার কিছু না কিছু তাহাদের মধ্যে থাকবেই। অহংকার

কিছু না কিছু থাকবেই। সুতরাং শয়তান খান্নাসরূপ ধারণ করে কমবেশি অবস্থান করবেই। তাই বলছি, মানব সভ্যতার জাগতিক রূপটি যা দেখতে পাই তা শয়তানের অবদান। আমাদের এই কথায় কিছু লোক চমকে উঠবেন। কিন্তু গভীরে গিয়ে ভেবে দেখুন তো, কথাগুলো বর্ণে বর্ণে সত্য কি-না? পৃথিবীটাকে কত রূপে সাজিয়ে তোলার প্রতিযোগিতা, কত কিছু অবাক করা আবিষ্কার, কত দুর্গম পথে জীবন বাজি রেখে অগ্নিসর হবার অদম্য অভিলাষ। যেমন সব কিছু ছুটে চলছে সামনের দিকে। কোথায় এর শেষ, দেখার প্রবল স্পৃহা। নিজে শেষ হয়ে যায়, আকাঙ্ক্ষাটি দাঁড়িয়ে হাসে। ভবের নাটক এভাবেই চলবে। তবে এটা সত্য যে, একমাত্র বিজ্ঞান বিষয়টির গবেষণার কোনো শেষ নাই। বিজ্ঞান রিপোর্ট (বারবার একই বিষয়) জানে না। রিপোর্টেশন বিজ্ঞানের ধর্ম নয়। ছুটে চলাটাই বিজ্ঞানের ধর্ম। যেমন আল্লাহ্ নিজেই জুল জালাল বলেছেন, জুল জালাল কথাটি অপূর্ব। জুলজালাল-এর অর্থটি হলো, এক সেকেন্ডে পৃথিবীতে কোটি কোটি যে রূপটি ফুটে ওঠে তা আর পরের সেকেন্ডে কোনোদিন দেখানো হয় না। নতুন নতুন রূপ, শৈলী, পরিবর্তন আর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ছুটে চলছে। অথচ দুনিয়ার ইতিহাস মাত্র ষোল পৃষ্ঠায় লিখা যায় বললে অনেক বলা হয়। দুনিয়ার অর্থনীতি রাজনীতিগুলো মাত্র আট পৃষ্ঠায় লিখা যায় বললে অনেক বেশি বলা হয়। কথাগুলো যে কতখানি অপ্রিয় সত্য কথা এটা ভাবুকেরাই বুঝতে পারে। ফিল্ম তৈরি করার হাভেগোনা কয়টি ছক থাকে।

এই ছকের বাহিরে ফিল্ম বানানো সম্ভব নয়। সংগীতের হাতেগোনা কয়েকটি মাত্রা থাকে। এই মাত্রার বাইরে সংগীত থাকতে পারে না। ভাষা শেখার হাতেগোনা কিছু অক্ষর বা বর্ণ থাকে। সেই অক্ষর বা বর্ণগুলো বাদ দিয়ে সেই ভাষাটি কখনও চিন্তা করা যায় না। হাসি-কান্না দুটো শব্দেই চাওয়া-পাওয়ার কথাটি ফুটে ওঠে। তারপর? স্ট্যাম্প সাইজের ছোট ছবিটাকে আমরা বড় করতে থাকি, কলমের খোঁচায়, ভাষার জাদুতে ছবিটাকে বড় হতে বিরাট এবং বিরাট হতে বিশাল করে ফেলি। গ্লাসের জল, কলসের জল, পুকুরের জল, খালের জল, নদীর জল, তারপর সাগরের জল। ছোট হতে একটু বড়, তারপর বিরাট হতে বিশাল। আল্লাহ রুহ-রূপে (নফস-রূপে নয়) প্রতিটি মানুষ ও জিনের ভেতর অণুরূপে বিরাজ করছেন, এই অণুরূপকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন। এই জাগিয়ে তোলার নামই এবাদত। বাকিগুলো খোলস। জাগিয়ে তুলতে পারলেই সে দেখে যে, সাড়ে তিন হাত সীমাবদ্ধ দেহটির মাঝে যা আছে ঐ বিশাল সাগরেও তাই আছে। ‘সোহহং সোহম্মি’ এবং ‘আনাল হক’ এ শব্দগুলো তখন সাড়ে তিন হাত দেহের মধ্য হতে বেরিয়ে আসে। যাদের দেহগুলোকে অন্ধকার দিয়ে ঢাকা আছে, যাদের দেহগুলো আচার-অনুষ্ঠানের লেবাসে ঢেকে আছে, যাদের দেহগুলো মন্ব-তন্ব, যপবাণীতে ঠাসাঠাসি করেছে তারাই “আনাল হক” শব্দটিকে বরণ করে নিতে পারে না। বরং বিদ্রোহ করে। ঘৃণায় শ্লেষ ছড়িয়ে দেয়। নির্গম ফতোয়ায় নির্গম শাস্তি চায়। তাই তো শূলে চড়েও মহাপুরুষ

কুমার বাণীটি শোনায। বলেন, এরা কী করছে তা নিজেরাও জানে না। বলেন, কন্যা, মানুষরূপী অসুরেরা কোনোদিন কোনো কালে দেবতাকে গ্রহণ করে না, তাই চলে যাচ্ছি। ঘোর বজ্রের পূজারিরা বজ্রকেই সব কিছু মনে করে আর নিজেকে মনে মনে বিরাট জ্ঞানী মনে করে চাপা অহংকারের খুশবু কাঁঠালি টাঙ্গা ফুলের মতো লুকিয়ে রেখে সুফিবাদের উপর রচিত বইগুলোকে দেখে হিহি করে হাসে এবং অন্যকে হাসাতে চেষ্টা করে। যারা শক্তির পূজারি (পূজারি শব্দটি ফারসি শব্দ, হিন্দি নয়) তারা হাসির সহযোগী হয়ে যায়। সরল-সহজ কাঁচাগলা মোমের মতো লাল শালু কাপড় পরে দোতারে হাতে যখন গেয়ে ওঠে, তুমি যেমননি নাচাও তেমননি নাচি তখন এত দর্শনবিদ্যা একদম বেকার রপ্ত করেছে বলে মনে হয়। আর মনে হয় সূরা নজমের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতটি ঐ সরল বাউলের জানা ছিল না।

অনুষ্ঠান কখনও ধর্ম নহে

প্রতীকী বিষয় দেখানো যায়। অনুষ্ঠানটিকেই প্রতীকী বলে। অণুপরিমাণ আসল বিষয়টি থাকে বলেই অনুষ্ঠান বলা হয়। আসল বিষয়টি অনুষ্ঠানের অনেক গভীরে থাকে তাই অনুষ্ঠান আসলের আসল রূপটি ধরতে পারে না, ব্যাখ্যা করা বা দেওয়া তো অনেক দূরের কথা। যেমন, মক্কার তিনটি পাথরের বানানো শয়তান হলো প্রতীকী শয়তান। অনুষ্ঠানের শয়তান।

অনুষ্ঠানের শয়তান তিনটিকে অনুষ্ঠানের পাথর দ্বারা যায়। আপন দেহের মাঝে যে শয়তানটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে তাকে পাথর দ্বারা কেমনে? আমরা জানি, ঐ তিনটি শয়তান হলো অনুষ্ঠানের শয়তান। কিন্তু আপন দেহে বাস করা শয়তানটি তো মোটেই অনুষ্ঠানের শয়তান নয়। তা হলে দেহে বাস করা শয়তানটিকে কোন ধরনের পাথর ছুঁড়ে দ্বারা? এ রকম শিক্ষা যিনি দেবেন, তাকেই গুরু বলা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনার গুরুটিকে আসল গুরু মনে করে আমরা অনেকেই বিরাট ভুল করে ফেলি। অনুষ্ঠানের গুরু কেতাদুরস্ত। মুখে খই ফোটে। মনে হয় কত কিছু জানে, আসলে কিছুই জানে না। অনুষ্ঠানের গুরুর কাছে কথার বাক্য পাওয়া যায়। রশিকে (দড়ি) সাপ মনে করে বারবার হাতে নিয়ে ভুল করি। মন্টার তিনটি শয়তানকে যেমন প্রতীকী শয়তান, অনুষ্ঠানের শয়তান বলে জানি, সে রকম মন্টার কাবা ঘরটিও প্রতীকী কাবা, অনুষ্ঠানের কাবা। কাবা হলো মোমিনের (আম্মানুর নয়) কাল্ব। সুতরাং প্রতীকী কাবার তোয়াফটিও প্রতীকী। ভেতরের কাবার তোয়াফটিও ভেতরের বিষয়। সুতরাং প্রতিটি বিষয়ের দুটো দিক থাকে : একটি প্রতীকী, অপরটি ভেতরের। একটি অনুষ্ঠান, অপরটি অভ্যন্তরীণ। একটি দেখা যায়, অপরটি দেখা যায় না। একটি মূর্ত, অপরটি বিমূর্ত। প্রথমটি চোখে ধরা পড়ে, কিন্তু পরেরটি ধরা পড়ে না। প্রথমটি হাত বাড়িয়ে লুফে নিতে পারি, অপরটির মাথামুণ্ডু বুঝতে কষ্ট হয়। আসলে যে কোনো বিষয়ের ভেতরটি ধরতে ও বুঝতে কষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি সবচাইতে তাড়াতাড়ি ইফতার করতে পারেন সেই ব্যক্তিটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এই কথাটির দ্বারা প্রতীকী ইফতার তথা আনুষ্ঠানিক ইফতারটিকে মোটেই বোঝানো হয় নি এবং কোনো অবস্থাতেই গোঁজামিল দিয়েও বোঝানো যায় না এবং যাবে না। তা হলে এই ইফতারের রহস্যটি কী? তা হলে এই ইফতার বলতে কোন ইফতারটিকে বোঝানো হয়েছে? আজানের সঙ্গে সঙ্গে হালকা পানীয় গ্রহণের ইফতারটিকে এই ইফতারের সঙ্গে তুলনাই করা যায় না। আর আজানের সঙ্গে সঙ্গে খানা তৈরি করে রেডি থাকলেই কি প্রিয় বান্দা হয়ে যায়? আজানের সঙ্গে সঙ্গে খানা খাইলেই কি প্রিয় বান্দা হওয়া যায়? তা হলে তো অলিম্পিকের দৌড় প্রতিযোগিতার মতো কান খাড়া করে থাকতে হয়। আসলে প্রতীকী ইফতারটির মাধ্যমে আসল ইফতারটি বুঝতে হবে। একটি না থাকলে অপরটি বোঝা যায় না। এ জন্যই ইফতার, রোজা, নামাজ, হজ্জ, জাকাত, কোরবানি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ের দুইটি দিক থাকে : একটি জাহেরি, অপরটি বাতেনি। জাহেরিটিকে ভালো করে বুঝতে পারলেই বাতেনিটি ধরা পড়ে যায়। ইফতারের মতো চোখে না পড়ার বিষয়টিতেও যে বাতেনি ইফতারটি লুকিয়ে আছে মহানবির এই হাদিসটি আমাদের চোখ দুটো খুলে দেয়। যদি বাতেনি ইফতারটির কথা মহানবির হাদিসে পাওয়া না যেত, তা হলে আমরা বুঝতেই পারতাম না যে, ইফতারের মতো বিষয়টিতেও বাতেনি ইফতার বলে কিছু থাকতে পারে।

অধম লিখক এই হাদিসটি জ্ঞানবার আগেই খাজা বাবার রচিত মাকতুবাতে হতে বাতেনি ইফতারের বিষয়টি পড়েছিলাম। খাজা বাবা তাঁর মুরিদ ও খলিফা বাবা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকিকে উপদেশের ভাষায় বলছেন যে, বাবা কুতুব উদ্দিন, প্রথমে ইফতার করতে শেখার আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাও তারপর দেখতে পাবে রোজা এবং তারপর তো রোজাই রোজা। এখানে রোজা বলতে একটি বিশেষ সময়ের জন্য পানাহার হতে বিরত থাকতে হয়। সে রকম আসল রোজাটি হাসিল করতে পারলে দুনিয়ার সর্বপ্রকার লোভ-মোহ হতে মুক্তি লাভ করা যায়। রোজার জাহেরি এবং বাতেনি বিষয়গুলো কোরান এবং হাদিসের দলিল দিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন বাংলার বিখ্যাত ইসলাম গবেষক এবং সুফিসাধক হজরত সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি তাঁর রচিত সিয়াম দর্শন নামক বইটিতে। এই সিয়াম দর্শন বইটি ধর্মীয় গবেষকদের পড়া উচিত বলে মনে করতে চাই। কারণ তিনি ইফতার ও রোজার বিষয়টি কোরান এবং হাদিস হতে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ ফুটিয়ে তুলেছেন। কোরবানির বিষয়টিও একই রকম। পশু কোরবানি এবং আম্বিত্তের কোরবানি। পশু কোরবানির মধ্য দিয়েই আম্বিত্তের কোরবানিটি যে আসল এবং মূল কোরবানি, ইহা পরিষ্কার বোঝা যায়। তাই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। পশু কোরবানির মতো যদি কোনো অনুষ্ঠান না থাকত, তাহলে আম্বিত্তের কোরবানি করার বিষয়টি হয়ে পড়ত সম্পূর্ণ বিমূর্ত। কোরবানির

বিষয়টিকোরান-হাদিসের দলিলসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ লিখেছেন বাংলার বিখ্যাত ইসলাম গবেষক হজরত শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি। বইটির নাম কোরবানী।

ইমান বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত লিখা যায়। তবে অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে, গবেষকগণ ইমানকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। ইসলাম গবেষকদের মধ্যে কেউ তিন ভাগ, কেউ দুই ভাগ, কেউ কোনো ভাগ না করে একটি বলেছেন। অবশ্য ইমানের মূল বিষয়টিতে প্রায় গবেষক ঐকমত পোষণ করেছেন। যে ইমানে আল্লাহর দিদার লাভ করা হয়েছে সেটাই আসল ইমান। এই রকম ইমান চলে যাবার বা বরবাদ হবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ দর্শনের পর আর অবিশ্বাস আসে কী করে? অনুমানের বিশ্বাসে তথা অনুমানের ইমানে অবিশ্বাস থাকাটা স্বাভাবিক। যদি বলে এ বিশ্বাসটি আসতে পারে, তা হলে দর্শনের ইমানটি হয় নি, বরং অনুমানের ইমান হয়েছে। অনুমানের ইমান যতই উন্নত হোক না কেন এবং যতই মার্জিত ও ভদ্র হোক না কেন, উহা অনুমানই। অনুমানের ইমানটি অনুমানই। কোরানের সূরা ইউনুসের একশত নম্বর আয়াতে বর্ণিত ইমানটি দর্শনের ইমান। কারণ আল্লাহর হুকুম ছাড়া ইমান আনা সম্ভব নয়। হজরত ইসা নবির সাহাবারা নবি ইসাকে প্রশ্ন করেছিল এই বলে যে, প্রভু, আপনি মৃতকে জীবিত হও বললেই জীবিত হয়ে যায়, কিন্তু আমরা বললে হয় না কেন? ইসা নবি বললেন, আল্লাহ্‌তে ইমান এনে বলো, দেখবে মৃত তো

জীবিত হওয়া সাধারণ বিষয়, বরং এর চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটানো যাবে। এখন প্রশ্ন হলো, এই রকম ইমানের গভীরতা কয়জনের এবং কতটুকু হতে পারে?

অনেক দিন আগে কলকাতায় গিয়েছিলাম, অবশ্য আজমির যাবার উদ্দেশ্যে। কিছু বই কেনার জন্য কলেজ স্ট্রিটের লাইব্রেরিতে বই দেখছি, এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক এসে লাইব্রেরির মালিক অথবা কর্মচারীকে বলছেন, দাদু, আজ প্রচুর জল দিয়ে স্নান করেছি, পুরো তিন বালতি জল দিয়ে। আমি অবাক হলাম আর ভাবলাম, আমি খালের জলে গোসল করে প্রচুর শব্দটি ব্যবহার করি না, আর উনি মাত্র তিন বালতি জলে প্রচুর শব্দটি বসিয়ে দিলেন। ভাবলাম, প্রচুর মাত্র একটি শব্দ, কিন্তু গভীরতা এবং ব্যাপকতার বাস্তবে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। নবি ইসার ইমানের গভীরতা, আর তাঁর সাহাবাদের ইমানের গভীরতা! একটি সাগর, অপরটি মাত্র তিন বালতি জল। ইমান বিষয়ে কোরান-হাদিস দিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে যিনি অপূর্ব ভাষার শৈলীতে এবং নিখুঁত যুক্তি দিয়ে দুইটি বই রচনা করেছেন আজ হতে প্রায় দেড়শত বছর আগে উর্দু ভাষায়— যাহার অনুবাদ বাংলায় করা হয়েছে, সেই বিখ্যাত বই দুইটির নাম সিররে হক জামে নূর এবং মাতলাউল উলুম— বাংলার মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি যাকে বলা হয়, সেই পীরে কামেল মাওলাউল আলা বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী। এই

দুইটি বই পড়লে আপনার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয় আর প্রশ্নের অবসান হবে বলে বিশ্বাস করি।

ভাষাটি যে কেবলই ভাবের একটি হালকা বাহন মাত্র। ভাষার ঝানু পণ্ডিত যে জ্ঞানের ঝানু পণ্ডিত কখনোই হতে পারে না এবং কোনোদিন হয় না॥ এই নির্মম সত্যটি সহজে চোখে ধরা পড়ে না। তাই আমরা সংশয় আর জিজ্ঞাসার অনেক রকম রোগযাতনায় ভুগি। ট্যাবলেট-ক্যাপসুল খেয়েও কিছু মনে হয় না। মনে হয় সব কিছু ম্লেইন্ড ইন জিজিরা। ইংরেজি ভাষাটির ঝানু পণ্ডিত সাহেবের সামনে যখন রাশিয়ান, জার্মান অথবা ফ্রেন্স ভাষার ঝানু পণ্ডিত ভাষণ দেন, তখন অবুঝ শিশুর মতো কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। তখনই মর্মে মর্মে বুঝতে পারি ভাষা শেখা আর জ্ঞান অর্জন মোটেই এক বিষয় নয়। ব্রিটিশ জাতি বড়ই চালাক জাতি। মালদহের ফজলি আন্দের মতো। অন্য স্থানে গাছ রোপণ করলে ফজলি আন্দের মতো হবে সত্য, কিন্তু সেই খুশবু আর মজাটি পাওয়া যায় না। একই ইলিশ মাছ— সাগর, মেঘনা আর পদ্মার— তিন রকম মজা। ব্রিটেনের মাটি আর বাতাসই এদেরকে ঝানু-চালাক বানায়। ব্রিটিশরা প্রথমে মাতৃভাষা ইংরেজি ফেলে দিয়ে পবিত্র (?) ল্যাটিন ভাষায় লেখাপড়া চালু করেছিল। এতে অনেক ছেলেমেয়ে ফেল করেছে দেখে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। তাই ল্যাটিনকে ফেলে মাতৃভাষা ইংরেজি চালু করেছিল। তারা তাদের ভুল পদক্ষেপটি ধরতে পেরেছিল। কিন্তু আমরা? দুইশত বছর ইংরেজদের গোলামি করার

গন্ধ তো একটু থাকবেই। ভুল বললাম কি? মনে আঘাত লাগে কি? সামান্য লজ্জা পান কি? বিবেকে সামান্য ধাক্কা লাগে কি? হয়তো লাগবে, হয়তো লাগবে না। ভারতের একজন প্রধানমন্ত্রী তাঁর মেয়েকে উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে যে, ভাষা ভাবের বাহন মাত্র। কঠিন এবং আলঙ্কারিক শব্দ ব্যবহার করলে সবাই বুঝতে পারবে না। তোমার ভাবটি এই মার্জিত বাহনের জন্য সবার কাছে তুলে দিতে পারছ না। তাই তো বলি, এহতেরাম শব্দটি না লিখে ইচ্ছত শব্দটি ব্যবহার করলে সবাই বুঝতে পারবে। এতে তোমার ভাষার ঠমকে হোক না কিছুটা অঙ্গহানি।

‘মসজিদুল হারাম তথা কাবা শরিফ হতে বায়তুল মোকাদ্দেসের দূরত্ব কতটুকু?’ প্রশ্ন করেছিলেন মহানবির সাহাবারা, মহানবিকে। সঙ্গে সঙ্গে মহানবি বললেন, ‘চল্লিশ বছর।’ এই হাদিসটি অস্বীকার করার কোনো জো নাই, কারণ ইহা মুত্তাফেকুন হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। যারা বাতেনি অর্থটি কোনো প্রকারেই গ্রহণ করতে চায় না তারা এর ব্যাখ্যা না লিখে বুদ্ধিমানের মতো পাশ কেটে যায়। অথচ এই বাণীটিকে কোনো উপায়েই জাহেরি অর্থে গ্রহণ করা যায় না। কারণ পায়ে হেঁটে গেলেও কাবা হতে বায়তুল মোকাদ্দাস যেতে বড়জোর মাসখানেক সময় লাগতে পারে। ঘোড়ায় চড়ে অথবা উটের পিঠে বসে যেতে চাইলে আরও অনেক কম সময় লাগবে, আধুনিক যুগের বাস, ট্যাক্সি, ট্রেন অথবা বিমানের কথা না হয় বাদই দিলাম। তা হলে মহানবি সঙ্গে সঙ্গে কেন বললেন যে, কাবা হতে

বায়তুল মোকাদ্দাসে যেতে হলে চল্লিশ বছর লাগবে? এই চল্লিশ বছর বলতে জাহেরি সুরতে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। বাতেনি সুরতে যেতে চাইলে, মহানবির নিজের নবুয়ত হাসিল করার সময়টি ইস্তিত দিয়ে বলে দিলেন। কারণ তৌহিদের শিক্ষাটি হলো, নিজের অভিজ্ঞতা এবং আদর্শ দিয়ে উপদেশ দেওয়া। মিষ্টি পরিত্যাগ করে অপরকে উপদেশ দেওয়ার আদর্শ হলো তৌহিদ। তাই মহানবির নবুয়ত পাবার বয়সটি তথা চল্লিশ বছর পর নবুয়ত পাবার কথাটি মনে করিয়ে দিলেন। জাহেরি অর্থে এই হাদিসটিকে কোনো অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায় না। এবং প্রয়োগ করার প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে বাতেনি অর্থটি তথা মারেফতকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়? যদি ধরে নিলাম অস্বীকার জোর করেই করা হলো, তা হলে এই পবিত্র বাণীটির কোনো অর্থই করা যায় না। আর করলেও আজগুবি মনে হতে বাধ্য। কারণ মানুষের শেষ ভরসা হলো নিজের পায়ে হেঁটে যাওয়া। এর চেয়ে ধীর গতিতে অগ্রসর হবার আর কোনো উপায় নাই। একটি মানুষ প্রতি ঘণ্টায় চার মাইল করে হাঁটলে এবং প্রতিদিন মাত্র চার ঘণ্টা করে হাঁটলে কত দিন লাগবে? আগে কাবা হতে বায়তুল মোকাদ্দাসের দূরত্বটি বাহির করুন। যদি ধরে নেই, কাবা হতে পাঁচশত মাইল দূরে বায়তুল মোকাদ্দাস, তা হলে দৈনিক চার ঘণ্টা করে হাঁটলে বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌঁছতে সময় লাগে মাত্র একত্রিশ দিন এক ঘণ্টা। হাজার মাইল দূরত্ব হলে লাগবে বাষট্টি দিন দুই ঘণ্টা। তা হলে সাহাবারা প্রশ্ন

করার সঙ্গে সঙ্গে মহানবি বলে দিলেন ‘চল্লিশ বছর’ সময় লাগবে। হাদিসটি আরবি ভাষাসহ অনুবাদ করে তুলে ধরা যায়, কিন্তু এতই পরিচিত হাদিস যে, তার আর দরকার পড়ে না। মহানবির প্রতিটি আদেশ-উপদেশ বাতেনি কথায় তথা মারেফতের গোপন কথায় ভরপুর। মারেফতকে অস্বীকারকারী অনেকেই তাই গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। অবশ্য ইঁহাও তকদির। সুতরাং সমালোচনা চলে, কিন্তু গালি নাই। উপলব্ধির বিভিন্নতা থাকবেই। বিভিন্নতা না থাকলে একপেশে হয়ে যায় এবং একপেশে কোনো মতবাদই পৃথিবীতে বেশি দিন টেকে না এবং প্রকৃতির নিয়মে টেকার কথা নয়। তাই গণতন্ত্র যতই ক্রটিযুক্ত হোক না কেন, মানুষের বিভিন্ন গবেষণার বিষয়গুলো তুলে ধরা যায়। (কাবা শরিফ হতে বায়তুল মোকাদ্দাসের দূরত্ব চল্লিশ বছর, মহানবির এই বিখ্যাত হাদিসটির বিস্তারিত এবং অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন বাংলার বিখ্যাত ইসলাম গবেষক শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ মসজিদ দর্শন-এ)।

যেমন বলা হয়েছে, রোজাদারের মুখ দিয়ে মেশকান্বর-এর চেয়ে অনেক বেশি সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে। আসলেই কি তাই? হ্যাঁ, অবশ্যই সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু জাহেরি উপবাসে কি উৎকট দুর্গন্ধ থাকে, না সুগন্ধ? তা হলে বাতেনি ইঁফতারের মতো কি বাতেনি রোজার কথাটি বলা হয়েছে? প্রশ্ন করে গেলাম। উত্তরটি আপনিই বাহির করে নিন। পাঁচ ওয়াত্ত নামাজ আদায় করতে গিয়ে অনেকের কপালে কালো একটি চিহ্ন ফুটে ওঠে। সে

চিহ্নটিকে আরবিতে এবং কোরান-এ ভাষায় ‘সী-ম্মা’ বলা হয়। মহানবির আগের নবিদের উম্মতদের উপরও নামাজ ফরজ ছিল। কিন্তু ওয়াক্টিয়া নামাজের কথাটি নাই। তা হলে তাদের কপালেও নামাজের চিহ্নটি কেমন করে ফুটে উঠবে কথাটি কোরান-এ বলা হলো? কারণ আমাদের মতো তারা নামাজ পড়তেন না তথা ওয়াক্টিয়া নামাজই ছিল না। তা হলে তাদের কপালে সেজদার চিহ্নটি পাবার কথা কোরান-এ আছে এবং সেই চিহ্নটি দেখতে কেমন? কারণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তাদের সময় প্রচলিত হয় নি। প্রচলন করা হয়েছে আমাদের জন্য। সুতরাং কপালে কালো দাগ পড়ার কথা আমাদের। তা হলে সেজদার চিহ্নটি ফুটে উঠবে বলার মাঝে কি কপালের কালো দাগটিকে ধরে নেব, না অন্য কিছু? আপনি এই বিষয়টির ব্যাখ্যা যেমন খুশি তেমন লিখুন না কেন, কিন্তু লিখাটি পবিত্র নিয়তে আশ্রিত হতে হবে। আর যদি মনগড়া ব্যাখ্যা লিখেন তো আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। একই স্টিল দিয়ে সার্জন আর কসাইয়ের চাকু তৈরি হয়। দুজনেই কাটে। কিন্তু দুজনের দুরকম নিয়ত। একজন বাঁচানোর নিয়তে, অপরজন গোস্ত বিক্রির নিয়তে। তাই আল্লাহ কেবলমাত্র আপনার নিয়তটাই দেখবেন। আর কেউ যদি সব কিছু বুঝে গিয়ে থাকেন, তা হলে তাকে আর বোঝানো যাবে না। কারণ বুঝবার দরজায় যদি সামান্য ফাঁক না থাকে তা হলে বুঝবার বিষয়টি তো দরজায় ধাক্কা খেয়ে ফেরত আসবে। কেউ সব কিছু বুঝে যাবার কথাটি বলে এবং এটা তার তকদির। আবার

কেউ অনেক কিছু গবেষণা করার পরও ‘সব কিছু বুঝতে পারছি না’ বলে এবং এই বলাটাও তার তকদির।

জ্ঞানাতের বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে রূপকতার আশ্রয় নিয়েছেন কি-না জানি না। তবে জ্ঞানাত বিষয়ে কোরান-এ অনেক রকম আরাম-আয়াদের কথা বলা হয়েছে। আবার কোরান-এ একজনের জন্য দুটো জ্ঞানাত এবং এমনকি চার চারটে জ্ঞানাত পাবার কথাটি বলা হয়েছে। অনুবাদক মহাবিপদে পড়ে যায়। ভাবেন, একজন আবার চারটি জ্ঞানাত থাকবে কি করে? তাই জ্ঞানাতটিকে অনুবাদক জ্ঞানাত না লিখে ফুলের বাগান অনুবাদ করেন। তবুও বলেন না যে, এই দুইটি অথবা চারটি জ্ঞানাত পাবার বিষয়টি বুঝতে পারলাম না। অনুবাদক কোরান-এর সব কিছুর পানির মতো বুঝবার ভান করতে গিয়ে পাঠক ভাইদেরকে কত রকম ভিজাইনের যে লাভভা পাকিয়ে পাতে তলে দিচ্ছেন তা পাঠক সরল বিশ্বাসে বুঝতেও পারে না। কেবল বাংলাদেশে বললে কমই বলা হয়, বরং সমগ্র পৃথিবীতে এই একবিংশ শতাব্দীতে যিনি কোরান-এর সার্থক তফসির কিছুটা হলেও করতে পেরেছেন তিনি বাংলার বিখ্যাত ইসলাম গবেষক শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি। তার কোরান তফসিরটির নাম দিয়েছেন কোরান দর্শন ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের তত্ত্বগুলো আজও এদিনে বিজ্ঞানীদের বুঝতে হিমশিম খেতে হয়। কিন্তু কোরান-এর অনুবাদক সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অকল্পনীয় রহস্যগুলো পানির মতো বুঝে যান। যে কোরান নিজেই ঘোষণা করছে যে, পানিগুলো কালি, গাছগুলো কলম হলেও কোরান-এর ব্যাখ্যা লিখে শেষ করা যাবে না। এই কথাগুলো জানা থাকা সত্ত্বেও কোরান-এর সম্পূর্ণ তফসির লিখা শেষ করে দেন।

পরিতৃপ্ত আত্মার জ্ঞানাতলাভ সম্পর্কে আলোচনা

মহানবি যখন সাহাবাদের বলেছিলেন যে, জ্ঞানাত লম্বা এবং চওড়ায় আকাশ-জমিনে ব্যাপ্ত তখন এক সাহাবা প্রশ্ন করেছিলেন যে, তা হলে জাহান্নামের স্থানটি কোথায়? মহানবি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন এই বলে যে,

রাত আসলে দিন কোথায় যায় এবং দিন আসলে রাত কোথায় যায়? এই
 কথায় কি আমরা এই বুঝতে চাইব না যে, যার জন্য জ্ঞান্নাত তার জন্য সব
 কিছুই জ্ঞান্নাত এবং যার জন্য জাহান্নাম তার জন্য সব কিছুই জাহান্নাম।
 আপন অস্তিত্বের প্রকাশ এবং বিকাশের উপরই জ্ঞান্নাত-জাহান্নামটি নির্ভর
 করে। যিনি জ্ঞান্নাতি তিনি সর্বাবস্থায় সর্বস্থানেই জ্ঞান্নাতি এবং যিনি
 জাহান্নামি সে সর্বাবস্থায় সর্বস্থানে জাহান্নামী। এত বিত্ত-বৈভবের মালিক
 হয়েও শারীরিক এবং মানসিক রোগের যাতনা কি ভোগ করতে হয় না!
 এর চেয়ে জীবন্ত পোড়া কপালটি কি আয়না দিয়ে দেখাতে হবে? গাধার
 খাটুনি খেটেই চলছে এক অদৃশ্য মরণ নেশায় এবং সবাই জানে যে,
 দেহনৌকা হতে বিদায় নেবার সময় আর কেউ আপনজন থাকবে না।
 কেবল অসহায়ের মতো বোবা বিলাপে চিরবিদায় নিতে হবে। জ্ঞান্নাতের
 আসল রূপটি আল্লাহর ওলিরাও জেনেগুনে বলেন না। হয়তো সমাজ গ্রহণ
 করে নেবে না বলে তাঁরাও অনেক রকম রূপকতার আশ্রয় নেন। পরিতৃপ্ত
 নফসকেই নফসে মোতমায়েন্না বলা হয়। আর নফসে মোতমায়েন্নাকেই
 জ্ঞান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদটি কোরান দান করেছে। এখন পরিতৃপ্ত
 বলতে কী বোঝায়? দেহের ক্রোধ, পেটের ক্রোধটি কি পরিতৃপ্ত নফসের
 থেকে যায়? যদি দেহ-ও পেটের ক্রোধ থাকে, তা হলে পরিতৃপ্ত বলা হয়
 কেমন করে? যার কোনো প্রকার চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না
 তাকেই তো পরিতৃপ্ত বলা হয়। তা হলে এই পরিতৃপ্ত নফসের জ্ঞান্নাতে

প্রবেশ করে প্রতিদিন ষাটবার মজাদার খাদ্য খাবার কথাটি আসে কেমন করে? আবার মজাদার খাদ্যই কেবল ষাটবার খাবে না, সেই সঙ্গে অপরূপ হরদের সঙ্গে প্রতিদিন ষাটবার মিলন করবে? আব্বাসীয় খলিফা মোতাওয়াক্কিল, যিনি ইমাম হোসায়েন-এর মাজার হালচাষ করে নাম-নিশানা মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল, অথচ নিয়তির কী নির্মম পরিহাস খলিফা মোতাওয়াক্কিলের কবরটির নাম-নিশানাও আজ আর নাই॥ সেই বাদশা মোতাওয়াক্কিলের যৌন আনন্দ করার জন্য রাজপ্রাসাদে সাড়ে চার হাজার উপপত্নী ছিল। বাদশা মোতাওয়াক্কিল বলত, এক রাত একটি নারীর সঙ্গে যৌন মিলনের পর বাসি হয়ে যায়। মোতাওয়াক্কিল বাসি পছন্দ করে না। তুলি খাঁর পুত্রধন জনাব হালাকু খাঁ বড়ই নির্মম, বড়ই বেদনাদায়ক শিক্কাটি কেন যে আব্বাসীয় শেষ খলিফা মোতাসিম বিল্লাহ, যিনি যৌন জীবনের প্রশ্নে সবাইকে ডিঙিয়ে গেছেন, তাকে শিক্কা দিয়ে গেল বুঝতে পারি না। সুতরাং পরিতৃপ্ত নফস জাল্লাতে প্রবেশ করেই অতৃপ্ত হয়ে যাবার কথাটির মাঝে নিশ্চয়ই কোনো গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে যা আল্লাহর ওলিরা ভালো করেই জানেন।

ইমানের ধারক বাহক কারা?

কথিত আছে অথবা ইতিহাস বলে যে, হালাকু খাঁ বাগদাদ আক্রমণ করে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি। সন-তারিখের সত্যতা কতটুকু, আমরা জানা নাই। তিনশতের কিছু বেশি আপনজন নিয়ে আব্বাসীয় শেষ খলিফা মোতাসিম বিল্লাহ আত্মসমর্পণ করে। হালাকু খাঁ সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং এই হত্যার বিষয়টির মুখরোচক কথাবার্তা জানতে পারি। হালাকু খাঁর নির্দেশে মোল লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়। তারপর হালাকু খাঁ তার খাস চামচার উপর বাগদাদের শাসনভার দিয়ে দেশে ফিরে যাবার পথে কিছুদূর যাবার পর হালাকু খাঁ কিছু লোকজনকে দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করল, এরা কারা? কিছু সৈনিক দেখে এসে বলল, প্রভু এরা সংসার ত্যাগী, এরা সন্ন্যাসী, এরা সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য পাবার সাধক। হালাকু খাঁ বললেন, এরা আর কী চায়? উত্তর এল, এরা দুনিয়ার কিছুই চায় না, কেবল স্রষ্টার সন্ধানে মগ্ন থাকে। কথাগুলো শুনে ভালোই লাগল হালাকু খাঁর কাছে। বললেন, আমি দুনিয়ার বাদশাহির জন্য এত লোক হত্যা করলাম অথচ এরা বাদশাহি তো দূরে থাক, বরং দুনিয়াই চায় না! বড় অবাক করছে আমাকে। প্রচণ্ড কৌতূহল জাগল। হকুম হলো, এদের যিনি প্রধান তাকে আমার কাছে আসতে বলো। কিছু এই সংসারত্যাগীদের যিনি প্রধান তিনি বললেন, যে আমাকে ডেকেছে, তাকে আমার এখানে আসতে বলো নতুবা চলে যেতে বলো। কথাগুলো শুনে হালাকু খাঁর আরও কৌতূহল জাগল। তিনি নিজেই গিয়ে দেখা করলেন। দেখতে পেলেন, একজন সাধক

মাথা নিচু করে চোখ বুজে বসে আছেন। হালাকু খাঁ এক খলি স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন। সাধক প্রশ্ন করলেন, এই খলিতে কী আছে? হালাকু খাঁ বললেন, স্বর্ণমুদ্রা। সাধক বললেন, না এতে স্বর্ণমুদ্রা নেই, আছে কেবল মানুষের রক্ত। চমকে গেলেন হালাকু খাঁ! হাত দিয়ে মৃদু চাপ দিতেই দেখতে পেলেন, একদম টাটকা রক্ত বেরুচ্ছে। তারপর? তারপর আর কী? হালাকু খাঁ সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং মুরিদ হতে চাইলেন। সেই সাধক মহাপুরুষের নামটি হলো হজরত খাজা আবু ইয়াকুব। হালাকু খাঁকে উনি মুরিদ না করে উনারই প্রধান মুরিদ ও খলিফা হজরত খাজা নুর মোহাম্মদ দারবন্দির মুরিদ করে দিলেন। অনেক ঐতিহাসিক এই সত্য ঘটনাটি এড়িয়ে যান নি। হয়তো বিবেকের দংশনে আহত হয়ে। শিয়া ঐতিহাসিক সৈয়দ আমির আলীও ঘটনাটি নিশ্চয়ই পড়েছেন। কিন্তু তথাকথিত শক্তির পূজারি, শান-শওকতের পূজারি, এলিট সমাজের জার্সি যার গায়ে পরা, ইংরেজি ভাষার আলংকারিক বোম্বাস্টিক শব্দ দিয়ে রচিত বিরাট বিরাট ডিগ্রির নরমুণ্ড গলায় ঝুলিয়ে প্রজ্ঞাবান (?) ঐতিহাসিক আমির আলি মুসলিম জাতিকে সঠিক ইতিহাস দিয়ে যান নি। এভাবেই অনেক নির্লব্ধ সত্য হারিয়ে যেতে চায় ব্যক্তির অপছন্দের উপর নির্ভর করে। কারণ সৈয়দ আমির ছিলেন বহু ডিগ্রিধারী মার্জিত ভদ্র জ্যোতিষ শয়তান। ফুসফুস যেমন যক্ষ্মা রোগে খেয়ে খেয়ে ঝাঁঝরা করে দেয়, জঘন্য শয়তান সৈয়দ আমির আলি সুফিবাদের উপর ভক্তিটিকে কলমের খোঁচায় ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

একটিবার নিরপেক্ষ মনে ভেবে দেখুন তো! এত বড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির হালাকু খাঁকে কেউ আমূল পরিবর্তন করা তো দূরে থাক, সামান্য নরম করার সাহসটি পর্যন্ত কল্পনাও করে নি। অথচ সুফিসাধক বাবা খাজা আবু ইয়াকুব তাকে মুসলমান এবং মুরিদ করে ফেললেন একদম অনায়াসে। ইতিহাস অকপটে কথাগুলো এবং ঘটনাগুলো স্বীকার করে নেয়। কিন্তু রহস্যলোকের বিষয়গুলো বর্ণনা করে না। সে জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, ইতিহাসের ঝানু পণ্ডিত, কোরান-হাদিসের ঝানু পণ্ডিত হওয়া এক কথা, আর আল্লাহর ওলি হওয়া আরেক কথা। আরও একটু লক্ষ করে দেখুন তো, সেদিনে বাগদাদ নগরীতে অনেকে কোরান-হাদিসের মহাপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু হালাকু খাঁকে মুসলমান বানানো তো দূরে থাক, বরং হালাকুর সৈনিকদের অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে। কত উঁচু মাপের আল্লাহর ওলি হলে বাবা খাজা আবু ইয়াকুব দেখা করতে না গিয়ে হালাকু খাঁকে আপন খানকাতে এনে মুসলমান এবং মুরিদ বানিয়ে ছাড়লেন। শক্তির পূজারি আর বৈভবের পূজারি আর দুনিয়াবি পণ্ডিত সম্মানের পূজারিরা সুফিবাদের এ রকম রহস্যটিকে বুঝতে পারে না অথবা বুঝবার তকদির তাদের দেওয়া হয় নি। ফুলের মালা গলায় পরে, সেমিনারে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়ে এলিট সমাজের সামনে বাহবা পাওয়া নামটিকে বিখ্যাত করার নেশায় যারা ডুবে থাকে, তাদের কাছে সুফিবাদের রহস্যের আর কতটুকু দাম হতে পারে? কারণ, এরা ভালো করেই জানে যে, সব বিষয়ে কিছু না

কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু সুফিবাদে সব কিছু হারাতে হয়। ইচ্ছা করে সব কিছু হারিয়ে অধসর হবার মন-মানসিকতা খুব কম লোকেরই হয়। খাজা বাবা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পিতা গিয়াস উদ্দিন চিশতির একটি আঙুরের বাগান আর গম্ব ভাঙার পাথরের যঁতাকল পেয়েছিলেন। আঙুরের বাগানটি বিক্রি করে দিয়ে সেই অর্থ গরিবদের দান করে দিলেন। আর গম্ব ভাঙার যঁতাকলটি এক বুড়িকে দান করে দিলেন। তারপর সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন এই বলে যে, হাসান আলামপানার (খাজা বাবার আসল নাম) আর কিছু আছে কি? সবাই নাই বলে সাক্ষ্য দেবার পর খাজা বললেন, এখন পীর ও মুরশিদ খাজা উসমান হারুনি বাক্কার খেদমত করতে চললাম। সব কিছু হারিয়ে খাজা বাবা সব কিছু পেলেন। সেদিনের ভারতবর্ষে মাত্র চার কোটি লোকের বাস ছিল। নব্বই লক্ষ মুসলমান বানালেন। ইমামুল আউলিয়া বাবা বায়েজিদ বোস্তামি বলেছেন, যখন সব কিছু হারাতে পারবে তখন সব কিছু পাবে। এটা বৈষয়িক বিষয় নয়, বরং আধ্যাত্মিক বিষয়। অতএব, সুফিবাদের বইগুলো ছাপিয়ে বিনা মূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে ঘরে ঘরে বিতরণ করার তরে কিছু আর্থিক সাহায্য চাইলে কত শত প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারে আর আমতা আমতা করার দৃশ্য দেখতে হয়! তার উপর সব কিছু হারিয়ে ফেলার দর্শনটি প্রচার করার সাহস! সুফিবাদে না আসুক, কিন্তু একটা ঝাঁকুনি থাক। একটা সামান্য ধাক্কা থাক। মনটা কিছুকণ তোলপাড় করুক সেই আশাটি নিয়ে আর্থিক সাহায্য চাইলে

অবশ্যই কিছু না কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। একদম জঙ্গলে কাঁদতে হয় না (অরণ্যে রোদন)। এখনও কিছু মানুষ আছে। এখনও জগতে সুফিবাদের দরদি হারিয়ে যায় নি।

কথিত আছে যে, হালাকু খাঁ খাজা আবু ইয়াকুবের মুরিদ ও খলিফা খাজা নুর মোহাম্মদ দারবন্দির নিকট দুঃখ প্রকাশ করেছেন। হালাকু খাঁ তার সৈন্যবাহিনীকে হকুম দিলেন যে, আমি মুসলমান। তাই তোমাদেরকেও অবশ্যই মুসলমান হতে হবে, নতুবা মৃত্যুদণ্ড। মধ্য এশিয়ার বিশাল ভূমি হালাকু খাঁর অধীনে ছিল। ঘোষণা করে দিলেন, হয় মুসলমান হও, না হয় মৃত্যুবরণ করতে হবে। জীবন বাঁচানো ফরজ তাই অনেকেই মুসলমান হয়েছে। অবশ্য বলপ্রয়োগের প্রশ্নটি আসে। কারণ ইসলামে বলপ্রয়োগ নাই। আর তখন তো ছাপানো কোরান-এর প্রশ্নই ওঠে না। সবই হাতের লিখা কোরান, আর হাতের লিখা কোরান কয়টি পাওয়া যেত? বলপ্রয়োগ করে থাকলেও হালাকু খাঁর বিষয়টি হয়তো জানা ছিল না। আবার এমন হিংস্র প্রকৃতির জন্য জানা আর না জানা একই সমান। এ জন্যই হয়তো ঐতিহাসিকরা হালাকু খাঁর এ রকম আচরণটির মূল্যায়ন করেন নি। কারণ গরুর নাকে গোলাপ ফুল ধরলে ঘ্রাণ না নিয়ে খাবার জন্য জিস্তা বের করবে। যেমন শিশুরা করে। কিন্তু ইতিহাস হালাকু খাঁকে ক্ষমা করে নি, বরং দানবীয় শক্তির প্রতিমূর্তি রূপেই চিহ্নিত করা হয়। শক্তিপ্রয়োগ করে নিজেকে কিছুদিনের জন্য ব্রাণকর্তা রূপে জাহির করা যায়। তারপর

ইতিহাস আঁস্কাবুড়ে ফেলে দেয়। সামান্য একটি দৃশ্য অবশ্য নিজের চোখে দেখেছি। কিছুদিন পাকিস্তানে ছিলাম আইয়ুব খানের আমলে। করাচির বড় বড় সরকারি অফিসে তিনজনের ছবি শোভা পেত : জিন্নাহ, ইকবাল আর আইয়ুব। ফাউন্ডার, ড্রিমার, সেভিয়ার। প্রতিষ্ঠাতা, স্বপ্নদ্রষ্টা, ব্রাণকর্তা। এখন দুটো ছবি শোভা পায় : জিন্নাহ আর ইকবাল। ইতিহাস অপর ছবিটি ফেলে দিয়েছে।

ভক্তি ও ভক্তির প্রকারভেদ

ভক্তি বিষয়টিতে কিছু কথা থেকে যায়। কারণ ভক্তি যদিও একটি বিষয়, কিন্তু দুইটি ভাগে ভাগ করতে বাধ্য হতে হয়। সুতরাং ভক্তি দুই প্রকার : একটি শর্তযুক্ত ভক্তি এবং অপরটি শর্তহীন ভক্তি। যে ভক্তির মাঝে কিছু পাবার শর্ত থাকে সেই ভক্তি কিছুদিনের জন্য তথা আপেক্ষিক এবং যে ভক্তির মাঝে দুনিয়াবি কিছু পাবার শর্ত থাকে না সেই ভক্তি চিরস্থায়ী। যে ভক্তিতে শর্ত থাকে উহার রূপটি কখনও কখনও চাটুকারিতায় পরিণত হয়। অনেক সময় এমনই চাটুকারিতার সীমা ছাড়িয়ে যায় যে, লোকে তখন ভক্তিটির উপর সন্দেহ করে বসে। অনেক সময় বিষয়টি হাস্যরসে পরিণত হয়। এ রকম ভক্তির ধমক আর চমক দেখেই খনা বলে ফেলেছিলেন যে, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। কারণ যে ভক্তির ভেতর কিছু পাবার বাসনাটি লুকিয়ে থাকে সেখানে চুরি করার মনোবাসনা জেগে ওঠে এবং দিনের

আলোর মতো প্রকাশ পায় এবং তখনই ভক্তিটি চোরের লক্ষণ রূপে ধরা পড়ে। এই রকম ভক্তিটি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থ এবং শক্তির অধিকারী হবার প্রশ্নটি আছে বলেই ভক্তিটি অতি ভক্তিতে পরিণত হয় এবং চোরের লক্ষণটি ফুটে ওঠে। ভারতের নামিদান্নি খবরের কাগজের বিখ্যাত সম্পাদকরা পর্যন্ত এক নেত্রীর প্রতি যে ভক্তি প্রদর্শন করেছিল তাতে পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞানী-গুণীরা চমকে গিয়েছিল। মনে মনে বলেছে, এটা আবার কেমন জাতের ভক্তি প্রদর্শন? লাগামছাড়া ভক্তিটিকে তো বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকরা হার মানিয়ে দিয়েছে এই বলে যে, মহাত্মা গান্ধী এবং গোতম বুদ্ধের প্রতিমূর্তির মতো সেই নেত্রীর পুত্রের আচার-আচরণ। এবং সেই নেত্রীর পুত্রের সহসা মৃত্যু হলে সব ভক্তি নিম্নেষেই শেষ হয়ে গেল এবং বিখ্যাত সম্পাদক সাহেবরা আর প্রশংসা ও ভক্তির এক কলাম ইঞ্চিও লিখতে বেমানুষ ভুলে গেলেন। এই জাতীয় বিখ্যাত সম্পাদকরা যখন অন্যজনের ভক্তিকে কটাক্ষ করে কলাম লিখেন, তখনি খনা বাবাজির কথাটি মনে ভেসে ওঠে, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। সুচ আর চালুনির গল্পটির সার্থকতা এখানেই দেখতে পাই। লাল পতাকা হাতে নিয়ে একদল নেতা যখন অতি বামের স্লোগানে লাফালাফি শুরু করে দেয়, তখন জনতার একটি অংশও তাই করে, বুকভরা আশা নিয়ে। তারপর? কিছুদিন পর যখন অতি ডানপন্থীদের মন্ত্রী

হয়ে যান, তখন জনতা হাঁ করে তাকিয়ে ভাবতে থাকে যে, হায়! মুরগির তা দেওয়া ডিম হতে হাঁসের বাচ্চা বেরিয়ে পানিতে নেমে গেছে।

একজন মুসলমান শখ করে ধুতি, গেরুয়া ধরনের পাঞ্জাবি, কাঁধে ব্রাশ্শণের পৈতা, নামাবলির চাদর গায়ে দিয়ে আর কপালে চন্দন ম্লেখে সকালে প্রাতঃদ্রম্ভণে বের হতেন। অপরিচিত হিন্দুরা পথে দেখা হলে ভক্তি করত, অনেক সময় কিছুটা পথ অনুসরণ করত। কিন্তু যখন সকালের নাস্তা খাবার জন্য নাসু ম্মিয়ার গরুর তেহারির দোকানে ঢুকত, তখনই সব ভুল ভাঙত আর চোখ দুটো চড়ক গাছের মতো বিস্ময়ে চেয়ে দেখত নামাবলি পরা সাধুটির আপন মনে গরুর তেহারি সেবা করার দৃশ্যটি। এই জাতীয় ডেজাল ভক্তিটি আমাদের দেশেও হয়তো থাকতে পারে এবং এই ডেজাল ভক্তিটিকেই বলে চাটুকারিতা। আর খনার ভাষায়, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। কিন্তু যেখানে কিছু পাওয়া তো দূরে থাক, বরং দিতে হয় এবং হারাতে হয়, সেখানে ভক্তিটি যতই আবেগে পরিপূর্ণ থাক না কেন, কিছু সবটাই খাঁটি সোনার মতো উজ্জ্বল। সেই ভক্তির ভাষা যতই লাগামছাড়া হোক না কেন, যতই ইনিয়েবিনিয়ে ভক্তির চরমে গিয়ে উঠুক না কেন, সেই ভক্তিটি পবিত্র এবং আন্তরিক। কারণ এ রকম ভক্তির মাঝে বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়া থাকে না। থাকে না কোনো প্রকার শর্ত। তাই এ রকম ভক্তিটি কেবল পবিত্রই নয়, বরং মহাপবিত্র। উচ্ছ্বাসের উচ্চতা থাকতে পারে। আবেগের চরম আবেদন থাকতে পারে। কান্নার হা-হতাসের বিষাদ

ধ্বনি মাঝে মাঝে গর্জে উঠতে পারে এই শর্তহীন ভক্তিতে। লাইলির রাস্তার কুকুরের গায়ে মজলু লাইলির গন্ধ পাবার ঘোষণাটির মাঝে বিন্দুমাত্র চাটুকানিতা থাকতে পারে না। কারণ এটাই যে প্রেম। তাই যুক্তির যেখানে কবর, প্রেমের শুরু সেখান থেকে। তাই দেখতে পাই আল্লাহর ওলিদের ভক্তির অবাক করা ভাষার বিশেষণগুলো। আল্লাহর ওলিরা ভক্তির নামে চাটুকানিতা করছে এ রকম কথাটি পাষণ হৃদয়ের মানুষটিও বলে না।

আমি যে ভক্তিটির কথা বলছি সেটা হলো সুফিবাদের ভক্তি। আত্মজিজ্ঞাসার ভক্তি। নিজের পরিচয় জানার সাধনার ভক্তি। এ রকম ভক্তিতে অর্থনীতি এবং রাজনীতির বিষয়টি নাই। সুতরাং চোরের লক্ষণ মার্কান ভক্তিটি থাকার প্রশ্নই আসে না। আমরা অনেক সময় দুটোকে এক করে ফেলি, তাই পার্থক্য করতে পারি না। এতে ভুল করি এবং উল্টাপাল্টা বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করি। অনেক সময় সুফিদের কাছে এসে হিংসাপরায়ণ মানুষটিও সাময়িকভাবে হলেও ভক্তির কাছে মাথা নত করে দেয়। যেমন, হালাকু খাঁ। জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর তো তাঁর পীর ও মুরশিদ হজরত বাবা দরবেশ বন্ধুকে এতই ভক্তি করতেন যে, পুত্র হুমায়ূনের মরণ শয্যায় অনুরোধ করে রাজপ্রাসাদে ডেকে আনেন। এই দৃশ্য দেখে সম্রাট বাবরের পাত্রমিত্ররা চমকে যেতেন। কিছু মানুষ যতই নির্ভুর প্রকৃতির হোক না কেন, সুফিসাধকদেরকে সমীহ করতে ভুলে যায় না। কারণ তারা ভালো করেই জানে যে, সুফিরা দুনিয়ার লোভ-লালসা হতে মুক্ত এবং

ঐদের দোয়া আল্লাহপাকের দরবারে কবুল হয়। মোগল সম্রাট জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর তো ইচ্ছা করে হাত দুটো কয়েদির মতো বেঁধে খালি পায়ে বাবা সেলিম চিশ্তির মাজারে গিয়ে দোয়া চাইতেন।

ধন-সম্পদের প্রতি মানুষের এত বেশি লোভ জন্মাতে থাকে যে, অবশেষে সেই লোভটি ক্যাসারে পরিণত হয়। ক্যাসার যেমন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আঁঠার মতো লেগে থাকে, লোভ-মোহ বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে সে রকম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লেগে থাকে। হাবিয়া নামক তলাবিহীন গর্ত জাহান্নাম তার জন্য অপেক্ষা করে। মৃত্যুর কিছু আগেই একটি মানুষ তখন সব কিছু বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, দেহনৌকা হতে কেবলমাত্র একলা বিদায় নিতে হচ্ছে। যাদের এতকাল আপনজন ভেবে এত গাধার খাটুনি খেটেছি, যাদের জন্য কত রকম অন্যায় কাজ বিবেককে ফাঁকি দিয়ে করেছি, তারা কেউ আর আমার আপন নয়। বারবার সূরা ফজরের কয়েকটা তফসির পড়ে দেখুন, আপনার মনটাকে হয়তো ভাবিয়ে তুলতে পারে, যদি ভাবিয়ে তোলার তকদির আপনাকে দেওয়া হয়ে থাকে। না হলে, সামান্য বুদ্ধিমানের হাসি হেসে কোরান-এর সূরা ফজরটি পড়তে চাইবেন না। কোটি টাকার মালিক হলে শত কোটি টাকার সাধনা করবে। শত কোটি পেলে হাজার কোটি এবং আরও আরও। যেন সীমাহীন চাওয়া, যেন প্রচণ্ড একটি নেশা। মরণনেশা হিরোইনের চেয়েও মারাত্মক। কারণ মরণনেশা হিরোইন সেবন করতে পারলে ফুটপাথে লগ্না হয়ে শুয়ে পড়ে, কিন্তু ধন-

সম্পদের নেশা রাতের ঘুম হারান্ন করে দেয়। অধম লিখক কোটি কোটি টাকা কামিয়েছি, তাই এই নেশার সামান্য অভিজ্ঞতা আমার আছে বৈকি! শত শত কোটি টাকার মালিক। হৃদরোগ হয়েছে। বিড়লা ক্লিনিকে দিব্য শেঠজির বুকফাঁড়া অপারেশন আর পেস মেকার বসানো, তারপরও টাকার নেশায় মশগুল। বললাম, পরকাল? উত্তর, পরেরটা পরে হবে। তা ছাড়া হজ করে এসেছি। হাজারে আসওয়াদে চুমু খেয়ে সব পাপ পরিষ্কার করে এসেছি ইত্যাদি। যেমন হিন্দুরা লাক্ষলবন্ধের জলে স্নান করে বলে ফেলে, বাঁচা গেল। একদম সব পাপ খালাস করে দিয়েছি। প্রায় সব ধর্মে এ রকম ছোটখাটো কথা শুনতে পাবেন যদি সব ধর্ম পড়ে থাকেন। তকদিরের লিখন বলে আপনি এ রকম মহান (?) ব্যক্তিদের থেকে মুখটি ফিরিয়ে নিন। কারণ আজাজিল এদেরকে সাপের ব্যাঙ গেলার মতো গিলে ফেলেছে। এরা আজাজিলের সভ্যতায় সভ্য সদস্য।

বস্তুর বিজ্ঞান ও আত্মার বিজ্ঞানের স্বরূপ

আমরা মাথার জ্ঞান দিয়ে সব কিছু বুঝতে চাই। চাই বলেই সীমাহীন কামনা-বাসনা কলবের জ্ঞানটিকে ঢেকে দেয়। বুঝতেই পারি না যে, কলবের জ্ঞান আবার কী রকম? মাথার জ্ঞানের মধ্যে আজাজিলের নাচন থাকে। উনিশ প্রকার নাচার স্টাইল জানে আজাজিল। তাই মাথার জ্ঞানীরা যেখানেই থাক না কেন, সংঘর্ষ আর যুদ্ধ থাকবেই। বৈষয়িক সভ্যতাটি

যতই চকমক করুক না কেন, স্বার্থের যুদ্ধটি আঁঠার মতো লেগে থাকবেই। মারামারি-কাটাকাটি বৈষয়িক সভ্যতায় থাকবেই। শোষণ, শাসন, জুলুম, অত্যাচার আর মেকি মানবতার গান বৈষয়িক সভ্যতায় থাকবেই। বিজ্ঞান বৈষয়িক সভ্যতাটিকে অনেক দূর এগিয়ে এনেছে। কিন্তু কলবের শান্তিটি দিতে পারে নি। আর কোনোদিন পারবে কিনা জানি না। আল্লাহর ওলিরা বৈষয়িক সভ্যতাটিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অবশ্যই মনে করেন। কিন্তু কলবের জ্ঞানই শান্তিটি দিতে পারে। কলবের জ্ঞানীরা বৈষয়িক সভ্যতাটির প্রতি অভিনন্দন জানান সত্যি, কিন্তু কলবের জ্ঞান রহস্যটি দিতে পারে না বলেই, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করে নিতে বলে। কলবের জ্ঞানটির সঙ্গে মাথার জ্ঞানটির তথা বৈষয়িক জ্ঞান অর্জন করার প্রশ্নে সামান্য মিল নেই বলে, আমরা দুটোকে মনের অঙ্গান্তে এক করে ফেলি এবং কলবের জ্ঞানীর কাছে বৈষয়িক জ্ঞানের নানা রকম প্রশ্ন করে উত্তর পাই না বলে অবাক হতে হয়। আমরা ইচ্ছা করে জানতে ও বুঝতে চাই না যে, মাথার জ্ঞান বৈষয়িক সভ্যতা উপহার দিতে পারে আর কলবের জ্ঞান দিতে পারে শান্তি ও আত্মদর্শন। মানবদেহটিকে বৈষয়িক বিষয়ের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে দিয়েছে যে, দেহটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, সচ্ছল সংসার জীবনটি কাটাতে চাইলে, প্রতি পদে পদে বৈষয়িক জ্ঞান ও সভ্যতার প্রয়োজন হয়। এই বিষয়টি নিয়ে মানুষকে এত ভাবতে হয় যে, কলবের জ্ঞানটিকে মেনে নেবার মন-মানসিকতাটি তখন আর বাকি থাকে না। সবাই কিছু না কিছু

কলবের জ্ঞান বিষয়ে কিছু না কিছু সময় ভাবে যখন দেখতে পায় এত কিছু পাবার পরও আরও কিছু একটা পাবার আছে বলে বিবেকটা বারবার খোঁচা মারে। পার-কূল পায় না বলে মনগড়া একটা ধারণা করে ব্যর্থ শান্তি খোঁজে। শান্তি পায় না তবুও শান্তি পাবার ভানটি করে। বৈষয়িক সভ্যতা শক্তির পূজা করতে শেখায় এবং শক্তির পূজা করাটি মাতার জ্ঞানের ধর্ম। তাই দেখতে পাই আল্লাহর ওলিদের কথা ও উপদেশের বইগুলো বিশ্ববিখ্যাত হলেও চলে খুব কম। হাফিজ, জামি, সামশে তাব্রিজ, খসরু, সানাই, লালন, জগদীশ আর মনোমোহন রচিত বইগুলো কম চলে। অথচ অবাক হতে হয়, একটি দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির স্বীর রচিত স্মৃতিকথার বইটি লেখার ঘোষণা দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশক পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা অগ্রিম দিয়ে বায়না করে রাখে এবং প্রথম প্রকাশের সংখ্যা দশ লক্ষ হবে বলে প্রচার করে। চিন্তা করুন হালকা কতগুলো কথা, স্বামী কেমন বীরপুরুষ, দাম্পত্য জীবনের চুকা-মিঠা কথাগুলো পড়ার কী আগ্রহ! ছাগলের দুই বাচ্চা দুধ খায়, এক বাচ্চা অকারণেই আনন্দে নাচতে থাকে। এই আগ্রহটি জাগিয়ে তোলে বৈষয়িক জ্ঞানের শক্তি। চাওয়া-পাওয়ার কিছু না থাক, কিন্তু শক্তির তো পূজা করা যাবে। এত শক্তির পূজারকদের ভিড়ে কলবের জ্ঞানীদের কথা, উপদেশ ভালো লাগলেও কিছু পাবার থাকে না, বরং হারাতে হয়। তাই মানুষ হারাতে চায় না, বরং কিছু পাইতে চায়। না হয় তো পাবার উৎসাহ এবং ফর্দুলাগুলো এত ভালো লাগবে কেন? অবশ্য

বেশ কিছু মানুষ আজও কলবের জ্ঞানীদের কথা ও উপদেশ সাদরে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। দেহনৌকা ফেলে যে চলে যেতে হবে এবং দেহনৌকাটি যে কবরস্থ অথবা পুড়িয়ে ফেলা হবে এটা ভালো করে জানে এবং বোঝে। কিন্তু বৈষয়িক সভ্যতার শক্তিটি এতই প্রবল যে, এর খপ্পরে পড়ে মানুষ সীমাহীন চাহিদার গোলাঘ্নি করে। বৈষয়িক সভ্যতার ধর্মটি হলো সীমাহীন চাওয়া আর পাওয়ার হিসাব। মরার আগেও বৈষয়িক সভ্যতার হালখাতা শক্ত হাতে ধরেই মারা যায়। বৈষয়িক লোভ-লালসা একটা সুন্দর মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার নজির ইতিহাসের পাতায় ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। নমুনা তুলে ধরলে শেষ হতে চাইবে না। যেমন ধরুন ইতালির মুসোলিনি। উনিশশ' কুড়ি সালের দিকে মুসোলিনি ছিলেন একজন জাঁদরেল সাংবাদিক এবং মানবতাবাদী। ক্ষমতার মোহনীয় শক্তি মুসোলিনিকে কোথায় নিয়ে এলো এবং পরে কোথায় কোন শোচনীয় পতনের শেষ বিন্দুতে একদম অসহায়ের মতো মৃত্যুবরণ করতে হলো! জার্মানির হিটলার একজন ঝানু আর্টিস্ট ছিল, অপূর্ব ছবি আঁকতে পারত। ভিনচি, গঁগা, বুলেন মুয়েল, ইনার জনসন, পাবলো পিকাসোর মতো জগৎজোড়া নাম কিনতে পারবে বলে অনেকেই আশার বাণী শুনিয়েছিল। কিন্তু তারপর? তারপর মানব ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ংকর খুনি বলে সবাই ঘৃণা করে। আল্লাহর বান্দা ষাট লক্ষ মানুষ খুন করতে হিটলারের বিবেকটি সামান্য কেঁপে ওঠে নি। শক্তির মোহ বিবেককে অন্ধ করে দেয়। পশুর

চেয়েও নীচে নামিয়ে দেয়। এক মুহূর্তের তরেও ভাবতে চায় না যে, দেহের ভেতর সামান্য একটি হৃদযন্ত্র ঘড়ির কাঁটার মতো টিকটিক করে চলছে এবং যে কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেলে বিরাট গর্বিত পোশাক-পরা দেহটি লাশে পরিণত হয়।

শয়তানের অবস্থান কোথায় এবং কীভাবে?

অন্ধ শক্তির মোহটি শয়তান অনেক রকম আশা দিয়ে ফুটিয়ে তোলে। আর শয়তানের মোহজালে মানুষ এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে মৃত্যুই শেষ পরিণতিটি এনে দেয়। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাক্বুল আল আমিন আমাদেরকে বারবার সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে, বান্ধার চাওয়ার কোনো শেষ নাই। যদি দুনিয়াটা পুরোটাই একটি বান্ধাকে দিয়ে দেওয়া হয়, তো আর একটি দুনিয়া চাইবে। এ যেন মরুভূমির মরীচিকার মতো। মনে হয় এই তো কাছেই জলের ঢেউ, কিন্তু এ যে মৃত্যুর মেকি জলের নিপুণ ছলনা মাত্র। এই নিপুণ ছলনা শয়তান খান্নাস-রূপ ধারণ করে আপন দেহের ভেতর থেকে প্রতিটি মুহূর্তে ধোঁকা দিয়ে চলছে। ধোঁকা মনে হয় না এ জন্য যে, ধোঁকাটি বাহির হতে দেওয়া হয় না। কারণ মানবদেহের বাহিরে শয়তান থাকে না। এটা কোরানের প্রকাশ্য ঘোষণা। দেওয়া হয় আপন দেহের ভেতর হতে। আপন নফসের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে খান্নাসটিকে। যেমন দুধে জল মেশালে বোঝা যায় না। বিশাল মানবদেহের

হৃদয়ঘড়ি জীবনঘড়ির কাঁটা টিক্‌টিক্ করে চলছে আর সেই সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তান মোহের জাল বুনে চলছে বিবেকটা গ্রাস করার তরে। কিন্তু বুঝবার উপায় থাকে না। জীবনঘড়ির কাঁটাটি থেমে যাবার কিছুক্ষণ আগেই শয়তানের ধোঁকাটি ধরা পড়ে। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় থাকে না। কোরান-এর সূরা হাশরে অকপট বয়ানটি পাই শয়তানের। কিন্তু তখন যে সব কিছু শেষ হতে চলছে। জীবনের অর্থনীতি, রাজনীতি, পারিবারিক বিষয়ের উপর শয়তান সাথেই আছে। এমনকি প্রতিটি চলার ধাপে ধাপে শয়তান কাছেই থাকে, তবু আমরা বুঝতে পারি না। লোভ ও মোহের সুতাগুলো খুবই শক্ত। ছিন্ন করার শক্তি আমাদের থাকে না। কারণ ছিন্ন করার উপায় আমাদের জানা নাই। কেউ শিখিয়ে দেয় নি। শিখিয়ে দেবার গুরু কোথায় পাব? গুরুর বেশেও শয়তান মেকি গুরু সেজে বসে আছে। হেরা গুহার ধ্যানসাধনাটিকে কে শিখিয়ে দেবে? কেমন করে ধ্যানসাধনা করতে হবে সেই সাধনা শেখাবার গুরুটি কোথায় পাব? আসল গুরুর সন্ধান পেলেও অনেক সময় শয়তান রোহবানিয়াতের ধূয়া তুলে পথ ভুলিয়ে দেয়। কারণ শয়তান গুরু মানে না। গুরুকে জানবার বিধান শয়তানকে দেওয়া হয় নি। তাই শয়তান নিজেই গুরু সেজে বসে থাকে। শয়তান আল্লাহর পূজা করে (সূরা হাশর), কিন্তু গুরুপূজা করে না। আল্লাহর কাছে শয়তান মাথা নত করে, কিন্তু আদমকে সেজদা দেয় না। আদম কেবল ইনসান নয়, বরং আদম ইনসানে কামেল। আদম নবি ও

রসূল। আদম শফিউল্লাহ। আদম-এর ডেতর নুর-এ-মোহান্নদির জাঘত রূপ বিরাজিত। তাই ইনসানরূপী আদমকে মেনে নিতে পারে না শয়তান। শয়তান এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করে না। ওয়াহেদ আল্লাহকে শয়তান মেনে নেয় এবং সেজদা করে, কিন্তু আহাদ আল্লাহকে শয়তান মানে না এবং সেজদা করে না। সর্বভূতে যে আল্লাহর সিফাত বিরাজিত সেই আল্লাহ সর্বশক্তিমান। সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহকে শয়তান মানে না, তাই আদমকে সেজদা করতে তথা মেনে নিতে অস্বীকার করল। যারা আদমের আনুগত্যকে অস্বীকার করে বলে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কাহাকেও মানি না, তারা ওয়াহেদ আল্লাহকে মেনে নেয়। আহাদ আল্লাহ তথা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে মেনে নেয় না। মুখে মেনে নেবার কথাটি বারবার বলবে, কিন্তু সাধনপদ্ধতিতে আল্লাহর নুরে নুরময় হবার প্রথাটিকে কিছুতেই মেনে নেবে না। শয়তানের মেনে

নেবার মতো এদের মেনে নেবার হবহ মিল পাই। তাই মানুষকে প্রতি পদে পদে ধোঁকা খাবার সমূহ বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। লক্ক লক্ক ওলি, গাউস, কুতুব, আবদাল, আরিফেরা যুগে যুগে এই একটি মাত্র মূল দর্শনকে নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গিমায় প্রকাশ করে গেছেন। ভাষা ভিন্ন, ভঙ্গিমা ভিন্ন, পদ্ধতি ভিন্ন, চমক-ধমক ভিন্ন, নর্তন-কুর্দন ভিন্ন, পথ ভিন্ন, কিছু জলে-ভরা সাগর একটাই। মোরাকাবার কৌশল ও পদ্ধতি ভিন্ন, কিছু মূল দর্শন একটি। এখানে ধর্মীয় সাইনবোর্ড ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। দেশ-জাত-কালের

বিভিন্নতায়, পোশাক-পরিচ্ছদে ভিন্ন হতে পারে, খাওয়া-দাওয়া, চলা-বলার মাঝে ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু মূল দর্শনটি এক ও অখণ্ড (সূরা ইব্রাহিম)। এ জন্যই সুফিরা জাতের মধ্যে বাস করেও জাতের উর্ধ্বে বাস করেন। সংকীর্ণতার অঙ্কগলিতে সুফিবাদ থাকতে পারে না। তাই নিজ নিজ পোশাকেও অভিন্ন মত ও পথের কথা বলা হয়। খসরু, লালন, কবির, কানাই, জগদীশ, মনোমোহন, দ্বিজদাশ, শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই, বুন্নে শাহ, শাহবাজ, নজমুদ্দিন, ফারমাদি, মটকা শাহ॥ এদের ভাষা ভিন্ন, গান ভিন্ন, সুর ভিন্ন, ঠমক ভিন্ন, শৈলী ভিন্ন, ময়ূখ ভিন্ন, কিন্তু মূল বিষয় অভিন্ন। এরা একই আত্মসমর্পণের সাগরে ঝাঁপ দেবার বাণী শোনায়।

এই আত্মজিজ্ঞাসার বাণী সবার পছন্দ হবে না। সবাই এই আশ্রানে সাড়া দেবে না। এই মহাবাণী, এই মহামন্ত্র যতই কানের কাছে ঘ্যানরঘ্যানর করে শোনানো হোক না কেন, সবাই এর মর্ম এবং মূল্য বুঝতে পারবে না। অল্পসংখ্যক লোক আসবে, আসে এবং এসেছিল॥ মহাকাল এর সাক্ষ্য বহন করে চলছে। এই হেকমতের জ্ঞান তথা রহস্যময় জ্ঞান মাথা খাটিয়ে অর্জন করা যায় না, বরং আতা করা হয় তথা দান করা হয়। কারণ কলবের জ্ঞান, সিনার জ্ঞান তথা এলম্মে লাদুনি দানের বিষয়, অর্জনের বিষয় নয়। তাই তো কোরান এই বিষয়টির প্রশ্নে ‘যাকে ইচ্ছা’ দান করার কথাটি ঘোষণা করেছে। যাকে দেবার নয়, দান করা হবে না, তাকে ধ্যানসাধনায় বসতেই দেওয়া হবে না। জোর করে বসতে চাইলেও লাখি দিয়ে উঠিয়ে

দেওয়া হবে। এটা-সেটা বলে অনেক রকম কথার মালা শুনিযে, ভয়ভীতি দেখিয়ে যুক্তিতর্কের ধাঁধায় ফেলে ধ্যানসাধনা হতে মনের অজান্তে সরিয়ে দেওয়া হয়, অথচ বুঝতে পারে না। এটাই আল্লাহর হেকমত। বিশেষ বিধান। বিশেষ কলাকৌশল।

গণতন্ত্রের দেশের এক বিদ্বান ব্যক্তি, যিনি বিরোধী দলে অবস্থান করছেন, তিনি সাধারণ মানুষের সম্মাবেশে একশত পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলছেন যে, দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী বিবাহ করেন নি, তাই মেঘের দেবতা বরুণ বৃষ্টি দিচ্ছে না। সরকারি দলের এক নেতাকে জানানো হলে তিনি বললেন যে, এই অখাদ্য কথার নিন্দা করার যোগ্যতাটুকুও নাই। তেমনি আমাদের দেশে ‘আধ্যাত্মিক’ নামটি ধারণ করে অনেক প্রতারক একশত পার্সেন্ট গ্যারান্টির বাণী শুনিযে জনতার সাথে প্রতারণা করছে এবং এদের অখাদ্য খনকারিকে আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড বলে সমালোচনা করতেও রুচি ও বিবেক ঘৃণা করে। এসব অপদার্থরা সুফিবাদের উপর প্রশ্ন দাঁড় করাতে চায়। কিন্তু সুফিবাদে বিশ্বাসীরা এদের সামান্য আমল দিতেও ঘৃণা বোধ করে। সুফিবাদে বিশ্বাসীরা ভালো করেই জানেন যে, মৌল্লা দিয়ে মহানবিকে মাপতে গেলেই বিরাট ভুল করা হবে। কারণ মৌল্লা মৌল্লাই, আর মহানবি মহানবিই। যাজক দিয়ে যিশুখ্রিস্টকে মাপতে, খাদেম দিয়ে খাজা বাবাকে মাপতে এবং কট্টর পুরোহিত দিয়ে ভগবান কৃষ্ণকে মাপতে গেলেই বিরাট ভুল করা হবে। সাদা দই দেখে সাদা চুনের কথা মনে করা

ঠিক নয়। আর পথের ধারে দড়ি পড়ে থাকাকাটিকে সাপ মনে করাও ঠিক নয়। ইবলিস অহংকারী, তাই আদমকে সেজদা করে না। সেজদা না করার কত যুক্তি আর দলিল যে ইবলিসের আছে, তা আল্লাহর প্রেমিক দেখতে পেয়ে হাসতে থাকে। ইবলিসের মাথা আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নত হবে না বলার মাঝে কি স্থূল দৃষ্টিতে ভুল পাওয়া যায়? আরবি-জানা পণ্ডিতের দলও তো এমন কথাটি বলে। তা হলে ইবলিসের দোষটা কোথায়? আরবি জানা পণ্ডিত বলছে, আল্লাহ ছাড়া মাথা নত করি না। আবার ইবলিসও ঐ একই কথা বলছে যে, আল্লাহ ছাড়া ইবলিসের মাথা নত হবে না। উভয়ের কথা এক। উভয়ের দর্শন এক। কারণ কোরান হতে অনেক দলিল তুলে ধরা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করো না। তা হলে? তা হলে এর আসল রহস্যটি কোথায় লুকিয়ে আছে? ওয়াহেদ আল্লাহ আর আহাদ আল্লাহর সূক্ষ্ম পার্থক্যটি না বুঝবার দরুন এ রকমটি হতে বাধ্য। ‘কুলহ আল্লাহ ওয়াহেদ’ তথা ‘বলো আল্লাহ এক’ বলা হয় নি, বরং বলা হয়েছে ‘কুলহ আল্লাহ আহাদ’ ‘বলো আল্লাহ অখণ্ড, একক, স্বয়ং স্বয়ম্ভু সত্তা।’ নফস আর রুহের পার্থক্যটি পরিষ্কার বুঝতে না পারলে যেমন সব কিছু তালগোল পাকানোর গন্ধ পাওয়া যায়, তেমনি ওয়াহেদ আর আহাদের পার্থক্যটি পরিষ্কার বুঝতে না পারলে এ রকম দশা হতে বাধ্য। ইনসান আর আদম এক বিষয় নয়। কারণ ইনসান হতে নবি ও রসুলের আগমন। তাই বলে সব ইনসান নয়। ইনসানের সুরতই আল্লাহর

সুরত, বলা হয় নি। বলা হয়েছে, আদমের সুরতই আল্লাহর সুরত। এই সূক্ষ্ম বিষয়টি ভালো করে বুঝতে না পারলে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। মহানবিকে ইনসান না বলে বাশার কেন বলা হয়েছে? কারণ বাশার আর ইনসানের মাঝে বিরাট পার্থক্যটি বর্তমান। রুম্মি, হাফিজ, জাম্মি, সানাই, খসরু, বেদম, হায়রাত, সাজ্জর, তাবিশ, বাদাযুনির পীরপূজার রহস্যটা এখানেই। তাই তাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে গেছেন, রাফতি ওয়া নেসারে বৃত্ত পারাস্তে কারদি তথা ‘মনেপ্রাণে এবং সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আপন পীরের পূজারি করেছি’। তাঁরা অন্যত্র বলেছেন, ‘পীর পারাস্তি হক পারাস্তি’ তথা ‘পীরপূজাই হলো আল্লাহর পূজা’। এই কথাগুলো ইবলিস যাদের মাঝে প্রবলভাবে বিরাজ করছে তাদের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেবে। কারণ ইবলিস কোথাও থাকে না এবং থাকার আইন কোরান-এ দেওয়া হয় নি, একমাত্র মানুষ এবং জিনের অন্তর ছাড়া। কারণ আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি তৌহিদে বাস করছে এবং সব সময় তসবিহ পাঠ করছে তথা গুণগান গাইছে। যাহা তৌহিদে বাস করে তাহাতে ইবলিসের বিচরণ করার অধিকার কোরান-এ দেওয়া হয় নি। সুতরাং ইবলিস মানুষ এবং জিনের মাঝেই মূর্তিমান। কথায় বলে, ইবলিসের যুক্তিতর্ক এবং ফতোয়া সাংঘাতিক ধারালো। এই ইবলিসের ধারালো যুক্তির তলে যাদের মাথা কাটা যাবে তারাও ইবলিসের শিষ্য তথা মুরিদ। দুনিয়াতে ইবলিসের অনুসারীর সংখ্যাই বেশি হবে॥ কোরান-এর পবিত্র বাণী ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এখন

পাঠক পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে, ওহাবি মতবাদ আর ইবলিসি মতবাদ একই সূত্রে গাঁথা। ওহাবি মতবাদে বিদ্রাণ্ডির মোহনীয় জাল বুনে রাখা হয়েছে আনুষ্ঠানিক কতগুলো প্রার্থনার লেবাসে। আর সেই জালে কত সহজ ও সরল মানুষগুলো পা রেখে ফাঁদে আটকে যাচ্ছে তার হিসাব কে রাখে?

আত্মপরিচয়ের জন্য সাধনপদ্ধতির স্বরূপ

প্রতিটি মানুষের ভেতর রবরূপে রুহ ঘুমিয়ে আছে। অণু-পুরুমাণুর চেয়েও ছোট রুহটি বীজরূপে বিরাজিত। ঠাণ্ডা-সর্দির ভাইরাস যেমন প্রতিটি মানুষের মাঝে লুকিয়ে আছে। হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতো। নবম (নয়) শক্তিতে ওষুধের অস্তিত্ব একদম নাই, অথচ শক্তি আছে। নাস্তি থেকে এর শক্তির অস্তিত্ব। বর্ণহীন এর রং। প্রকারহীন এর আকার। পরিচয়হীনতা থেকে এর পরিচিতি। অবিশ্বাসের মাঝে বিশ্বাস। নাই মনে হয়, তবুও আছে অস্তিত্বের স্বীকৃতি। মোহনীয় বিত্ত-বৈভবের চমক আর ঠগের মাঝে একা হয়ে যাবার বোবা কান্না। পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন সবাই আছে মাঝে একদিন একা চিরবিদায় নেওয়া। ধন-সম্পদের লোভ ও নেশা মাদকদ্রব্যের চেয়েও ভয়ংকর নেশা। গাধার মতো খাটুনি খাটায়। কত রকম রঙিন আশার কথা শুনিয়ে, তারপর সব আশাগুলো ধোঁকা দিয়ে একা কেবলই একটা দুনিয়া থেকে নিষ্ঠুরভাবে বিদায় নিতে হয়। সব কিছু বুঝি, বুঝি সব কিছু মায়ার প্রচণ্ড নেশা। বুঝি মাদকের নেশা

বিষপান, তবু পান করি। কত সুন্দর সুন্দর রূপের দেহ নিয়ে পৃথিবীটি সেজেগুঁজে নেচে চলছে। আর তাই দেখে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। কত জয়যাত্রা বীরবচন শুনে শুনে দেহ-মনে শিহরণ জাগে। জয়-পরাজয়কে গাজি আর শহিদের কথাটি শুনিয়ে কাছে টেনে আনতে চায়। মানুষ দলে দলে বাঁপিয়ে পড়ছে এবং পড়বে। কিন্তু অতি সামান্য অতি নগণ্য কিছু লোক মুখ ফিরিয়ে আত্মপরিচয় জানার সাধনায় ডুবে যায় এবং যাবেই এবং এরাই আল্লাহর ওলি। বাঁধন এদেরকে স্পর্শ করে, কিন্তু বেঁধে ফেলতে পারে না। কাদায় বাস করা মাছের মতো। কাদার স্পর্শ আছে, কিন্তু কাদা মাছের দেহে লেগে থাকে না। নদীতে চলমান নৌকার মতো। জলের স্পর্শ আছে। কিন্তু পেটে পানি ধারণ করে না। সুফিরা আত্মপরিচয় জানবার বারবার তাগিদ দিয়ে চলছেন। সুফিরা দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়ার হিশাবটা ছোট করার বারবার উপদেশ দিচ্ছে এই বলে যে, তুমি দশের সঙ্গে মিশে যেয়ো না, বরং দশের বাইরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে চেষ্টা করো যে, তুমি সম্পূর্ণরূপে এগারো। সম্পূর্ণরূপে আলাদা। বাড়ি-গাড়ি, বিত্ত-বৈভবের মাঝে শান্তি খোঁজার জন্য গাধার খাটুনি খাটছো। হয়তো সব কিছু পেলে। কিন্তু শান্তির পাশেই কাঁটার খোঁচা খাবার যন্ত্রণাটি সব সময় উঁকিঝুঁকি মারার বোবা শব্দটি শুনতে পাচ্ছ? তখন ভুল ভেঙে গেলেও সব কিছু ত্যাগ করে আর এগিয়ে যাবার শক্তি থাকে না। মোহমায়ার মুখে দেহ-মনটি অনেকখানি গিলে ফেলেছে। ছেলেমেয়েদের মাঝে বেঁচে থাকতে চাইছ?

কিছুদিন বেঁচেও থাকবে সন্তানদের স্বস্থিতে। তারপর? তারপর নাতিপুতিদের স্বস্থি হতে মুছে যাবে। এই ঠুনকো জীবনটা তোমাকে কিছুই দিল না এবং দেবার বিধান আল্লাহপাক রাখেন নি। যৌন সুখ আর বিষ্ঠ-বৈভবের সুখ যে কত ঠুনকো কাচের মতো তা ভেঙে গেলেই কাচের গ্লাসের টুকরোগুলো দিয়ে যে গ্লাসটি বানানো হয়েছিল তা আর বুঝবার অবকাশ থাকে না। মনগড়া ফতোয়ার বাঁধনে মনগড়া এবাদত করে চলছ? কিছু ফলটি যে বিরাট একটি শূন্য তা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে বুঝতে পারবে। মহানবির হেরা গুহার নির্জন সাধনার পনেরটি বছরের কথা হৃদয়ে একটিবার স্থান দিতে পারলে না? একটিবার কিছুদিনের জন্য নির্জন সাধনাটি করতে পারলে না? একটি বার সূরা তওবার দুই নম্বর আয়াতটির আদেশ পালন করতে পারলে না? চারটি মাস দেহের মাঝে ভ্রমণ করার কথাটি বেমানান ভুলে গিয়ে বিষ্ঠ-বৈভবের নেশায় অমরত্বের ফাঁকি-মারা প্রতারণার খপ্পরে পড়ে মৃত্যুর কাছে এতিম আর সর্বহারার মতো দাঁড়িয়ে রইলে? একপুঁয়েমি, ঘাড়মোগরামি, সব-বুঝে-গেছি, উদ্ধত অহংকারের আশ্ফালন যে শেষ পরিণতির দৃশ্যে কত নির্মম, কত নিষ্ঠুর কত বেদনাদায়ক তা হাড়ে হাড়ে টের পাবে। নিতাইগঞ্জের (নারায়ণগঞ্জ শহরের একটি অংশ) মামা রফিক ভূতের মতো পরিশ্রম করত। কোটি কোটি টাকার মালিক। মাঝে মাঝে উপদেশ দিতাম। হেসে উড়িয়ে দিত। অবশেষে ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। দেশ-বিদেশের সব চিকিৎসা শেষ। মৃত্যুর

পথযাত্রী। মাম্মা বুঝতে পারলেন। দেখা করলাম। হোমিও ডাক্তার হিসাবে অধর্মের নাম কম ছিল না। তাই শেষ চিকিৎসা চাইল। বললাম, চিকিৎসা লাগবে না, পড়া পানি খান। মাম্মা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। শিশুর মতো। বললেন, বিশ্বাস করো, ভালো হয়ে গেলে তোমার কথা মতো সাধনা করব, সুফিবাদে জীবন উৎসর্গ করব। কিন্তু তা কি আর হয়? নিয়তির অমোঘ বিধানটি যে অবধারিত। এ রকম কত দৃশ্য চিকিৎসকজীবনে দেখতে হয়েছে। মানবদেহটির অনেক রূপক নাম। একটি হলো দেহকেতাব। এই দেহকেতাবটি যতদিন আছে, মনে হবে সবই আছে। দেহকেতাব কবর অথবা শ্মশানে শেষ হয়ে যায়। কত শক্তিধর দেহকেতাবিদের কথা স্মৃতিতে মলিন হয়ে থাকে। আবার কিছুই থাকে না। সুতরাং কোরান-এর পবিত্র কালামের উপদেশটি কিছুদিনের জন্য মেনে নাও। মাত্র চার মাস দেহের মাঝে ভ্রমণ করতে চেষ্টা করো। মাত্র চারটি মাস তিন ভাগ করে চল্লিশ দিনের নির্জন সাধনাটি করে যাও। দেখতে পাবে কোরান-এর বাণী আর বু আলী শাহ কলন্ডরের সাধনপদ্ধতিটি কত বড় দ্রুত সত্য। এখানে বাকি নাই। এখানে পরে পাবার কথা নাই। এখানে ফাঁকি নাই। সাধনায় পাবার নগদ দৃশ্যটি দেখতে পাবে। এ কথাগুলিও অপ্রিয় সত্য যে, তোমাকে যতই বুঝাই না কেন, যদি তকদিরে না থাকে তা হলে আমার কথাগুলো অখাদ্য বলে মনে হবে। মনে মনে আমাকে যা-তা গালাগালি করবে। বাঘের তকদির নিয়ে যারা আসে তাদেরকে হাতির

খাবার সবজি দিলে তো রাগ করাটা একান্ত স্বাভাবিক। আমার এই পুস্তকটি বাঘের তকদির নিয়ে যারা দুনিয়াতে এসেছে তাদের জন্য লিখি নি। তারা যেন ভুল-করা খাদ্যটি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নেবে। কারণ সবজি বাঘের কাছে অখাদ্য। কিন্তু হাতির কাছে খাদ্য। হাতির সামনে বাঘের খাদ্য তুলে ধরলে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কারণ মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটাই হাতির তকদির। এতে দুঃখ পাওয়াটা সবার জন্যই বোকামি। শক্তির পূজারিকে প্রেমের বাণী শোনানো যেমন বোকামি, তেমনি প্রেমপূজারিকে শক্তির বাণী শোনানোটাও বোকামি।

শয়তান উনিশ রকম রূপ ধারণ করে। প্রতিটি রূপের মাঝে থাকে স্থূল আর সূক্ষ্ম প্রতারণার নানা কৌশল। শয়তানের যুক্তি এতই ধারালো যে, বড় বড় মাথাওয়ালারা পর্যন্ত বোকা বনে যায় এবং গেছে এবং এর দলিলও কম পাওয়া যায় না (ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি)। তা ছাড়া শয়তান যে আমারই মাঝে মিশে আছে এবং সূক্ষ্ম ধোঁকার মোহে টোপ ফেলছে তা টের পাবার উপায় সহজেই বোঝা যায় না। শক্তির পূজারিরাও পীর সাজে, গুরু বনে বসে। প্রতিটি বিষয়ে নকল, ভেজাল আর প্রতারণা। সাবধান করেও খুব একটা লাভ হয় না। চোখে আঙুল দিয়ে বোঝালেও অবুঝের মতো পা বাড়ায়। বল্লমের মাথায় কোরান-এর বাণী ঝুলিয়ে হিন্দার ছেলে মোয়াবিয়ার মতো শাস্তি চাওয়া। এটা যে সম্পূর্ণ একটা ধোঁকাবাজির স্টাইল তা বারবার মাগলা আলি বলার পরও অনেকেই বুঝতে পারেন নি। বড় বড়

ওলিদেরকে অনেকে বুঝতে পারে না। এমনকি বড়পীর গাউসুল আজম মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানিকেও অনেকেই বুঝতে না পেরে ভুল পথে পা বাড়িয়েছে। মোজাদ্দের আলফেসানিকেও। ব্রিড্জের যে তিনটি কোণ থাকে তা একজন অতি সাধারণ বিদ্বানও বুঝতে পারে। কিন্তু উনি ব্রিড্জের দুই কোণ বলাতে অনেকেই ভুল বুঝেছে এবং এই সেদিনও মরহুম ফকির চিশতি নিজামির মতো লিখকও সমালোচনা করতে সামান্য লজ্জা পান নি। এই ব্রিড্জটি কি জাগতিক ব্রিড্জ না অন্য কিছুর রহস্যময় ইশারা লুকিয়ে আছে তা স্থূল দৃষ্টিতে বিচার করে যা-তা মন্তব্য করাটা কি বোকামির পরিচয় বহন করে না? এই একইভাবে পাঞ্জাবের বাবা বুন্নে শাহ এবং সিক্কের শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই এবং দিল্লির হজরত আমির খসরুকে স্থূল দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে পদে পদে ভুল করা হবে। যারা গাউসুল আজম পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানি কুতুবে রাব্বানি গাউছে সামদানি শেখ সৈয়দ মাওলানা মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি আল হাসানি ওয়াল হোসায়নিকে শিয়াদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গালিগালাজ করেন তারা ইসলাম বিষয়ের বিরাট পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতর মোকামে অবস্থান করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ বড়পীর সাহেব বলেছেন, আমার পায়ের চিহ্ন যে ব্যক্তি মাথা পেতে না নেবে সে কখনোই ফকির হতে পারবে না, বরং হবে একটি ফক্কর। বড়পীর সাহেব বলেছেন, এই সব ফক্করদের থেকে সাবধান! কারণ এরা

সত্য পথ হতে বিপথে নিয়ে যাবে এবং গোমরাহিতে লাফালাফি শুরু করে দেবে। মনে হবে এরাই আসল ফকির, অথচ এরাই আসল ফক্কর।

জাঁদরেল সমাজতন্ত্রের নেতার সামনে হঠাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধূয়া তুলে বিদ্রোহ করেছে জাটিকে একজন প্রজ্ঞাবান নেতা। ম্যাসাচুসেটসের শিক্ষিত লম্বা চুলওয়ালা ‘বৈজ্ঞানিক’ কথাটির মাঝে জন ফস্টার ডালেস সাহেবের খুশবু লুকিয়ে থাকার রহস্যটি আমাদের কয়জনের মাথায় ঢুকবে? লেবাসে ধর্মের পোশাক, আসলে ধর্মের ধার যারা ধারে না তারা যদি তৌহিদি জনতার কথা বলে এবং যারা গরিবের রক্তশোষণ করে, এতিমের হক মেরে দিয়ে বিশাল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়ে গণবিপ্লবের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেয়, তা হলে পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে যে, কোথাও খুব বড় রকমের মারাত্মক গলদ দেখা দিয়েছে এবং এটা পরিষ্কার ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। পীর-ফকিরদের মাঝেও নকল, ডেজাল আর প্রতারণা দিয়ে দেশ ছেয়ে গেছে। আসল পীর-ফকির চিনে নেওয়াও ভীষণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবু আপনাকে খুঁজতে হবে, তবু আপনাকে পীর ধরেও বারবার পীর বদলাতে হবে। কারণ আত্মপরিচয় জানবার নিশ্চিত ফর্মুলাটি আপনাকে জেনে নিতেই হবে। কারণ সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যেমন বৈজ্ঞানিক শব্দটি লাগিয়ে চমক তৈরি করা হয়, তেমনি পীর-ফকিরের নামে ‘পীরে কামেল’ শব্দটি লাগিয়ে চমক তৈরি করা হয়। যে পীর দুনিয়ার সামান্য অধিকারটি ফেলে দিতে পারে নি, সে আবার গুলি হয় কেমন করে? একই

স্টিলের তৈরি দুটি চাকু, একটি দিয়ে অপারেশন করে মানুষ বাঁচায়, আর অপরটি দিয়ে জবেহ করে গোশত বিক্রি করে। আপনাকে খুব সাবধানে চিনে নিতে হবে কোনটা আসল, আর কোনটা নকল। গোয়েবেলস, ডালেস, লিনপিয়াও, মুয়াবিয়া, মারোয়ান, আবু সুফিয়ানদের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে অনেক সরল-সহজ মানুষে ধোঁকা খেয়েছে। এবং আজ বৃত্ত-মার্কী পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে অন্য রূপ ধরে ধরে অনেক সরল-সহজ মানুষদেরকে ধোঁকা দিয়ে চলছে এবং কতদিন এই শয়তানি খেলা চলবে জানি না। কারণ পবিত্র কোরান স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, শয়তান উনিশ রকম ধোঁকা দেবার স্টাইল জানে। সুতরাং সাবধান!

এইসব মহাশয়তান পুরুষদের মধ্যে লিনপিয়াও-এর দর্শনটি এতই মারাত্মক এবং অতি সূক্ষ্ম চিকন ধোঁকাবাজি যে, স্বয়ং মাও সে তুং-এর মতো বিশ্ব জাঁদরেল নেতাদের নেতাও ধরতে পারেন নি। লিনপিয়াও-এর দর্শনটি হলো, একজন মানুষ যতটুকু গুণের অধিকারী, তাকে যদি ধ্বংস করে দিতে চাও তো শতগুণ বাড়িয়ে ইনিয়েবিনিয়ে ভাষার চাতুর্যে প্রশংসার পর প্রশংসা করতে থাকো। আমাদের দেশের কোনো এক নেত্রীর পুত্রকে লিনপিয়াও নামক ভাইরাসে আক্রমণ করতে চাইছে, তবে বুদ্ধিমান হলে হয়তো এহেন ভাইরাস হতে নিজেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবেন বলে মনে করি। জন ফস্টার ডালেস সাহেবের দর্শনটিও মারাত্মক। অনেকটা মরীচিকার দর্শন। মনে হবে দূরে পানি, কিন্তু কাছে এলেই গরম বালু।

দর্শনটি হলো, লাল পতাকাটিকে যদি ধ্বংস করে দিতে চাও তো, তুমিও ঠিক সে রকম লাল পতাকা হাতে তুলে নাও। কোনটা আসল আর কোনটা নকল বুঝতে না পেলে জনতা হতাশায় ভুগবে। এতে আসল লাল পতাকাওয়ালা কোনোদিন ক্ষমতায় যেতে পারবে না এবং পাল্লা দিয়ে ব্যাঙ যেমন মাপা যায় না, তেমনি এদেরকে একজোটে করাও যাবে না। কারণ লাফালাফি করলে পাল্লার মানদণ্ডটিও লাফালাফি করবে। সুফিবাদকে ধ্বংস করার জন্য ওহাবিরা নানা কৌশল অবলম্বন করে। তার মধ্যে একটি হলো মারাত্মক কৌশলী সেজে এমন নিখুঁত অভিনয় করতে হবে যে, পাবলিক বুঝতেই পারবে না এবং ঝাঁকে ঝাঁকে মুরিদ হতে থাকবে। এভাবেই ওহাবি মতবাদের ডোজ আস্তে আস্তে মারতে থাকে এবং আসল সুফিদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দাও ‘বাতেল’ শব্দটি ব্যবহার করে। আমরা ছবি তুলি না কারণ ছবি তোলা হারাম, তবে পাসপোর্টের ছবি তোলা হালাল, টাকার মধ্যে আরবি বাদশাহদের ছবি হালাল; আমরা গান বাজনা করি না, কারণ গানবাজনা হারাম ইত্যাদি প্রচার করে আসল সুফিদের থেকে মনটাকে ঘুরিয়ে দাও। যদিও ডায়েস সাহেব ছিলেন ঝানু কূটনীতিবিদ। কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বের প্রশ্নে আসল দার্শনিক নিটশে, শোপেনহাওয়ার, বার্গস, বার্কলি, দেকার্তে আর হেগেল হয়তো অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন। এভাবেই নকল আসলের রূপ ধারণ করে। যুগে যুগে অনেক ধোঁকাবাজির ইতিহাস লেখা হয়েছে, কিন্তু তবুও আমরা আসল-নকল পার্থক্য করতে

পারি না এবং একটু সামান্য চেষ্টাও করি না। মাইজভাণ্ডার, সুরেশ্বর, বুরুল্লাপুরের শানাল ফকির, পণ্ডিতসারের গোলাম মাগুলানা চিশতি ওরফে শামপুরি শাহ সাহেব, দাগনভূঞার জয়লঙ্করের শাহাপীর চিশতির দরবারগুলোর পাশেই ডালেস সাহেবের নকল-মারকা পতাকায় ধর্মীয় বহু কথার বোঝা বহনকারী নকল সুফি দিয়ে দেশ ছেয়ে গেছে। শুধু সামান্য গবেষণা করলেই জীবাণুগুলো ধরা পড়ে যায়। চোখে গবেষণার মাইক্রোস্কোপটি লাগিয়ে পরিষ্কার জলে জীবাণু দেখে যেমন চমকে ওঠে, তেমনি এদেরকে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে অবশেষে মৃত্যুর কাছে দাঁড়িয়ে অতৃপ্তির চুকা পানি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। এজন্যই মহানবি বারবার আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে, আমার আসল উন্নতেরা নকল উন্নতদের এত বেশি বেশি এবাদত-বন্দেগি দেখে দেখে অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু এরা জম্মিনের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী হবে এবং এদের থেকে খুব সাবধান থাকতে হবে। (মেশকাত শরিফ)।

আমরা অবশ্যই খুব সাবধান থাকতে চেষ্টা করি। কিন্তু বর্ণচোরাদের ফেলে রাখা অদৃশ্য কলার ছোলকায় যে কত অদৃশ্য আছাড় খেয়ে চলছি, তার হিসাবটি কি কেবল তকদিরেরই কলঙ্কের লিখনে হয়ে থাকবে? হায়াত-মউত্তের মালিক একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ। এটা সবাই জানে ও বোঝে। কিন্তু পাঁচতলা হতে ইচ্ছে করে লাফ দিলে কি আল্লাহ বাঁচাবেন? না,

বাঁচাবেন না। কারণ ভালো-মন্দ যাচাই-বাছাই করার বোধশক্তিটুকু দান করা হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য। পরীক্ষা করার বিষয়টি আছে বলেই তো সমাজ, সংসার এবং ব্যক্তিজীবনে এত জটিলতার জট পাকানো হয়। বই খুলে দিলে তো আর পরীক্ষা থাকে না, বরং নকল হয়ে যায়। আল্লাহ তো ইচ্ছে করলে সব মানুষকে একই উন্মত্তে আনতে পারেন, কিন্তু তিনি দলে দলে এ জন্যই ভাগ করে রাখেন যাতে পরীক্ষার মাধ্যমে আসল-নকলের পার্থক্যটি করতে পারেন। সূরা হুদে কি এ রকম বাণী পাওয়া যায় না?

পবিত্র কোরান-এর সার্বজনীনতার সাক্ষ্য

শয়তান বিষয়টি পবিত্র কোরান-এ এত সুন্দর এবং স্পষ্ট করে বারবার তুলে ধরা হয়েছে যে, পৃথিবীর কোনো ধর্মীয় গ্রন্থে এ রকমটি আর পাওয়া যায় না। মুসলমান বলে বলছি না, বরং নিরপেক্ষ গবেষণার মাধ্যমে জানা-অজানা বহু ধর্ম বিষয়ে অধ্যয়ন করেই বলছি। শয়তানটি যে আপন আপন দেহেই অবস্থান করছে, তারই বিশদ এবং নিপুণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ একমাত্র কোরান-এই পাওয়া যায়। মানুষ মনে করে শয়তান আলাদা থাকে। এটাই মানুষের মারাত্মক ভুল। তাই শয়তান বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে সুফিবাদে প্রবেশ করার প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য মৌখিক শিক্ষা নয়, বরং প্রাকটিক্যাল শিক্ষা। এই বিষয়টি আপন পীর হতে শিখে নিতে হয়। কারণ এই বিষয়টি খুব ভালো করে জেনে রাখতে হবে যে, শয়তানের আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির

কোথাও থাকার বিধান নাই, কেবলমাত্র মানুষ এবং জিনের অন্তর ছাড়া। প্রতারণার কেন্দ্রস্থল অন্তরে। মাথায় নয়। মাথা কাজ করে আর অন্তর করায়। চিত্রপরিচালক পর্দার পেছনে থাকে আর নায়ক-নায়িকা বাহিরে থাকে। বাহিরের পরিচিতিটাকে মুখ্য মনে হবে। আসলে তা নয়। শয়তানের স্থানটি যে কেবলমাত্র মানব-অন্তর এটাই কোরান বারবার অনেক রকম ভাষার শৈলীতে বুঝিয়েছে। সুতরাং মানুষ মনে করে সে একা। আসলে একা নয়। শয়তান সঙ্গে আছে বলেই ‘উদউনা’ তথা দুইজন বলা হয়েছে। আর শয়তানকে সাধনার মাধ্যমে সরিয়ে দিতে পারলে হয় ‘উদউনি’ তথা একা। তাই সূরা মোমিনের ষাট নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, উদউনি আস্তাজেব লাকুম তথা তুমি একা ডাকো অবশ্যই জবাব পাবে। দুইজন থাকলে হাজার ডাকেও জবাব পাবে না। তথা আপন পরিচয় পাবে না। তাই বারবার নিজেকে চিনতে বলা হয়েছে। তথা তোমার ডেতর তুমি একা নও, বরং দুইজন। তথা তুমি ও খাল্লসরুপী শয়তান। এই খাল্লসরুপী শয়তানকে মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় তাড়িয়ে দিতে হয় নতুবা একা হওয়া যায় না। আর একা না হলে আল্লাহর ডাকের জবাব পাওয়া যায় না। ‘আস্তাজেব’-এর মূল শব্দটি হলো ‘আল এজাবা’ তথা সাথে সাথে জবাব দেয়া। এত ডাকাডাকি করি, কিন্তু জবাব পাবার নাম-গন্ধটিও নাই। কারণ শয়তানকে সঙ্গে নিয়ে ডাকলে ‘উদউনা’ তথা দুইজন হয়ে যায়। অথচ কোরান কেবলমাত্র একা ডাকতে বলেছে, এবং এও বলেছে যে, যদি একা ডাকতে

পারো তো সঙ্গে সঙ্গে জবাব পারে। তাই খাজা বাবা হাসান মইনুদ্দিন চিশতি বলেছেন যে, আমি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাই, আর তোমরা পাও না! তোমরাও পারে, যদি মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় হাশ্টি (শয়তান)-কে মিটিয়ে দিতে পারো। মাওলা আলি বলেছেন যে, সেই আল্লাহকে আমি কোনোদিন ডাকি নি, যে আল্লাহকে দেখি নি। সুফিবাদের এই মহামূল্যবান কথাগুলো অনেকটা বোবা চ্যালেঞ্জ, অথচ এই শয়তানের খপ্পরে পড়ে দুনিয়াটাকেই একমাত্র বিষয় বলে মনে করে নিয়েছি। এই মনগড়া মনে করাটাও শয়তানের নিপুণ ধোঁকা। সূক্ষ্ম প্রতারণা। মৃত্যুর সামান্য কিছু আগেই সব কিছু যে শয়তানের ধোঁকা, পরিষ্কার বোঝা যায়। অনেকটা ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসাবিহীন যন্ত্রণার মৃত্যুর মতো। ঝানু ডাক্তারেরা চেয়ে চেয়ে অসহায়ের মতো মৃত্যু যন্ত্রণার দৃশ্য দেখছে, অথচ করার কিছুই থাকে না। কতটুকু অসহ্য যন্ত্রণা আক্রমণ করে মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলছে, এটা একজন সুস্থ লোক কিছুতেই বুঝতে পারে না এবং পারার কথা নয়। কেবল অপরের মৃত্যুযন্ত্রণাটি দেখে বেদনা অনুভব করে। সুতরাং ক্যান্সার ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তথা যার হয় সেই বোঝা এবং অপরের বোঝার কথাও নয়। তাই আসল সুফিবাদের প্রচার কম হয়। নকল সুফিবাদের প্রচার ও ধুমধাড়ানি খুব বেশি। নকল সুফির কথায় কথায় শেরেক-বেদাতের গন্ধ পায় এবং কথায় কথায় ফতোয়া মারে। অনেকটা চোরের মায়ের গলার আওয়াজ বড় হবার মতো। আবার এটাও সত্য যে, মিথ্যা, ভেজাল, নকল

আর অঙ্ককার আছে বলেই মানুষ আলোর সন্ধান করে। কেউ পায়, কেউ পায় না। যার ডেতরের শয়তানটা যে রকম, সে রকমই আশা করতে হয়। শয়তান মনের আকাশে (পৃথিবীর আকাশে নয়, কারণ পৃথিবীর আকাশ তৌহিদে বাস করে) সাধকদেরকে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে। কিছু আল্লাহ্‌ই হেফাজত করেন। বাস্তব আকাশে শয়তান থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং আগুনের গোলা নিক্ষেপ করাটাও অবান্তর। সুফিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি ফতুহাতে মক্কী নামক কেতাবে বারবার এই কথাটিই বুঝিয়ে গেছেন যে, সাম্রাজ্যে ওয়াল আরদ্ বলতে আকাশ ও পৃথিবী কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোঝালেও মূলত মন ও দেহটিকে বোঝানো হয়েছে। হজরত আমির খসরু তো স্পষ্ট ভাষায় মন ও দেহটির কথা বোঝানোর কথাটি বলেছেন এবং সেই সঙ্গে এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন যে, সমগ্র সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে পেতে হলে আপন দেহের ডেতরেই আছে এবং পারে। মোরাকাবার ধ্যানসাধনা বিহনে কেবল এক বোঝা কথা শেখা যায়। লেখাপড়া করে অনেক কিছু জানা যায়, বোঝা যায়, কিছু দর্শনটি পাওয়া যায় না। তাই তো অনেক বিশাল বিদ্বান মানুষটিকেও অনেক সময় এত কিছুর ভালোমন্দ জানার পরও আত্মহত্যা করতে দেখি। হেমিংওয়ে সাহেব কি এমনতেমন বিদ্বান! নোবেল পুরস্কারটিও আত্মহত্যা হতে তাঁকে বাঁচাতে পারল না। কী অভূত শয়তানের প্রতারণার শক্তি। কোথা হতে কোথায় এক মুহূর্তে নামিয়ে ফেলে। যদিও আত্মহত্যা এবং আত্মহতি এক বিষয় নয়।

এটার ব্যাখ্যা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তাই বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী বারবার বলেছেন যে, আগে পথঘাট ভালো করে চিনে নাও, তারপর মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করো।

নূরে হকে হক আছে হক চিনো আগে।

এবাদত পারো যদি করো শেষ ভাগে ॥

না চিনিয়া এবাদত করিবে কাহার।

ভূতের বন্দেগি হবে, হবে না খোদার ॥

আম্মার লেখা সবার জন্য নয়। যারা কেবল আল্লাহর প্রেমিক, যারা কেবল আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে, কেবল তাদের জন্য লিখেছি। প্রেমিক ভালো করেই জানে যে এই পথে কেবল হারাতে হয়, এই পথে নিজেকে বলি দিতে দিতে অগ্রসর হতে হয়। কারণ আম্মারই মাঝে আরেক নকল আন্নি লুকিয়ে আছে। যে নকল আন্নিটি অবিশ্বাস্য ছদ্মবেশ ধারণ করে আসল আন্নিটাকে প্রতিটি মুহূর্তে ধোঁকার ফাঁদে ফেলছে, সেই নকল আন্নিটাকে তাড়াতে পারলেই সব সাধনার শেষ হয়ে যায়। তাই তো কোরান বলছে, ইয়াকিন অর্জন না করা পর্যন্ত এবাদত করো। হজরত বাবা দাউদ তায়ি বলেছেন, হাঁটতে হাঁটতে অনেক কষ্ট ও সাধনা করার পর ইয়াকিনের ঘরে প্রবেশ করতে পেরেছি। এখন আর হাঁটার প্রয়োজন নাই। বড়পীর হজরত গাউসুল আজম বলেছেন, আরিফ হবার পর আর এবাদত থাকে না। বায়েজিদ বোস্তামি বলেছেন, নকল আন্নিটার যখন আর কিছুই রইল না, তখন

আসল আশ্মি বলতে লাগল, আশ্মি সুবহানি, সব শান আম্মারই। শক্তির পূজারিদের কাছে এসব কথা বলতে গেলে গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেবার মতো অবস্থা হবে। কারণ অনেক কিছু পাবার পর এবং যা পেয়েছে তাই খেয়ে শেষ করতে পারবে না তবুও আরও চাই, আরও চাই এবং অবশেষে যে চাই চাই করছে এবং পাচ্ছে, সেই একদিন নাই হয়ে যাচ্ছে। কী অদ্ভুত নৈপুণ্যের শানদার খেলা! সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। এমনকি আশ্মি আশ্মি মানুষের শেষ সম্বল বিবেকটুকু খেয়ে পশুতে পরিণত হয়ে বসে আছে, কিছু কোনো মালুম (টের) পায় না।

মুসলমানদের পতনের মূল কারণ!

আম্মানতকে মালিকানা মনে করে মুসলমানদের পতনের শুরু হয়। আম্মানত খেয়ানতকারী হিন্দার ছেলে মোয়াবিয়া হতে এই উত্থান-পতনের ঢেউ খেলে খেলে কোথায় কোন পতনের শেষ ঠিকানায় এসে দাঁড়িয়েছি যে, জংলি মতবাদ সাম্যবাদের লেবাসে কমিউনিজমটিকে দেখতে হচ্ছে, আর স্ট্যালিনকে মহাপুরুষ হয়ে যাবার ঝানু কবিতা শুনতে হচ্ছে। এর চেয়ে সাংঘাতিক অপম্মান আর কী হতে পারে? অবশ্য এটাও সত্য যে, আসল মাম্মা মারা গেছে তাই কানা মাম্মা স্ট্যালিনের গীত শুনতে হচ্ছে। ‘ভূগোল বদলিয়ে ফেলতে হবে’, ‘এখন ফুলের খেলা নয়’, ‘ফুল থাকা না থাকায় কি

আসে যায়, বসন্ত তো আছেই’। ইত্যাদি উঁচু ঝংকারের গান শ্রবণ করতে হয়। যারা এই গানগুলো গাইছে তাদের দোষ, না যারা এই গানগুলো গাইবার সুযোগ ও ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে তাদের দোষ? বুকে হাত রেখে বিবেকটিকে প্রতারণা না করে উত্তরটি চাইতে গেলে ভীষণ লজ্জায় আপনার-আমার মাথাটি কি নীচু হতে চাইবে না? যদি বলেন, হ্যাঁ। তা হলে এটা আপনার তকদির। যদি বলেন, না। তা হলে এটাও আপনার তকদির।

কোরান বলছে, আকাশ এবং জমিনে যা কিছু আছে সবাই তসবিহ পাঠ করছে। তৌহিদে বাস করলেই তসবিহ পাঠ করা যায়। তাই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তৌহিদে বাস করছে। যাহা তৌহিদে বাস করে, শয়তানের সেখানে আসার প্রশ্নই ওঠে না। তাই শয়তানের থাকার কোনো স্থান নাই। সামান্য পরিমাণ স্থানও সৃষ্টিজগতে নাই যেখানে শয়তান থাকতে পারে। শয়তান যেখানে থাকে তৌহিদ সেখানে থাকে না। শয়তান ও তৌহিদ পাশাপাশি থাকার কোনো আইন সমগ্র কোরান-এ নাই। তাই আমরা দেখতে পাই যে, শয়তান কেবলমাত্র দুইটি স্থানে থাকে এবং থাকার অনুমতি আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয়েছে। সেই স্থান দুটোর নাম হলো জিনের অন্তর এবং মানুষের অন্তর। এই দুইটি অন্তর ছাড়া শয়তান আর কোথাও থাকার অনুমতি পায় নি। তাই আমাদেরকে সব সময় একটি কথা বারবার মনে রাখতে হবে যে, শয়তানের থাকার একমাত্র স্থানটি হলো মানুষের অন্তর। আমার, আপনার

এবং সব মানুষের অন্তরেই কেবল শয়তান থাকতে পারে। অন্য কোথাও নয়। প্রতিটি বিষয় ভালো করে জানতে হলে যেমন সেই বিষয়ের কিছু মূলসূত্র থাকে এবং মূলসূত্রগুলো মেনেই অগ্রসর হতে হয়, ঠিক তেমনি শয়তান বিষয়টি ভালো করে জানবার আগে প্রথমেই মেনে নিতে হবে যে, শয়তান কেবলমাত্র মানুষ এবং জিনের অন্তরেই থাকে। অন্য কোথাও শয়তানের থাকার স্থান নাই। এই প্রধান মূলসূত্রটিকে অবহেলা করলে শয়তান বিষয়টির পরিষ্কার ধারণা হারিয়ে যেতে পারে। কারণ শয়তান মানুষের অন্তরে থেকেই মূলসূত্রটির বিষয়ে চিকন ধোঁকা দিতে পারে। যখন আমার অন্তরটিকে বাদ দিয়ে শয়তানকে অন্য কোথাও খোঁজার ধারণা জন্মাতে থাকবে তখনই বুঝতে হবে যে, শয়তান চিকন ধোঁকা দিয়ে চলছে এবং ধোঁকার ফাঁদে পা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শয়তান দুই প্রকার : রূপক শয়তান এবং আসল শয়তান। রূপক শয়তানটিকে আসল শয়তান মনে করলে বিরাট ভুল করা হবে। কারণ রূপক শয়তান না থাকলে আসল শয়তানের ধারণা করা কষ্টকর। ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে তাই আসলকে চেনার জন্য রূপকটিকে খাড়া করা হয়েছে। রূপক আসলের ধারণা দেয়। মূর্তের কাজটি হলো বিমূর্তকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। মক্কায যে তিনটি পাথর দিয়ে বানানো শয়তান আছে উহা নিছক রূপক শয়তান : বড় শয়তান, মেজ শয়তান এবং ছোট শয়তান। প্রতিটি শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মারার বিধান তৈরি করা হয়েছে। রূপক শয়তানকে রূপক পাথর মারার

মধ্য দিয়ে আসল শয়তানকে কেমন করে আসল পাথর মারতে হবে সেই বিষয়টিকে মনে করিয়ে দেওয়া। মক্কায় অবস্থিত এই তিনটি রূপক শয়তানকে শয়তান মেনে নেওয়াটাকে বলে শরিয়ত। এই শরিয়তি তিনটি শয়তানকে অস্বীকার করলে শরিয়তের একটি অংশকে অস্বীকার করা হয়। সালেক ওলি শরিয়ত মেনে নেয়, কিন্তু যাঁরা মজ্জুব ওলি এবং কলন্দরিয়া তরিকার অনুসারী তাঁরা রূপকটিকে মেনে নেন না। কলন্দরিয়া তরিকার অনুসারীরা বলেন যে, রূপক মেনে নিলে অনেক সময় রূপকের ঠাসাঠাসিতে আসলটি যে হারিয়ে যায়। কারণ দেখা যায়, রূপকের ছড়াছড়ি-মাখামাখি এত বেশি হয় যে, আসল বলে যে কিছু একটা আছে তা আর মনে করিয়ে দিলেও মনে রাখতে চায় না। এবং তখনই ওহাবি মতবাদের জন্ম হয়। কারণ ওহাবিরা রূপক মানে, আসল মানে না। ওহাবিরা কাঠের বানানো ঠ্যাং টিকেই আসল ঠ্যাং বলে এবং কাঠের বানানো ঠ্যাংটিকেই আসল ঠ্যাং বলে প্রচার করে। অতি হালকা এবং বাহিরটিকে নিয়েই মেতে থাকে এবং রূপকের সঙ্গে যে আসলটি আছে এটা মেনে নেয় না। তাই ওহাবি মতবাদ গভীরে প্রবেশ করে না। এবং গভীরে যারা প্রবেশ করতে চায়, তাদেরকে গালিগালাজ করে। শয়তান যে কেবলমাত্র জিন আর মানুষের অন্তর ছাড়া আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের কোথাও থাকে না এবং থাকতে পারে না এবং থাকার কোনো প্রকার আইন রাখা হয় নি, এই অতি সামান্য কথাটুকু অনেকেই বুঝতে পারে না। এই

সামান্য প্রাথমিক মূলসূত্রটি বুঝতে না পেরে যারা ইসলামের গবেষক হয়ে যান, তাদেরকে বলার কী-বা থাকতে পারে? যে-পাথর দিয়ে মক্কার তিনটি রূপক শয়তান বানানো হয়েছে, সেই পাথর খণ্ডগুলোও তৌহিদে বাস করে এবং তসবিহ পাঠ করে। কারণ পাথর শয়তান নয়। আসল শয়তানটিকে বুঝিয়ে দেবার জন্য এবং আসল শয়তানটিকে কেমন করে চেনা যাবে, জানা যাবে, তারই জন্য এই রূপক শয়তান। রূপক শয়তানটিকে পাথর ছুঁড়ে মারার পর পাথরের জুতাস্যাঙেল পর্যন্ত মারতে দেখা যায় এবং রূপক শয়তানটিকে পাথর মারার জন্য এমন ছড়াছড়ি ধাক্কা শুরু হয়ে যায় যে, প্রতি বছর বেশ কিছু মানুষের পাথরের তলায় পিষ্ট হয়ে মারা যাবার খবরটি খবরের কাগজে দুঃখভরা মন দিয়ে পড়তে হয়। অথচ মক্কায় অবস্থিত এই তিনটি শয়তান নিছক রূপক শয়তান। আসল শয়তানটি যে প্রতিটি মানুষের অন্তরে বহাল তবীয়তে বাস করছে। অন্তরের শয়তানটিকে কেমন করে তাড়াতে হবে, কেমন করে আসল পাথর ছুঁড়ে মারতে হবে, কেমন করে দুর্বল করে তুলতে হবে সেই প্রেসক্রিপশন (ব্যবস্থাপত্র)-টি যাঁরা দেবার যোগ্যতা রাখেন, তাঁরাই শুরু। তাঁরাই পীর। তাঁরাই মুরশিদ। আনুষ্ঠানিকতার ছড়াছড়ি দিয়ে নয়, লোক-দেখানো এবাদত-বন্দেগি দিয়ে নয়, বরং কামেল পীরের সন্ধান করে। তা যত সময়ই লাগুক না কেন এবং যত কষ্টই হোক না কেন। সেই কামেল পীর পাবার পর সেই কামেল পীরের মুরিদ হয়ে কেমন করে সালাত, জিকির আর মোরাকাবা করতে

হবে সেই বিষয়গুলো জেনে নিয়ে সাধনা করতে হবে। তা না করে কেবল অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে মারলে কোনো ফল পাবার আশা করা যায় না। ওহাবি শাস্ত্রজ্ঞরা অনেক সময় বলে থাকে যে, কোরান-হাদিসই তো যথেষ্ট, আবার পীর-ফকিরের কী প্রয়োজন? কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগবে। আমরা এবং আপনার অন্তরে শয়তান আছে বলেই ভালো লাগবে। শয়তান কোনো মাধ্যম মানে না। যদিও আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন মাধ্যমটিকে মেনে নিয়েছেন। আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র কোরান প্রথমে রুহুল আমিনকে দিলেন এবং রুহুল আমিন মহানবিকে দিলেন এবং মহানবির পবিত্র তাঁট মোবারক হতে আমরা কোরান পাই। সুতরাং আল্লাহপাক যে মাধ্যম মানেন, ইহাই তাঁর জুলন্ত প্রমাণ। শয়তান আদমকে সেজদা করে না। শয়তান ওয়াহেদ আল্লাহ মানে, কিন্তু আহাদ আল্লাহকে মানে না, মানতে পারে না। আদমের ডেতর যে রুহটি নুরে মোহাম্মদি-রূপে বিরাজমান সেটা শয়তান মেনে নিতে পারে নি। কামেল পীরের প্রয়োজনের কথাটি ওহাবিরা অস্বীকার করে কোরান-হাদিসের দোহাই দিয়ে। অতি সাধারণ একটি প্রশ্ন করা যায় যে, উচ্চ শিক্ষার জন্য বইগুলোই তো যথেষ্ট আবার শিক্ষক এবং প্রফেসরের কী প্রয়োজন? যে কোনো প্রকার জ্ঞান অর্জন করতে গেলে শিক্ষকের প্রয়োজন হয়॥ তা সেই জ্ঞান বৈষয়িকই হোক, আর আধ্যাত্মিক জ্ঞান হোক। শিক্ষকের উসিলা ছাড়া, শিক্ষককে মাধ্যমরূপে মেনে না নিলে, যে কোনো ধরনের জ্ঞান অর্জন করাটা প্রায় ক্রেত্রেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

অবশ্য যত সুন্দর করেই বোঝানো হোক না কেন, তকদিরে না থাকলে বোঝালেও বুঝতে চাইবে না। এটাসেটা বলে আমতা আমতা করে পালিয়ে যাবে। তাই এই ধরনের লোকদেরকে বোঝানো সম্ভবপর নয়। কারণ হেদায়েতের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন। তা ছাড়া আর একটি কথা বলতে চাই যে, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি (যদিও ইমাম গাজ্জালি একশত খণ্ডে কোরান-এর বিশাল তফসিরটি রচনা করেছিলেন এবং এত বড় কোরান-এর তফসিরটি আজও কেউ করতে পারেন নি। যদিও সেই বিশাল কোরান-এর তফসিরটি সেলজুকি রাজা দ্বিতীয় মোহাম্মদ প্রকাশ্যে সবার সামনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আশা করি এই বিষয়টি সবারই কমবেশি জানা থাকার কথা), মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (ই. বি. ব্রাউন এবং রেয়ড নিকলসন একবাক্যে স্বীকার করেছেন এবং জগৎকে এই বলে ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এত উঁচু মাপের মাওলানা ইসলামের ইতিহাসে আর হয় নাই, হয় না এবং ভবিষ্যতে হবেও না), হাফিজ সিরাজি, আল্লামা আবদুর রহমান জামি, আহমদ রেফায়ি, বড়পীর সাহেব, খাজা বাবা মঈনুদ্দিন চিশতি, জুনায়েদ বোগদাদি, জুননুন মিসরি, মারুফ কুরি, মুফতি-এ আজম মাওলানা হারেভারেই, ইমামুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামির মতো অনেক পীর-মুরশিদের কি কোরান-হাদিসের জ্ঞান অনেক বেশি ছিল না? কিন্তু তাঁরা কেন পীরের হাতে মুরিদ হয়ে সালাত, জিকির এবং মোরাকাবা করতে গেলেন?

তুলি খাঁর ছেলে চেঙ্গিস খাঁর নাতি হালাকু খাঁ বাগদাদে এত ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সময় এত বড় বড় ইসলাম গবেষকরা কিছু করা তো দূরে থাক, অঘোরে প্রাণ হারাতে হলো। আর সবার চোখের আড়ালে থাকা পীর বাবা খাজা আবু ইয়াকুব এবং তাঁর প্রধান মুরিদ ও খলিফা পীর বাবা খাজা নুর মোহাম্মদ দারবন্দির কাছে সামান্য কিছু সময় অবস্থান করে নিজের ধর্মটি পর্যন্ত ত্যাগ করে কলেমা পড়ে হালাকু খাঁ মুসলমান হয়ে গেল। এটা কি সামান্য ব্যাপার বা ঘটনা বলে এক চুটকিতে উড়িয়ে দিতে চান? অন্তরে শয়তানটির অবস্থান প্রবল হলে তো তা উড়িয়ে দিতে চাইলে অবাক হবার কিছু নাই। কারণ শয়তান পীর-মুরশিদ কখনোই মানে না, বরং পীর-মুরশিদের নামটি শুনলে ঘণায় শয়তানের শরীর রি রি করে ওঠে। শয়তান যার অন্তরে প্রবল শক্তি ধারণ করে বসে আছে সেই মানুষটিরও পীর-মুরশিদের নাম শুনলে ঘণায় সমস্ত শরীর রি রি করে উঠবে এবং সেই মানুষটির পক্ষে মেনে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, সে বাহিরের শয়তানটিকে মানে এবং অন্তরে শয়তানের অবস্থানটিকে অস্বীকার করে। বাহিরের শয়তান তিনটিকে পাথর ছুঁড়ে মারতে সে বেইশ, কিন্তু নিজের অন্তরের ভেতর যে শয়তানটি বসে মিটিমিটি হাসছে সেই বিষয়ে সামান্যতম ইঁশটিও নাই। তাই বলছি, যখন আচার-অনুষ্ঠান আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে তখন সেই আচার-অনুষ্ঠানগুলো কেবলমাত্র আলংকারিক হয়ে ওঠে। একটি মানুষ আল্লাহকে পাবার সাধনায় জীবন-মরণ বাজি রেখে

অগ্নিসর হতে থাকে এবং আল্লাহর রহমত যখন সেই সাধকের উপর বর্ষিত হতে থাকে তখন সেই সাধকের চোখ দুটো আল্লাহর চোখে পরিণত হয়, হাত দুটো আল্লাহর হাতে পরিণত হয় এবং সেই হাত দিয়ে আল্লাহ কাজ করেন, জিহ্বা আল্লাহর হয়ে যায় এবং সেই জিহ্বা দিয়ে আল্লাহ কথা বলেন॥ এভাবে সাধকের প্রতিটি অঙ্গ আল্লাহর হয়ে যায় এবং এই রকম অবস্থায় সাধক যখন উপনীত হন, তখন সেই সাধককে অনেক রকম নামে ডাকা হয়। যেমন জাম্মাল, সারাপা, রিন্ধি, বান্দা নেওয়াজ, ওয়াজহুল্লাহ এবং হিন্দুরা বলেন নর নারায়ণ, নররূপী নারায়ণ ইত্যাদি। আবার পরক্ৰমে একটি মানুষ যখন শয়তানের খপ্পরে পড়ে যায় এবং শয়তানকে অনুকরণ ও অনুসরণ করতে থাকে তখন আশ্চে আশ্চে পরিপূর্ণ শয়তানে পরিণত হয়ে যায়। তখন সেই মানুষটির চোখ শয়তানের চোখে পরিণত হয়। কারণ সমস্ত হৃদয়-মন জুড়ে শয়তান বসে থাকে। শয়তান খুবই চালাক-চতুর তাই শয়তান কখনোই ঘোষণা করবে না যে, ‘আনাশ শয়তান’ তথা আমি শয়তান। কারণ এতে শয়তানের শয়তানি করার মণ্ডকা দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধকের হৃদয়-মন জুড়ে আল্লাহ যখন রবরূপ ধারণ করে প্রকাশিত হন, তখন সাধক ‘আনাল হক’ বলেন। কিন্তু শয়তান একটি মানষের হৃদয়-মন যখন সম্পূর্ণ আশ্চে আশ্চে খেয়ে ফেলে এবং আপন মূর্তিতে মূর্ত হয়ে ওঠে, তখন কিছু ভুলেও একবার ‘আনাশ শয়তান’ তথা আমিই শয়তান বলবে না। এটাই শয়তানের চালাকি, প্রতারণা, নীতি এবং ধর্ম। তাই সাধকেরা

বলে থাকেন যে, শয়তান তার আপন রূপে একইভাবে চল্লিশ বছর অবস্থান করতে পারে, কিন্তু সাধক প্রতি বছরে নব নব রূপ ধারণ করেন। শয়তানের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে সেই মানুষটির জিহ্বা শয়তানে পরিণত হয় এবং সেই জিহ্বা দিয়ে যা কিছু বলে শয়তানই বলে। কিন্তু শয়তান এতই ভয়ংকর চালাক যে, সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক বড় বড় মাথাওয়ালাদেরকে ঘোলপানি হরদম পান করাচ্ছে। বুঝতেই পারে না যে, এই কথাগুলো সাধকের পবিত্র বাণী নয়, বরং শয়তানের পচা বচন। শুনতে কতই না মধুর লাগছে। আসলে একদম পচা বচন। বড় বড় বিদ্বানেরা বুঝতেই পারেন না যে, মানুষ ছাড়া অন্য কোথাও শয়তান থাকতেই পারে না, থাকার কোনো দলিল নাই। বিদ্বানেরা বারবার একথাটি মনে রাখে সত্যি, কিন্তু আসল জায়গায় এসে মনের অজান্তে শয়তানের গোপন চালবাজিতে সব কিছু ভুলে যায় এবং শয়তানটিকে দেবতা মনে করে ফেলে। শয়তানটিকে দেবতা মনে করার কৌশলটি শয়তানের জানা আছে বলেই বারবার হোঁচট খেতে হয়। অবশ্য তকদিরের অবশ্যস্তাবী নাচনটি জন্মের আগেই লিখা হয়ে আছে। তাই সাধকেরা বলেন, কর্ম করে যাও, কর্মফল কী হবে তা দেখতে যেয় না। তাই এই কথাটি বললে খুব একটা বেশি বলা হবে না যে, মানুষ ছাড়া শয়তান পাওয়া যায় না এবং মানুষ ছাড়া শয়তানের কোনো দলিল নাই। আবার ঠিক উল্টো করে বললেও খুব একটা বেশি বলা হবে না যে, মানুষ ছাড়া আল্লাহ পাওয়া যায় না এবং মানুষ ছাড়া আল্লাহর কোনো দলিল

নাই। তাই মাওলা আলি বারবার বলেছেন, যে আল্লাহকে আলি দেখেন না সেই আল্লাহকে আলি ডাকেন না। মোজাদ্দের আলফেসানি বারবার তাঁর মুরিদদেরকে মোরাকাবার সাধনা করার পূর্বে বলেছেন, পীরে তাসত আউয়াল মাবুদ তাসত তথা তোমার পীরই হলো তোমার প্রথম মাবুদ। কারণ প্রথম মাবুদ এ জন্যই বলা হয়েছে, আপন পীর মাত্র তিনটি ঘরে তথা মোকামে তথা স্তরে তথা স্টেজে অবস্থান করেন। তারপর চার নম্বর মোকামে আর পীরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ চার নম্বর মোকামে যখন সাধক অবস্থান করেন, তখন দেখতে পান যে, আপন পীর বাবা ডান দিক দিখে চলে যান এবং শয়তান বাম দিক দিখে পালিয়ে যায়। কারণ লাহত মোকামে আপন পীরও থাকে না এবং শয়তানটিও থাকে না। সাধক আপনার ভেতর চেয়ে দেখেন যে, আমাদের পীরও আমি এবং আমার মুরিদও আমি। এখানেই তৌহিদ-এর আগ পর্যন্ত শেরেকে অবস্থান। সুতরাং পীর ধরাও শেরেক। কারণ তখনও আমি এবং তুমি আছে। অথচ পীর ধরাটাই শেষ শেরেক। এর আগে প্রতিটি মানুষ শেরেকে ডুবে থাকে, যদিও তৌহিদে থাকার ঘোষণাটি দেয়। এই ঘোষণাটিতেও শয়তানের চালবাজি থাকে, যা বড় বড় বিদ্বানেরা মালুমই (টের) পায় না। কথার বস্তা মাথায় চেপে এই রহস্যের আগামাথা কিছুই বোঝা যাবে না। কেবলই কথার নাগর আলি, সাগর আলি হয়ে সমাজে বাহবা পাওয়া যায় এবং নিজেকে খুব বড় একটা কিছু হয়ে গেছি বলে মনে মনে আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়। তাই সাধকেরা

বারবার বলেন যে, মোরাকাবার ধ্যানসাধনা ছাড়া আসল বিষয়টির কিছুই বোঝা যায় না। কারণ মোরাকাবার ধ্যানসাধনার দ্বারাই আপনার ভিতরের শয়তানটিকে তাড়াতে হয়। তাও আবার শয়তান আঁঠার মতো লেগে থাকে। সাধক মোরাকাবার সাধনার দ্বারা যখন মালাকুত মোকামে যায়, তখনও শয়তানটিকে আপনার মাঝে দুর্বলরূপে দেখতে পায় এবং অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর সাধক আবার মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং জাবরুত নামক মোকামে অবস্থান গ্রহণ করে অবাক হয়ে দেখতে পান যে, শয়তান আপনার মাঝে এখনও অবস্থান করছে, তবে খুবই দুর্বল, খুবই অসুস্থ অবস্থায় শয়তান অবস্থান করছে। তারপর সাধক আবার মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় কিছুদিন কাটিয়ে দেবার পর দেখতে পান যে, তিনি লাহুত নামক মোকামে অবস্থান করছেন এবং অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখেন যে, আপনার ভেতরের শয়তানটি চিরতরে পালিয়ে গেছে। শয়তানের নামনিশানাটাও নাই। তারপর আরও বেশি অবাক হয়ে যান সাধক যখন দেখতে পান যে, আপনার পীর এতদিন একটানা যঁার ধ্যানসাধনা করেছি, সেই পীরও আর নাই। এখন কেবলই আমি আর আমি, যেদিকে তাকাই কেবলই আমাকেই দেখতে পাই। দুই আর দেখতে পাই না। তখনই সাধক বলে ফেলেন, আনাল হক— আমিই একমাত্র সত্য; অনা সুবহানি মা আজ্জামুশানি— আমি সুবহানি, শান কেবল আমারই; লাইসা ফী জুব্বাতে সেওয়া আল্লাতাল্লা—

এই জুকার ডেতর আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নাই; জাম্মালে খুদ জাম্মালে
 ইয়ারে দিদাম আমার পীরও আমি আবার আমার মুরিদও আমি; পীরের
 সুরতে নবিকে দেখলাম ওটা নবি নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ; বাশাকলে
 শায়েখে দিদাম মোস্তফারা, না দিদাম মোস্তফারা বালকে খোদারা এবং
 অবশেষে হাজা হাবিবুল্লাহ, মাতা ফি হব্বুল্লাহ, শাহেনশাহে ওলি,
 আফতাবে ওলি, সুলতানুল হিন্দ, হিন্দাল ওলি, আতায়ে রসুল ইয়া বাবা
 সাইয়েদ মাওলানা মঈনুদ্দিন হাসান সাঞ্জারি আল হোসায়েনি ওয়াল
 হাসানির পবিত্র বাণীটি তুলে ধরলাম : ই-মানাম ইয়ারাম কে আন্ধার নুরে
 হক ফানী শুদাম, মাত্লায়ে আনোয়ারে জাতে সুবহানি শুদাম তথা 'আমার
 ডেতর আমার বন্ধুটির নুরে হকে ফানা হয়ে গেছি, তাই যে নুরের বিকিরণ
 হচ্ছে সেই নুর কেবলমাত্র সোবহানির।' [ইউরোপের এক প্রখ্যাত
 সুফিবাদের গবেষক অকপটে তার লিখনীতে প্রকাশ করে গেছেন যে
 ভারতবর্ষে আজ হতে প্রায় আট শত বছর পূর্বে চার কোটি মানুষ বাস
 করতেন। তখন ভারতবর্ষে প্রধান চারটি ধর্মের অনুসারী ছিল। সেই চারটি
 ধর্মের নাম হলো জৈন ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, পার্সিধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম। খাজা বাবা
 প্রচার করে নব্বই লক্ষ মানুষকে মুসলমান বানিয়েছিলেন। যদি খাজা বাবা
 বলতেন, আমিই সব, আমাকে অনুকরণ-অনুসরণ করবে, তা হলে আজ
 ভারতবর্ষের মুসলমানেরা খাজা বাবার নামটি ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করে
 নিতে পারতেন কিনা সন্দেহ। অথচ অবাক হবার কথা হলো যে, তিনি

নব্বই লক্ষ নব্য মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যে বলে দিলেন যে, আমি কেবলমাত্র মহানবির একজন নগণ্য গোলাম। ফারসি ভাষায় হুবহু তুলে ধরলাম : বারদ্বার গাহিশ গাদায়েম সুলতানে মা মোহাম্মদ । ইসলামের ইতিহাসে এত বিধর্মীকে মুসলমান বানাবার দৃষ্টান্তটি আর নাই। ইহা যদিও অপ্রিয়, কিন্তু সত্য কথা। ওহাবিদের চাপে এবং ব্যাপক প্রচারে খাজা বাবার মূল্যায়ন দিনে দিনে কিছুটা স্তান হয়েছে বৈকি! কারণ সুফিবাদের ভাণ্ডারটি যে ফারসি ভাষায় রচিত সেই ফারসি ভাষাটিকে মুসলিম দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে। আজ দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে চাই যে, ভারতবর্ষের মুসলমানদের কৃতজ্ঞতা খাজা বাবার উপর কতটুকু তা প্রত্যেকের বিবেককে প্রশ্ন করে দেখুন।] এখানেই সাধক নিজেকে চিনতে পারেন, রবকে চেনা হয়ে গেছে বলেন (অতীতকাল)। এখানেই বান্ধাও নাই, আঁকাও নাই। এখানেই গোলামও নাই, মাওলাও নাই। এখানেই নিজের সেজদা নিজেই করেন। এখানেই সাধক বান্ধা নেওয়াজ। এখানেই সাধক আরিফ বিল্লাহ। এখানেই প্রতিটি সাধক গাউসুল আজম। (অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাবে এই গাউসুল আজমের রহস্যটি বুঝতে পারেন না)। এখানেই সাধক মাওলাউল আলা। এখানেই সাধকের চরম ও পরম পাওয়া। এখানেই সাধকের আপন রব বিশ্ববের সুরতে ধরা দেয়। এখানেই ‘নাই কোনো ইলাহ একমাত্র ইলাহ ব্যতীত প্রশংসিত আল্লাহর রসুল ছাড়া’ কথাটির রহস্য পরিপূর্ণরূপে ধরা পড়ে। এখানেই

সাধক দেখতে পান, ‘সব প্রদীপে একই আলো।’ এখানেই সাধক দেখতে পান, বহু প্রদীপের আলো জ্বলছে, কিন্তু এই বহু আলো একই আলো।

আপন প্রবৃত্তির বৃত্তে শয়তানের একমাত্র থাকার স্থান। এই বিষয়টিকে বাদ দিয়ে এবং এই বিষয়টির প্রাধান্য না দিয়ে ধর্মীয় গবেষণা কেমন করে চলতে পারে তা মোটেও বুঝতে পারি না। শয়তান যেমন খান্নাসরূপ ধারণ করে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে অবস্থান করছে, ঠিক আবার আল্লাহও রূহরূপে প্রতিটি মানুষের মাঝে আছেন। সুতরাং সত্য কথাটি বলতে কি, একটি মানুষের মাঝে রূহ, নফস এবং খান্নাসরূপী শয়তান। মোট তিনজন বাস করে। রূহকে মোরাকাবার দায়েমি সালাতের মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে হয়। কেননা মহানবি বারবার বলেছেন, সালাতুদ দাওয়ামি আফজালুম মিনাস সালাতিল ওয়াক্তি অর্থাৎ সার্বক্ষণিক নামাজ ওয়াক্তিয়া নামাজের চেয়ে উত্তম। কিন্তু শয়তানকে জাগিয়ে তুলতে হয় না, কারণ শয়তান সব সময় ধোঁকা দেবার জন্য জেগেই থাকে। অনেকটা জমিনে ধান-গম রোপণ করার পর দেখা যায় আগাছাগুলো আপনি গজিয়ে উঠেছে। কারণ কৃষক আগাছা রোপণ করেন না, আগাছা আপনিই গজায়। ঠিক সে রকম, আগাছার মতো, শয়তানকে জাগাতে হয় না। মক্কায় তিনটি শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মারতে হয়, কিন্তু ইহা মোটেই শয়তান নয়, বরং একদম রূপক শয়তান। প্রতীকী শয়তান। প্রতীকী রূপক শয়তানটিকে আসল শয়তান মনে করলে বিরাট ভুল করা হবে। কারণ এই রূপক শয়তানটিকে এ জন্যই রাখা

হয়েছে যেন আসল ও প্রকৃত শয়তানটির ধারণা জন্মাতে পারে। কারণ আসল শয়তান মানব অন্তরে থাকে, মক্কায়ে থাকে না। মক্কায়ে অবস্থিত পবিত্র কাবাঘরটি অবশ্যই আল্লাহর ঘর। কিন্তু প্রতিটি মানুষের দিল-কাবাঘরটিও আছে এবং মোমিনের দিলই হলো জ্যান্ত কাবাঘর। (এই বিষয়টি কোরান-হাদিসের দলিল দিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ কেবলা ও নামাজ বইটি রচনা করেছেন বাংলার বিখ্যাত ইসলাম গবেষক শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি। তাই পাঠকদের অনুরোধ করছি বইটি পড়তে)। কারণ মোরাকাবার সাধনায় দায়েমি সালাতে ডুবে থেকে আল্লাহর বিশেষ রহমতে দিলটিকে জ্যান্ত কাবায় পরিণত করা যায়। যিনি তার দিল-কাবাকে জ্যান্ত কাবাতে পরিণত করতে পেরেছেন তার কাছে মুরিদ হয়ে কেমন করে আপন দিল-কাবাকে জ্যান্ত কাবায় পরিণত করা যায় সেই চেষ্টা করে যেতে হবে। মোমিনের জ্যান্ত দিল-কাবার জ্যান্ত তোয়াফ কেমন করে করতে হবে সেটা মোমিনই শিখিয়ে দেবেন। (একটি সত্য কথা বলতে চাই। বলতে চাই, কিছুটা ঢাকনা দিয়ে, কিছুটা গোপন করে, কিছুটা ইঙ্গিত-ইশারায় যে, আগের দিনের ওলি-আল্লাহদের নামের আগে আলহাজ্জ শব্দটি থাকত না। যেমন আলহাজ্জ বু আলি শাহ কলন্দর, আলহাজ্জ নিজাম উদ্দিন আউলিয়া, আলহাজ্জ হজরত আমির খসরু, আলহাজ্জ বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর, আলহাজ্জ বাবা আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরি। জ্ঞানীজন আমাদের এই ইঙ্গিত-ইশারাটি সহজেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু মডার্ন যুগের

হাওয়া-বাতাসে মডার্ন যুগের আউলিয়াদের নামের আগে আলহাজ্জ শব্দটি দেখতে পাই। অধম লেখকের পীর ও মুরশিদ কেবলমাত্র কাবা মাওলানা শাহ জালাল নূরী অফি আনহুও মক্কায় গিয়ে পবিত্র হজ্জ কার্যটি পালন করেছেন এবং তিনিও নামের আগে আলহাজ্জ শব্দটি ব্যবহার করতেন এবং আমি অধম লিখক পীর বাবার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতাম। পীর বাবাকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারতাম এবং হয়তো তিনি উত্তরটি নাও দিতে পারতেন। কিন্তু প্রশ্ন করি নাই। কারণ ‘সেজদা ভি কারে শেকোয়া ভি কারে বান্দে কা ইয়ে দাস্তুর নাহি হ্যায়’ অর্থাৎ ‘আপনাকে সেজদাও করব আবার প্রশ্নও করব এটা মুরিদের লক্ষণ নয়’। অথচ অধম লেখকের দাদা পীর শাহ সুফি গাউসুল আজম মাওলানা নূরী চান শাহ এই সেদিন পর্দা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর নামের আগে আলহাজ্জ শব্দটি নাই। অধম লেখকের বড় বাবা মাওলাউল আলা গাউসুল আজম, বাংলার মাহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি বলে যিনি সুপরিচিত (দৈনিক যুগান্তর), বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর নামের আগেও আলহাজ্জ শব্দটি নাই এবং বাবা সুরেশ্বরীর পীর রসুলে নোমা, রতবায়ে আলা, বান্দা নেওয়াজ বাবা শাহ সুফি ফতেহ আলি শাহের নামের আগেও আলহাজ্জ শব্দটি নাই)।

আদম ও মানুষের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা

একেক মোম্বিনের নিয়ম-কানুন একেইক রকম হতে পারে, কিন্তু পরম্বে গমন করার পক্ষে সবাই একমত। সুতরাং ইসলামের প্রতিটি বিষয়ের একটি বাহিরের দিক আছে এবং অপরটি ভেতরের দিক আছে। (মানবদেহেও আমরা দেখতে পাই, কিছুটা বাহিরের দিক আছে আবার কিছুটা ভেতরের দিক আছে। মানবদেহের ভেতরের দিকটি দেখতে হলে এক্সরে, এন্ডোসকপি, আলট্রাসোনোগ্রাম, সিটি স্ক্যানিং ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে দেখতে হবে)।

শয়তান বাহির নিয়ে থাকার পরামর্শ দেবে এবং ভেতর বলে কিছু নাই বলে, একদম ফাকী বলে অনেক প্রকার ধারালো যুক্তি প্রদর্শন করাবে।

মোম্বিনের জীবন্ত দিল-কাবাটি গোপন রহস্যে ভরপুর। এই ভেদরহস্য আদমের মাঝে ছিল বলেই আল্লাহ আজাজিলকে আনুগত্যের সেজদা দিতে বলেছিলেন। কিন্তু আজাজিল কিছুতেই ধারণা করতে পারে নি এবং গোপন ভেদ রহস্য বুঝতে পারে নি এবং আদমের ভেতর আল্লাহ স্বয়ং কেমন করে নুরে মোহাম্মদি রূপে বিরাজ করছেন এটা বুঝে উঠতে পারে নি। আদম সুরতের ভেতর আল্লাহ আহাদ-রূপে বিরাজ করছেন এই রহস্যটুকু আজাজিলের জানা ছিল না। আজাজিল আল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমানরূপে ধারণা করেছে, কিন্তু আল্লাহ যে সর্ববিষয়ে শক্তিমান তথা সর্বশক্তিমান এই ধারণাটুকু করতে পারে নি। তাই আহাদ-আল্লাহর আনুগত্যের সেজদাটি দিতে অস্বীকার করেছিল। আরও অবাক হবার কথাটি হলো যে,

আজাজিল ওয়াহেদ-আল্লাহর আনুগত্যের সেজদাটিকে অস্বীকার করে না। তাই আল্লাহ বলেছেন, আদমকে আল্লাহর সুরতে বানানো হয়েছে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো আর সেই বিষয়টির আলোচনা করতে গিয়ে প্রায়ই ভুল করি। আর সেটা হলো, প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর সুরতে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর সুরতে বানানো হয় নি। কারণ তা হলে আল্লাহকে বলতে হতো, খালাকাল্লাহ ইনসানা আলা সুরাতিহী। কিন্তু আল্লাহ ইনসান শব্দটি ব্যবহার না করে আদম শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইনসান আর আদমের মাঝে পার্থক্য আছে। ইনসান নবি নয়, কিন্তু আদম নবি। ইনসান শফিউল্লাহ নয়, কিন্তু আদম শফিউল্লাহ। ইনসান রসুল নয়, কিন্তু আদম রসুল। ইনসানের ভিতর নুরে মোহান্নদি আছে। জাগ্রত নয়, বরং ঘুমন্ত। কিন্তু আদম জাগ্রত নুরে মোহান্নদিতে নুরময়। তাই আদম একদিকে ইনসান হয়েও পরিপূর্ণরূপে ইনসানে কামেল, পরিপূর্ণ মোমিন এবং জীবন্ত কাবা। তাই আদম ইনসানের জন্য জীবন্ত কেবলা। তাই আদমের চেহারা আল্লাহর চেহারা। তাই আদম আল্লাহর রহস্য এবং আল্লাহ আদমের রহস্য। আদম শফিউল্লাহ, আদম নবি। আদম রসুল। আদম নুরে মোহান্নদিতে নুরময়। আদম ইনসানে কামেল। আদম মোমিনের প্রতিমূর্তি। আদম আরিফবিল্লাহ। আদম আবদুহ। আদম মাওলাউল আলা। আদম মাহবুবে সোবহানি। আদম কুতুবে রাব্বানি। আদম গাউসে সামদানি। আদম আফতাবে ওলি। আদম

ওয়াজহুল্লাহ। আদম জামাল। আদম শারাপা। আদামের আদা (রূপবৈচিত্র্য)
 রহস্যপূর্ণ। তাই সবাই বুঝতে পারে না। আদম গাউসুল আজম। আদম
 সোবহানি। আদম রাব্বানি। আদম মাওলা। আদম সুলতানুদ্ দুনিয়া। তাই
 তিনি কলুষিত বহুবাদীর দৃষ্টির অন্তরালে থাকেন। কলুষিত বহুবাদীর
 দৃষ্টির দর্শনে আদম বারবার অপমানিত হবেন। বহুবাদীর দর্শনের পাল্লায়
 আদমকে মাপা যায় না। বহুবাদী দর্শন অজানা-অদেখা-অচেনায় ডুবে
 থাকতে ভালোবাসে। কচুরিপানার মতো ভাসমান যুক্তিতর্ক দিয়ে আদমকে
 বুঝতে চেয়ে ব্যর্থ হয়। আদমপ্রেম ডুব দিয়ে মোরাকাবার ধ্যানসাধনায়
 আদমকে চিনতে হয়। অন্যথায় অসম্ভব। আদমের রহস্য জানতে পারলে
 আল্লাহকে জানা যায়। আদমপ্রেম ডুব দিলে চোখ দুটো আকাশের দিকে
 খোলা না রেখে আপন কলবের দিকে চোখ দুটো বন্ধ করে ধ্যানে ডুবে
 থাকতে হয়। কারণ কলবের জ্ঞান লাভ করতে হলে চোখ দুটো কলবের
 দিকে থাকবে। কারণ কলবের জ্ঞান আর মাথার জ্ঞান এক বিষয় নয়।
 কারণ কলবের জ্ঞান বুকে চাপ দিয়ে দেওয়া হয়। কলবের জ্ঞান দানের
 বিষয়, কিন্তু অর্জনের বিষয় নয়। তবে দানের বিষয় হলেও মোরাকাবার
 ধ্যানসাধনাটি অবশ্যই করতে হবে। মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি বাদ দিলে
 কেবল দানের বিষয় ভেবে বসে থাকলে কিছুই পাওয়া যাবে না। কপালে
 কেবল যুক্তির কাঁচকলাটাই ঝুলবে। আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো যে,
 অনেকেরই ধারণা যে মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় বিরাট ধনী হতে পারবে

কি-না, বিশাল বিষ্ঠ-বৈভবের মালিক হতে পারবে কি-না ইত্যাদি। মহানবি
 মা খাদিজাকে বিয়ে করার পর, মা খাদিজা তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ
 মহানবিকে দান করে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা একমত যে, সেই দিনে
 জাজিরাতুল আরবে সবচেয়ে বড় ধনী ছিলেন মা খাদিজা। এমন কথা শোনা
 যায় যে, মা খাদিজার যত উট ছিল তা একটার পেছনে আর একটা দাঁড়
 করিয়ে দিলে প্রায় তিন মাইল লম্বা হতো। এখন বিরাট একটি প্রশ্ন হলো,
 মহানবিকে এই বিশাল সম্পত্তি দান করার পর সেই সম্পত্তি আর মহানবির
 কাছে দেখতে পাই না কেন? কোথায় চলে গেল এত প্রচুর ধন-সম্পদ?
 কোথায় চলে গেল তিন মাইল লম্বা উটের কাফেলা? এ জন্যই খাজা গরিবে
 নেওয়াজ বলেছেন যে, তুমি দুনিয়াটাও ষোলআনা চাইবে, আবার
 আল্লাহকেও চাইবে, এটা আজব কথা, মনগড়া কথা। মনে মনে হাজারও
 আনন্দ পেতে পারো, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তো পাবার কথা নয়। (দিওয়ানে
 খাজা)। রূপক শয়তান যেমন আসল শয়তান নয়, বরং আসল শয়তানটিকে
 চিনিয়ে দেবার একটি অপূর্ব সুন্দর মহড়া (ট্রেনিং), তেমনি তিনটি রূপক
 শয়তানকে যে পাথর ছুঁড়ে মারতে হয় উহা নিছক রূপক পাথর। আসল
 পাথর নয়। আসল পাথরটিকে চিনিয়ে দেবার একটি অপূর্ব সুন্দর মহড়া
 (ট্রেনিং)। যে পাথর-দিয়ে-বানানো কাবাটিকে তোয়াফ করা হয় সেই
 কাবা ও তোয়াফ দিয়ে মোমিন নামক জীবন্ত কাবাটিকে তোয়াফ কেমন
 করে করতে হবে সেটা চিনিয়ে দেবার অপূর্ব সুন্দর নিদর্শন। পবিত্র মিনাতে

যে পশুটি কোরবানি করতে হয় সেই পশু কোরবানিটি দিয়ে মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা আসল পশুটিকে কেমন করে কোরবানি করতে হবে তারই একটি অপূর্ব সুন্দর মহড়া। আকার রূপটি দিয়ে নিরাকারের ধারণা জন্মায়। পশুর গোশত আল্লাহপাকের দরবারে গৃহীত হয় না, বরং গৃহীত হয় আপনার ভেতরে বাস করা পশুটি কোরবানি করার মহান তাকওয়াটি। কারণ আল্লাহ যেমন ধৈর্যশীল তথা সবারকারীর সঙ্গে থাকেন, তেমনি তাকওয়াকারীর সঙ্গে থাকেন। কেউ ধরতে পারেন, কেউ পারেন না। কারণ ধরার বিষয়টি তকদির দ্বারা নির্ধারিত। যেমন বনের হাতি মাংস খাবে না, খাবে সবজি এবং বনের বাঘ সবজি খাবে না, খাবে মাংস। কারণ এটাই হাতি আর বাঘের জন্মের আগেই নির্ধারণ করে দেওয়া শক্ত তকদির। এই বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আম্মাকে খুব সাবধানে কলম চালাতে হয়েছে। কারণ বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। রূপক নামক শব্দটি সব বিষয়ে খাটলেও লিখতে পারলাম না। ইঁহা আম্মার কৃপণতাও নয়, উদারতাও নয়। কারণ যারা জ্ঞানী, যারা বোঝে, তাদের ইংগিত-ইশারা দিলেই বুঝতে পারে। আর যারা সহজে বুঝতে পারে না তাদেরকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হয়। মারফতের অনেক অনেক গোপন বিষয় সাহাবাদের জানা থাকা সত্ত্বেও যুগের পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারেন নি, তবে অতি গোপনে একান্তজনের কাছেই বলতে পেরেছেন। হজরত আবু হোরায়ারা বর্ণিত বোখারি শরিফ-এর পঁচানব্বই নম্বর হাদিসটি এবং হজরত ইবনে

আব্বাস বর্ণিত হাদিসটি পড়লেই বোঝা যায়। তবে এই অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বাস করে সব কিছুই বিশ্লেষণ করতে হয়। ছবি তোলা হারাম কথাটি এখন অনেকটা অচল। কারণ বিদেশ ভ্রমণে পাসপোর্টের ছবিটি যে তুলতেই হবে। এখন তো খোদ আরব দেশের টাকার মধ্যে রাজা-বাদশাহদের ছবি দেওয়া হয়। ছবির জন্য যদি ফেরেশতার আগমন না হয়, তো সমগ্র আরব দেশের মুসলমান ভাইদের পকেটে ছবিওয়ালা টাকা যে অবশ্যই রাখতে হয়। এসব কথা ধরতে নাই। চুপ করে থাকাটাই ভালো। তবে কিছু কিছু বিষয়ে প্রতিবাদ অনেকটা বাধ্য হয়েই করতে হয়। তাই তো জ্ঞানের সাগর বাহারুল উলুম হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি বারবার এই কথাটি বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, মাসলা-মাসায়েল, হাদিস-ফেকাহ, এজমা-কিয়াস আর কোরান তফসির জ্ঞানা এক কথা, আর নিজেকে চেনা ও জ্ঞানার আধ্যাত্মিক বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা কথা। উনার পীর সাহেব হজরত আবু আলি ফারমাদি একজন নিরঙ্কর ছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, নিরঙ্করের কাছে কোন জ্ঞানের খনি লুকিয়ে আছে যে ইমাম গাজ্জালির মতো মহাজ্ঞানীকেও মুরিদ হতে হলো? এ রকমভাবে বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। শুনেছি হালাকু খাঁর পীর সাহেব হজরত খাজা নুর মোহাম্মদ দারবন্দিও নিরঙ্কর ছিলেন। এই নিরঙ্কর পীর খাজা নুর মোহাম্মদ দারবন্দি হালাকু খাঁ-কে মুসলমান বানাতে পেরেছিলেন। বাগদাদের বড় বড় চাউস আলেম, উলামা, মোফাচ্ছের ও শায়খুল হাদিসেরা মুসলমান

বানানো তো দূরের কথা, বরং হালাকু খাঁর বর্বর হিংস্র সৈনিকদের হাতে নির্গমভাবে খুন হয়েছেন।

আমার একটি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার কথাটি বলতে চাই। নারায়ণগঞ্জের কোনো এক মসজিদের ইমাম সাহেব বেলতলির বাবা সোলায়মান শাহ লেংটাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতেন। একদা পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে জুম্মার নামাজ আদায় করতে হয়েছিল সেই মসজিদে। এত জঘন্য অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে পারেন একজন ইমাম সাহেব, তা আমার জানা ছিল না। যেহেতু বাবা সোলায়মান লেংটা থাকতেন, তাই তাঁর লজ্জাস্থানটির বিশদ অশ্লীল বর্ণনাটি বাধ্য হয়ে শুনতে হলো এবং অবশেষে শেষ কথাটি হলো, যারা বেলতলির লেংটার ওরসে যায়, তারা জাহান্নামের ঠিকানা করে নেয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। নিয়তির কী অপূর্ব লিখন, অনেক দিন পর, প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর পর, রোগী দেখার জন্য নারায়ণগঞ্জ যেতে হলো। রোগী দেখার পর অনুরোধ করা হলো একজন হাক্কানি (?) আলেমের চিকিৎসার জন্য। গেলাম এবং রোগীকে দেখে চমকে উঠলাম। কাগজপত্র দেখে দেখতে পেলাম, রোগটির নাম ‘মোটাস্টাইটিস কারসিনোমা’ তথা ছড়িয়ে পড়া ক্যান্সার। তাও আবার লজ্জাস্থানে হয়েছে। কী ভীষণ, কী করুণ অবস্থা যা দেখার মতো নয়। পরে অপারগতার কথাটি জানিয়ে বিদায় নিলাম আর অনেক কিছু ভাবলাম। তথাকথিত ডিগ্রিধারী এলিট সমাজের জার্সিপরা বিদ্বানেরা হয়তো অন্য কারণে ক্যান্সার হয়েছে বলে বয়ান দেবেন। কারণ

তারা পীর-ফকির মানেন না। যেমন মহাবিদ্বান শয়তান আদমকে মানে না। বাবা সোলায়মান ঝাড়ফুক আর তাবিজ-তুফাওয়ালা খনকার নামক পীর নন যে, যা মুখে আসে তাই বলে দেবেন। মোল্লা মোল্লাই। তাই মোল্লা দিয়ে মহানবিকে বিচার করা ঠিক নয়। গির্জার যাজক দিয়ে খ্রিস্টকে বিচার করা ঠিক নয়। খাদেম দিয়ে খাজা বাবাকে বিচার করা ঠিক নয়। কাঠ পুরোহিত দিয়ে কৃষ্ণকে বিচার করা ঠিক নয়। মাতাল দিয়ে মহাদেবকে বিচার করা ঠিক নয়। যদিও মহাদেব ভাং নামক নেশা সেবন করতেন। মহাদেবের একটি মূল্যবান বাণী তুলে ধরলাম। তিনি বলেছেন, যে ধর্মের মাঝে অধ্যাত্মবাদ নাই, সেটা কোনো ধর্মই নয় (সির্রে হক জামে নূর)। এটা একটি বাস্তব সত্য যে, আজ বাবা সোলায়মান শাহ লেংটার উরসে বেলতলিতে কন্ম করে হলেও দশ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়। আর সেই ডেংচিকাটা অশ্লীল বাক্য নিক্ষেপকারী মোল্লার কবর ও পরিচয় কেউ জানেও না। আর কোনোদিন জানবেও না। কালের অমোঘ সত্যের বিচারে একজন চিরতরে হারিয়ে যায়, আর অপরজন অমর হয়ে থাকেন।

সুফিবাদের দৃষ্টিতে আন্নি ও আম্মার বলার রহস্য

আন্নি আর আন্নিত্ব এক বিষয় নয়। যে আন্নি ও আম্মার বলে তার মধ্যে আন্নিত্বের তৃ-টি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। এটা বোঝা কষ্টকর। কারণ কোন আন্নির মধ্যে তৃ-টি আছে আর কোন আন্নির মধ্যে

তু-টি নাই ইহা সহজে বোঝা যায় না। তু-এর মধ্যে খান্নাস আছে কি নাই এটা সেই বুঝতে পারবে যার মধ্যে খান্নাস নাই। মাওলানা রুমি তাই একটি সুন্দর চমৎকার এবং সূক্ষ্ম শিক্ষণীয় কথা বলেছেন এই বলে যে, মনসুর হাল্লাজ আম্মিই একমাত্র সত্য বলেছেন আবার ফেরাউনও ‘আম্মিই খোদা’ বলেছে। মনসুরের দাবি আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় হলো, আর ফেরাউনের দাবি বর্জনীয় হলো। কারণ ফেরাউনের দাবির মাঝে যে ‘আম্মিটি’ আছে উহাতে তু-টি আছে তথা খান্নাস আছে তথা খান্নাসটিকে সঙ্গে নিয়ে আম্মি বলেছে, অথচ মনসুর হাল্লাজের আম্মিটির মাঝে তু নাই তথা খান্নাস নাই তথা খান্নাসটিকে বাদ দিয়ে বলেছেন। অথচ দুইজনই মানুষ, দুইজনেই মানবশরীর নিয়ে তৈরি। দেখতে দুই জনই মানুষ। কিন্তু জটিল বিষয়টি হলো যে, কে তু-টিকে বাদ দিয়ে আম্মি বলছে আর কে তু-টিকে সাথে রেখে আম্মি বলছে এই বিষয়টি সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা এমনকি ঝানু ইসলাম গবেষকও তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। তাই কিছু গবেষকেরা বলে থাকেন যে, আম্মি ও আম্মার বলাটাই দোষণীয়। আম্মার অন্যান্য বইতে এ রকম কথাটি পাবেন, তবে ব্যাখ্যা দেই নি। পরে যখন বুঝতে পারলাম যে, এই কথাটির কিছুটা ব্যাখ্যা না দিলে হয়তো অনেকে ভুল বুঝতে পারেন অথবা ভুল করতে পারেন। আম্মি ও আম্মার বলার মাঝে অহংকার থাকে তখনই যখন খান্নাসটি সঙ্গে নিয়ে বলা হয়। আবার আম্মি ও আম্মার বলার মাঝে অহংকারটি থাকে না তখনই, যখন খান্নাসটিকে

সঙ্গে না রেখে বলা হয়। এখন প্রশ্নটি হলো, কে খান্নাসটিকে বাদ দিয়ে আমি ও আমার বলছে এই বিষয়টি বোঝা খুবই কষ্টকর। তাই মহান ওলিদের দরবারে গিয়ে কিছু শুনে তবে ডেবেচিস্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সুতরাং আমি ও আমার বলার মাঝে পাইকারিভাবে শয়তানের কথা বলাটা মোটেই সঠিক নয়। কারণ কোনো ওলি (যাকে ওলি বলে চেনা যায় না অথচ ওলি) যদি আমি ও আমার বলেন তো উহা কখনোই শয়তানের কথা হতেই পারে না। কারণ উহা খান্নাস-বর্জিত কথা। হজরত মনসুর হাল্লাজের পীর ও মুরশিদ হজরত জুনায়েদ বোগদাদি বলেছেন যে, আল্লাহকে আমার সঙ্গে রেখে অহংকার করা যায়, নতুবা অহংকারই করা যায় না। তিনি (জুনায়েদ) অনেক সময় মাস্তুর হালে মুরিদদের সামনে বলে ফেলতেন, লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহতাল্লা তথা ‘এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নাই।’ সুতরাং এই কথাগুলো সম্পূর্ণরূপে খান্নাস-বর্জিত কথা। সুফি কবি আল্লামা ইকবাল যে খুদিকে শক্তিশালী করতে বারবার উপদেশের ভাষায় বলেছেন, সেই খুদিটি সম্পূর্ণ খান্নাস-বর্জিত খুদি। খান্নাস-বর্জিত খুদিকে ফেরেস্তারা সব সময় পাহারা দিয়ে রাখে এবং সেই খুদির নিকট শেখার মতো অনেক কিছু আছে। সুতরাং খান্নাস-বর্জিত খুদিটি তথা আমিটি পবিত্র এবং এই কথাটি কোরান-এর সূরা মুমিনুনের ষাট নম্বর আয়াতেও বলা হয়েছে : ফা কালা রাব্বুকুম উদ্‌উনি আস্তাজেব

লাকুম-সুতরাং তোমাদের রব বলিলেন, ‘ডাকো (একা) অবশ্যই জবাব পাবে।’

‘উদ্‌উন’-এর মাসদার হলো দাউন তথা ডাকা। এখানে ‘উদ্‌উনি’ তথা একা ডাকা তথা খান্নাস-বর্জিত ডাকা। আর যদি খান্নাসকে সাথে নিয়ে ডাকা হয় তো দুইজন হয়ে যাবে : আমি এবং খান্নাস। সুতরাং ‘উদ্‌উনা’ তথা দুইজন (আমি ও খান্নাস) হলে ডাকের জবাব পাওয়া যাবে না। ‘আস্তাজেব’-এর মাসদার হলো আল এজাবা আর আল এজাবার অর্থটি হলো সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাওয়া। সুতরাং কোরান ‘উদ্‌উনি’ (একা) বলেছে, ‘উদ্‌উনা’ (আমি ও খান্নাস) বলে নি। খান্নাস- বর্জিত আমিটি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরকে (লাকুম) জবাব দেওয়া হবে।

সুলতানুল হিন্দ খাজা গরিবে নেওয়াজ মুরিদদের বলতেন, আমি ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাই, কিন্তু তোমরা পাও না। মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় লিপ্ত থাকো, দেখতে পাবে একদিন ডাকের জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাচ্ছ। ইমামুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামি বলেছেন, আনা সুবহানি মা আজামুশ শানি তথা ‘আমিই সুবহানি এবং সমস্ত শান আমারই।’ হজরত বায়েজিদের এই কথার মধ্যে ‘তু’ নাই তথা খান্নাস নাই। সুতরাং এই আমি ও আমার বলার মাঝে সংশয় থাকার কিছু নাই।

অবশেষে বাংলার বিখ্যাত ঔলিয়ে কাম্মেল, নলতা শরিফে যাঁর সৌন্দর্যের প্রশ্নে অদ্বিতীয় মাজার, সেই শাহ সুফি খান বাহাদুর আহসানউল্লাহর দাদা

পীর হজরত ওয়ারেস করমের অন্যতম প্রধান খলিফা হজরত বেদম তাঁর কালামে লিখে গেছেন, খুদ কাশীসে কম নাহি হায় নুরে ইশক মে আঁহ কো জবত্ কারনা তথা ‘আত্মহত্যার চেয়ে কোনো অংশেই কম নহে প্রেমের নুরে ডুবে যাবার সময় আনন্দের চিৎকারটিকে দমন করে রাখা।’

কোরান-এর কিছু আয়াতের অংশবিশেষ যাহা প্রচলিত অনুবাদের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম

পবিত্র কোরান মজিদ-এর ১৭ নং সূরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, সুবহানাল্লাজি আস্রা বে-আবদেহি লাইলান। ‘ভাসমান ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছেন রাত্রির মধ্যে।’

এই আয়াতের আবদেহি শব্দটির টীকায় বলা হয়েছে, কালা বে-আবদেহি দুনা নাবীয়েহি লাইলান ইয়াতাওয়াহামু ফিহে নাবুওয়াতান ওয়া বেলায়েতেহি। কালাল্ ইমামু ফি তাফসিরেহি আন্বাল অবুদিয়াতা আফজালুন মিনার রেসালাতে।

বলা হলো, বে-আবদেহি। নবি ব্যতীত। (অথচ এই আয়াতে নবি বলা হয় নি)। ঐ রাত্রিতে যাহাতে আমরা বুঝতে পারি তার মধ্যে নবুয়ত এবং রেসালতকে বলা হয় নি।

ইমাম সযুতি তাঁর তফসিরের মধ্যে বলছেন, নিশ্চয়ই উবুদিয়াত (দাসত্ব) রেসালত হইতে উত্তম। (তফসিরে জালালাইন ২২৮ পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য)।

এখানে বাক্যে আবদেহি বলা হলো অথচ নবি বলা হয় নি। নবুয়ত এবং বেলায়েত এবং রেসালত কখনোই আবদিয়াতের (দাসত্বের) সমতুল্য নহে। তাই নবুয়ত, বেলায়েত এবং রেসালত শব্দগুলোর কোনো একটিকেও এই আয়াতে না এনে আবদিয়াতের (দাসত্বের) মর্যাদাকে সম্মুখত করা হয়েছে। মেরাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন ঘটনাতে আবদিয়াত শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ রাক্বুল আল আমিন নবুয়ত, বেলায়েত এবং রেসালতের শব্দগত অবস্থানকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

কেননা, আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ রাক্বুল আল আমিন সুবহানাল্লাজি আসরা বে-নাবিয়েহি অথবা বে-বেলায়েতেহি অথবা বে-রেসালাতেহি না বলে, বরং বে-আবদেহি শব্দটি নির্বাচন করে প্রয়োগ করেছেন। ইহাতেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নবুয়ত, রেসালত এবং বেলায়েত লাভ করা যতটুকু না কষ্টকর তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি কষ্টকর হলো নিজেকে আবদিয়াতের (দাসত্বের) পথে এগিয়ে নেওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা। (ইহা অপ্রিয় সত্য হলেও বলতে হয় যে, কোরানুল হাকিম-এর এই চারটি শব্দের প্রতিটির ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যক্তির শব্দের গুণে গুণাবিত হওয়া একমাত্র আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের বিশেষ রহমত ব্যতীত অসম্ভব)।

সূরা বনি ইসরাইলের ৭৮ নং আয়াত : আকিমিস সালাতা লেদুলুকিশ্ শামসে ইলা গাসাকিল লাইলে ওয়া কোরানাল্ ফাজরে, ইন্না কোরানাল্ ফাজরে কানা মাশহদান।

সালাত কায়েম করো (আকিমুস সালাতা) সূর্য ঢলে যাবার কারণে (লেদুলুকিশ্ শামসে) রাত্রির অন্ধকারের দিকে (ইলা গাসাকিল লাইলে) এবং ডোরের কোরান (কোরআনাল্ ফাজরে)। নিশ্চয়ই ডোরের কোরান হয়, প্রমাণিত। (ইল্লা কোরআনাল্ ফাজরে কানা মশহদান)।

সূরা মোদাছেরের ৩১ নং আয়াত : ওয়া মা জাআলনা আস্হাবান নারে ইল্লা মালাইকাতান।

এবং আমরা নির্বাচন করি না (ওয়া মা জাআলনা) আগুনের অধিবাসী (আস্হাবান নারে) ফেরেশতা ব্যতীত (ইল্লা মালাইকাতান)।

সূরা বাকারার ১৯ নং আয়াত : আও কাসাইয়েবিন মিনাস্ সাম্মায়ে ফিহে জুলুমাতুন ওয়া রাআদুন, ওয়া বারকুন, ইয়াজআলুনা আসাবেআহম ফি আজ্জানেহিম মিনাস সাওয়ায়েকে হাদারাল মাউতে, ওয়াল্লাহ মুহিতুন বিল কাফেরিনা।

অথবা (আও) উহা প্রবল বৃষ্টিপাতের মতো, (কাসাইয়েবিন) যাহা বর্ষণ হয় আকাশ হইতে (মিনাস্ সাম্মায়ে) উহার মধ্যে রহিয়াছে অন্ধকার (ফিহে জুলুমাতুন) এবং বজ্র (রাআদুন) এবং বিদ্যুৎ (বারকুন)। (তাহাতে তাহারা) নির্বাচন করে (ইয়াজআলুনা) তাহাদের অঙ্গুলিসমূহ (আসায়াবেহম) তাহাদের কর্ণসমূহের মধ্যে (ফি আজ্জানেহিম) বজ্রধ্বনি হইতে (মিনাস্ সাওয়ায়েকে) যখন উপস্থিত হয় তাহাদের মৃত্যু (হাদারাল মাউতে) এবং

আল্লাহ (ওয়াল্লাহ) পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন (মুহিতুন) কাফেরদের দ্বারা (বিল কাফেরিনা)।

সূরা হিজরের ৯ নং আয়াত : ইন্না নাহ্নু নাজ্জাল্‌নাজ্ জিক্রা ওয়া ইন্না লাহ্‌ লাহাফেজুনা।

নিশ্চয়ই আমরা (ইন্না নাহ্নু) নাজেল করি (অবতীর্ণ) জেকের (নাজ্জাল্‌নাজ্ জিক্রা) এবং নিশ্চয়ই আমরা তাহার জন্য (ওয়া ইন্নালাহ্‌) অবশ্যই হেফাজতকারী (সংরক্ষণকারী) (লা হাফেজুনা)।

কোরান-এর ১৯ নং সূরা মরিয়ম-এর ১৭ নং আয়াতের অনুবাদ ও সামান্য ব্যাখ্যা :

ফাত্তাখাজাত মিন দুনিহিম হেজাবান। ফা আরসাল্‌না ইলাইহা রুহানা ফাতাম্মাস্‌সালা লাহা বাশারান সাউইইয়ান।

সুতরাং সে তাহাদের হইতে (পরিবার পরিজন) পর্দা গ্রহণ করিল। সুতরাং আমরা তাহার দিকে আমাদের রুহকে পাঠাইলাম। সুতরাং তাহার জন্য উহা বাশার (আদম)-রূপে প্রকাশিত হইল।

রুহ যে বাশার (এখানে ইনসান শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি)-রূপ ধারণ করতে পারেন, এই আয়াতেই একটি স্পষ্ট দলিল পেলাম। রুহ যদিও স্বয়ং আল্লাহ এবং আল্লাহ যে বাশার-রূপ ধারণ করেন এই আয়াতটিই দলিল দেবার জন্য যথেষ্ট মনে করি। এবং রুহ যে কেবল বাশার-রূপই ধারণ করতে পারেন তা নয়, বরং রসুলও যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারেন

তারও দলিলটি পেলাম। এখানে এই কথাটি বলা হয় নি যে, সুতরাং আমরা তাহার দিকে নফসকে পাঠাইলাম তথা ফা আরসালনা ইলাইহা রুহানা বলা হয়েছে, কিন্তু ফা আরসালনা ইলাইহা নাফসানা বলা হয় নি। (আমাদের অনুবাদ এতই হুবহু হয় যে ভাষার লালিত্য রাখতে কষ্ট হয়)। আপনি যে কোনো কোরান-এর অনুবাদ ও তফসির খুলে দেখুন যে, মশাল্লাহ, এই রুহ বলতে জিবরিল নামক ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে॥ বলা হয়েছে। অথচ আল্লাহ পাক কেবলমাত্র আদমের ডেতর রুহ ফুৎকার করেছেন। ইহা একটি কোরান-এর জাজ্বল্যমান স্পষ্ট দলিল। কেবল জিবরিল কেন, আল্লাহ সমস্ত ফেরেশতাকে এই বলে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তোমাদের জ্ঞান কি আদমের সমান? প্রতি-উত্তরে সমস্ত ফেরেশতারা একবাক্যে বলে ফেললেন, লা ইল্মালানা ইল্লা মা আল্লামতানা তথা আমাদের কোনো জ্ঞান নাই আল্লাহ যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতীত। পাঠক বাবা, আপনি সরল বিশ্বাসে যে কোনো জাঁদরেল আলেমের এই অনুবাদটি পড়ে জিবরিল ফেরেশতার কথাটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ফেলবেন। কিন্তু ইহা যে একটি মারাত্মক এবং জঘন্য ভুল, এটা সেই মুহূর্তে বুঝে উঠতে পারবেন না। এভাবেই কোরান-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অনেক স্থানে এমন উল্টাপাল্টা দেওয়া হয় যে, সরল পাঠক সত্য-মিথ্যার পার্থক্যটি আর বুঝে উঠতে পারেন না। ঢাকার পুরাতন শহরে অবস্থিত ডেজাল দুধের আড়ংটির নাম রথখোলার দুধের আড়ং। এই ডেজাল দুধ খেতে খেতে পেট

অনেকটা ডেজাল-প্রফ হয়ে যায়। তখন পল্লীগ্রামে গিয়ে কোনো আত্মীয়-পরিজনের বাড়িতে দু-একদিন অবস্থান করে খাঁটি দুধ পান করলে পেট খারাপ হবার সম্ভবতা সস্তাবনা থেকেই যায়। ঠিক সে রকম ডেজাল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়ে পড়ে আসলটাকেই ডেজাল মনে হয় এবং নানা রকম প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা মনের মাঝে ডেসে ওঠে এবং এটাই স্বাভাবিক।

সুফি কবি আল্লামা ইকবাল এই জাতীয় কোরান-এর অনুবাদ ও তফসিরগুলো পড়ে একটি খাসা মন্তব্য করেছিলেন এই বলে যে, এই সকল আলেম-উলামাদের কোরানের অনুবাদ ও তফসিরের নমুনা দেখে আল্লাহ, মহানবি এবং ফেরেশতারা সবাই অবাক। সুফি কবি আল্লামা ইকবালের উপর কাফের ফতোয়া দেবার প্রথম সূচনাটি এখান থেকেই শুরু হয়, তবে আলেম-উলামারা তখনও প্রকাশ্যে কিছু মন্তব্য করার সাহস পায় নি। কোরান-এর উনিশ নম্বর সূরা মরিয়মের একচল্লিশ নম্বর আয়াতের অনুবাদ : ওয়াজ্কুর ফিল্ কিতাবে ইব্রাহীমা। ইল্লাহ কানা সিদ্দীকান নাবীয়ান। তথা এবং জিকির (স্মরণ) করো কেতাবের মধ্যে ইব্রাহিমকে। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী (সিদ্দিকান) নবি।

কেতাবের মধ্যে ইব্রাহিমকে কেমন করে মনে করবে তথা স্মরণ করবে তথা জিকির করবে? কারণ তখন কেতাবের সন্ধান কোথায় পাবে, যদি উহা কাগজ অথবা অন্য কিছুতে লিখা থাকে? আর তা ছাড়া কেতাব পড়ার মতো অক্ষরপরিচয় তাঁর জানা ছিল না। তা হলে এই কেতাব বলতে কি

আল্লাহর প্রকাশ ও বিকাশের অবিরাম ছুটে চলার গতিকে বুঝানো হয়েছে? যদি তাই হয়, তা হলে নুরময় কেতাব হতেই ইব্রাহিমকে জানবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ হজরত ইব্রাহিম আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে চলে গেছেন। আমরা দেখতে পাই, কোনো বিষয় জানার জন্য আল্লাহ কেতাবের জিকির করার কথাটি বারবার বলেছেন। সুতরাং এই রহস্যলোকের নুরি কেতাবটি হতে কিছু জানতে হলে রহস্যলোকে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সম্ভব নয়। তা হলে অধ্যাত্মবাদকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়? আর যদি ধরে নিলাম উহা কাগজের কেতাব, কিন্তু সেই সময় কাগজ পাবার প্রশ্নই ওঠে না। আর ভাষাটিকে আক্ষরিক রূপদান করে সাজাবার মতো ভাষাজ্ঞানী কি তখন ছিল? তা হলে কি পরিষ্কার বোঝানো হচ্ছে না যে, উহা এলম্মে লাদুনির কেতাব? তা হলে এলম্মে লাদুনিকে কী করে অস্বীকার করে ওহাবিরা এবং শিয়ারা? আরও উল্লেখ্য যে, কোরান-এ কেতাব বলতে কোথাও কোরান-কেই বুঝিয়েছে, আবার আল্লাহর প্রকাশ ও বিকাশের অবিরাম ছুটে চলার গতিকেও কেতাব বলা হয়েছে। সুতরাং একপেশে করে বুঝতে গেলেই ভুল করা হয়। সুফিবাদে বিশ্বাসী অনেকেই কোরান-কেও যে কোনো কোনো স্থানে কেতাব বলা হয়েছে এটা মানতে নারাজ। আবার পরক্লেপে আল্লাহর প্রকাশ ও বিকাশের অবিরাম ছুটে চলার গতিকেও যে কেতাব বলা হয়েছে এটাও অনেকে মেনে নিতে নারাজ। অনেকটা যারা শরিয়ত মানেন তারা মারফত মানেন না, আবার যারা

ম্বারেফত ম্বানেন তারা শরিয়ত ম্বানেন না। কারণ আল্লাহর কালামে পাক কোরানুল হাকিম-এ উভয়ের সমন্বয়টি দেখতে পাই। যেমন আমরা জানি ওহি নবি-রসুলের কাছেই নাজেল করা হয়, অথচ হজরত মুসা (আঃ)-এর ম্বায়ের কাছেও ওহি আসার কথাটি জানতে পারি এবং আরও অবাক হবার কথাটি হলো যে, সূরা নহলের ৬৮ নং আয়াতের প্রথমেই মোম্বাহির কাছেও ওহি নাজেল করা হয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ওহি একটি ম্বাত্র শব্দ হলেও তিনটি স্থানে তিন রূপ। তাই বলে একজন বিবেকবান মানুষ মোম্বাহির নামের পরে ‘আলাইহেস সালাতুস সালাম’ ব্যবহার কখনোই করতে যাবেন না। কারণ যেহেতু মোম্বাহির কাছেও ওহি নাজেল হয়, তাই বলে কি মোম্বাহি আলাইহেস সালাতুস সালাম কি বলা যায়? না, যায় না। কোরান-এর তিগ্বান্ন নম্বর সূরা নজমের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতের অনুবাদ ও সাম্বান্য ব্যাখ্যা :

ওয়া আল্লা হয়া আদহাকা ওয়া আব্বকা।

এবং নিশ্চয়ই তিনি (তোম্বাকে) হাসান (আদহাকা) এবং (তোম্বাকে) কাঁদান (আব্বকা)।

ব্যাখ্যা : এই আয়াতটি পড়ার পর অবাক হই, কিছু এটা তো সর্বশক্তিমান আল্লাহর কালাম, তাই ম্বাখা পেতে ম্বেনে নিতেই হবে। তবে একটি কথা ম্বনে পড়ে বারবার আর সেই কথাটি হলো, বাংলার সহজ-সরল বাউল যখন লাল শালু কাপড় পরে খাল বা নদীর তীরে বা কোনো নির্জন স্থানে

আপন মনে দোতারায় সুর তুলে গাইতে থাকে বাংলায় বিখ্যাত সুফি সাধক খালেক দেওয়ানের পিতা আলেফ দেওয়ান রচিত তুমি যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ? জানতাম না এবং ঐ সরল-সহজ বাউলও হয়তো জানে না যে, এটা কোরান-এরই অনেকটা ভাবার্থ, এটা সূরা নজমের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতটির কিছুটা দর্শন গেয়ে চলছে।

কোরান কী অপূর্ব ভাষার শৈলীতে প্রকাশ করছে যে, একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহপাকই সবাইকে হাসান এবং সবাইকেই কাঁদান। আমরা অবশ্য কালামটিতে ব্রাকেট তৈরি করে আমাদের বুঝবার জন্য মানবজাতিকে বোঝাতে চেয়েছি। যদিও জিনজাতির কথাটি ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছি। কিন্তু কোরান বলছে, তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান। কালামটি কিন্তু সার্বজনীন। অবশ্য আমরাও সার্বজনীন বলতে কেবলমাত্র মানবজাতিকেই বুঝি। কিন্তু আল্লাহপাকের সার্বজনীন শব্দটির অর্থ হলো সৃষ্টিজগতের সবার বেলায় প্রযোজ্য। তিনি তাঁর সৃষ্টিজগতের সবাইকে হাসান এবং সবাইকে কাঁদান। নবি সোলায়মান পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গের ভাষা বুঝতেন। বুঝতেন এদের সুখ-দুঃখের ভাষা। বুঝতেন এদের হাসি আর কান্না। হৃদহৃদ পাখি তো বলেই ফেলল যে, আমি যা জানি নবির সোলায়মান তা জানেন না। একটু গবেষণা করুন। সব বিষয়ের গবেষণা চলছে এবং গবেষণায় নূতন নূতন বিষয় বেরিয়ে আসছে আর আমরা সেইসব দেখে অবাকের পর অবাক হচ্ছি। গবেষণায় ভুল থাকতে পারে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু

থান্নিয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়। কারণ কোরান গবেষণাকে উৎসাহ দেবার জন্য বলছে যে, সমস্ত গাছগুলো যদি কলম হয়, আর পানিগুলো কালি হয়, তবুও কোরান-এর ব্যাখ্যা লিখে শেষ করা যাবে না। আমরা মতের বিভিন্নতার দরুন মতভেদ দেখতে পাই। তবে হিংস্রতা, বর্বরতা এবং জ্ঞানমালের নিরাপত্তার প্রশ্নে মহানবি আগেই সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে, সেই মুসলমান, যার হাত সর্বপ্রকার আম্মানত এবং অনিষ্ট হতে মুক্ত থাকে। ইতিহাস খুলে দেখুন যে, মুসলমানরা যখন সভ্যতার শীর্ষে, তখন ইউরোপ আর আমেরিকার অবস্থাটি কেমন ছিল? জংলি রেড ইন্ডিয়ানদের বাস ছিল আমেরিকায়। এটা সবাই জানে। ব্রিটেন গৌয়ারগোবিন্দ আর বর্বরতার অঙ্ককারে যে ছিল তার অনেক অনেক প্রমাণ পাই। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে এই সত্য কথাটি প্রচার করার দরুন এই সেদিনও কত বড় বড় জ্ঞানীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং আরও কত কী! আর আজ? যে সভ্যতার মশালটি মুসলমানের হাতে ছিল সেই মশালটি এখন গৌয়ারগোবিন্দদের হাতে শোভা পাচ্ছে। আর আমাদের স্থান কোথায় নেমে গেছে সেটাও কি বলতে হবে? হয়তো যুক্তির খাতিরে বলতে পারেন যে, আল্লাহই যখন হাসান এবং কাঁদান তা হলে তাদেরকে হাসাচ্ছে আর আমাদেরকে কাঁদাচ্ছে! (সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে যখন আওলাদে রসুল ইমাম জয়নুল আবেদিন (আঃ)-কে মোয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ সূরা আল ইমরানের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতটি শুনিয়ে দিলো, তখন ইমাম সাহেব

কেবলমাত্র একটি কথাই বলেছিলেন যে, শয়তানের মুখেও আজ আমাকে কোরান-এর বাণী শুনতে হলো)। এর উত্তর আমার জানা নাই। তবে আল্লাহ্ এটাও বলে দিয়েছেন যে, যে জাতি তার নিজের ভাগ্য নিজেরা পরিবর্তন করে না আল্লাহ্ সেই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না। বলা হলে এখানে ভাগ্য পরিবর্তনের কথাটি আসে কেমন করে? ভাগ্য তথা তকদির দুই প্রকার : একটি বদলানো যায় এবং আর একটি যায় না। তথা মুবরাম তকদির নির্দিষ্ট। মুবরাম তকদিরের পরিবর্তন হয় না। (তকদির বিষয়টি নিয়ে তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিত লিখার আশা রাখি। বাকি আল্লাহপাকের ইচ্ছা।)

কোরান-এর পঞ্চান্ন নম্বর সূরা আর রহমানের ৫০ নম্বর (ছোট্ট একটি) আয়াতের অনুবাদ ও সামান্য ব্যাখ্যা : ফীহিমা আইনানে তাজরিয়ানে। তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে (ফিহিমা) প্রবহমান (তাজরিয়ানে) দুইটি চক্কু (আইনানে)।

ব্যাখ্যা : আইনানে শব্দটিকে ঝরনা লিখেছেন সবাই প্রবহমান শব্দটি থাকার কারণে। অথচ ইহার অর্থ হলো দুইটি চক্কু অথবা দুইটি কুপ। কুপ-কে অনুবাদকারী গ্রহণ করেন না। কারণ কুপে প্রবাহ থাকে না। কিন্তু চক্কুতে যে প্রচণ্ড বোবা প্রবাহটি বিদ্যমান উহা অনেকেই বুঝতে পারেন না। তাই ঝরনা অথবা প্রস্রবণ শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হন। অথচ ঝরনা অথবা প্রস্রবণ শব্দটির নাম-গন্ধও শব্দটিতে নাই। আমি পনেরটি আরবি

ডিকশনারি খুলে একটিতেও ঝরনা অথবা প্রসবণ শব্দটি পেলান্ন না। চোখের প্রবাহ যে সাগরের প্রবাহ হতে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং প্রবাহমান নদী-নালার তো চোখের প্রবাহের সামনে তুলনাই চলে না। অনুবাদক দুইটি চোখ, দুইটি কূপে প্রবাহটি দেখতে না পেয়ে দুইটি চক্ষুকে দুইটি প্রসবণ অথবা ঝরনা অনুবাদ করতে বাধ্য হন। অনুবাদক অকপটে যদি লিখে দিতেন যে, এই আয়াতটির হুবহু অনুবাদ করে গেলান্ন, কিন্তু অর্থটি বুঝতে পারলান্ন না, তা হলে অনুবাদকের মহত্বই প্রকাশ পেল। ‘সব কিছু বুঝে গেছি’, বলাটা যে পাপ এটা প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে দার্শনিক সক্রেটিস বারবার বলে আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। বুঝতে পারলান্ন, না বলার মাঝে মূর্খতা নাই, আছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে বুঝবার দরজাটি খুলতে পারে তারই অকপট স্বীকৃতি। চীন দেশে একটি প্রবাদ আছে, সামান্য জিহবাটি কত মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু দুইটি চক্ষুর যে কত শক্তিশালী প্রবাহ আছে এবং দুইটি চোখ অন্ধ থাকলে সভ্যতার প্রবাহটি কি ধেই ধেই করে এগিয়ে যেতে পারত? দৈহিক প্রেম এবং আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রশ্নেও বড় বড় কবিরা বলেছেন যে, আখুকা এক ইশারাই কাফী হয়। তথা চোখের একটি ইঙ্গিতই যথেষ্ট। ধনাঢ্য মাহওয়াল, মাটির হাঁড়িপাতিল বানায় এমন কুমোরে মনে সোহনির একটি দৃষ্টিতেই প্রেমসাগরে ডুবে মারা গেলেন। শরিয়ত এবং মারফতের মিলন পাই কোরান-হাদিসের বাণীতে। আমরা ইচ্ছা করে একপেশে হয়ে

যাই। ওহাবিরা তো মারফতের হাদিসগুলোকে একদম মানে না। এ জন্যই হয়তো ঝানু ওহাবি আর ঝানু শিয়া গবেষকদের সাহাবা আবু হুরায়রাকে যা-তা মন্তব্য করতে দেখি। কিন্তু সূরা কাহাফের খিজির যে এলম্নে গায়েব জানতেন সেই বিষয়টি সযতনে এড়িয়ে যান। এড়িয়ে যান সূরা আল ইমরানের ৪৯ নম্বর আয়াতের এলম্নে গায়েব জানার পরিষ্কার দলিলটি। এক জাঁদবেল ওহাবি পণ্ডিতকে বলেছিলাম যে, মৃতকে জীবিত করাটিকে আপনারা বলেন মৃত আত্মাকে জ্ঞান দিয়ে জীবিত করেন। আপনাদের এই ব্যাখ্যা মেনে নিলেও একটি কথা থেকে যায়, আর সেটা হলো এই রকম জ্ঞান দেবার বিষয়টি যে যে স্থানে কোরান-এ আছে সেখানে কিছু ‘বেইজ্জিনিল্লাহ’ তথা আল্লাহর হুকুমে কথাটি নাই, কিছু লাম্বের মধ্যে প্রাণ দেবার প্রশ্নে ‘বেইজ্জিনিল্লাহ’ তথা আল্লাহর হুকুমে থাকতেই হবে। আর মাটি দিয়ে বানানো পাখিতে ফুৎকার দেবার সাথে সাথে জীবন্ত পাখি হয়ে উড়ে যাবার কথাটি যে কোরান বলছে সেটার ব্যাখ্যা কী দিবেন? গোয়েন্দারা বলেন যে, অপরাধী কিছু না কিছু সামান্য হলেও অপরাধের চিহ্ন রেখে যায় এবং চিহ্ন দ্বারা যদি অপরাধী ধরা পড়ে তো কিছুই বলার থাকে না। তখন মাথা নিচু করে কেউ অপরাধ স্বীকার করে, আবার কেউ এই জলজ্যান্ত প্রমাণ দেখেও অস্বীকার করে। একজন এই বিষয়টি মানবে কি মানবে না, তা জন্মের পূর্বেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। মেশকাত শরিফ-এ তকদির বিষয়ে হাদিসগুলো পড়ে দেখলে পরিষ্কার বুঝতে

পারবেন। সুতরাং গালি না দিয়ে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। আর এলম্বে গায়েবের কথা? শত দলিল দাঁড় করালেও ওহাবিরা মানবে না। তবে যদি কেবলমাত্র একটি দলিল দিতে চাই, আর তা হলো ফারুক আজম হজরত ওমর ফারুক মসজিদে খুৎবা পড়ার সময় বহু দূরে যুদ্ধে রত সাহাবাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আশা করি এই দলিলটি যথেষ্ট। কারণ সাহাবার শান যদি এমন হয়, তো গায়েব সম্পর্কে মহানবির শান কেমন হতে পারে? বনি ইসরাইল সূরাতে মুসা ও খিজিরের বিষয়টিতে বলা হয়েছে, আমি তাকে (খিজির) ইলম্বে লাদুনি দান করেছি। খিজির নবিও নন, রসুলও নন। তিনি ওলি। কোরান-এর সূরা আল ইমরানের উনপঞ্চাশ নম্বর আয়াতের শেষে হজরত ইসা (আঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে বলেছেন যে, তোমরা কী খাবার খেয়ে এসেছ তা আমি বলে দিতে পারি এবং তোমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে কোথায় কোন জিনিস রাখা আছে তাও বলে দিতে পারব। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, এই একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের মধ্যে কারো তার নিজ বাড়িতে কোথায় কী রাখা আছে তা বলা এক প্রকার অসম্ভব বলতে চাই। কোরান-এর এই আয়াতগুলো কি এলম্বে গায়েবের প্রকাশ্য প্রমাণ বহন করে না? একইভাবে মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে আল্লাহ কোরান-এ বলেছেন যে, ‘আমি এইভাবেই ইব্রাহিমকে আকাশ ও ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত আমার (আল্লাহর) বাদশাহি অবলোকন করাই।’

তফসিরে রুহুল বয়ান এবং তফসিরে কবির এবং তফসিরে খায়েন-এ বর্ণনা করা হয়েছে, নবি হজরত ইউসুফ (আঃ) বলেন, ‘আমি তোমাদেরকে বিগত ও ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে তোমাদের রিজিক এবং যাবতীয় অবস্থা সম্বন্ধে বলে দিতে পারি। তোমাদের জন্য আসা খাদ্যশস্য কোথা হতে এলো এবং এরপর কোথায় যাবে, আমি এই বিষয়টিও জানি এবং তোমাদেরকে জানিয়েও দিতে পারি। আমি এটাও পরিষ্কার বলে দিতে পারি যে, এই খাবার গ্রহণে তোমাদের উপকার হবে কি ক্ষতি সাধিত হবে।’ এলম্লে গায়েব জানা না থাকলে এ রকম কথাগুলো বলা অসম্ভব।

ফারুকে আজম হজরত ওমর ফারুক হতে এই হাদিসটি মেশকাত শরিফ-এ আছে যে, মহানবি সৃষ্টির আদিকালীন সংবাদ দিচ্ছিলেন। এমনকি বেহেশতি এবং দোষীদের নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়া অবধি যাবতীয় ঘটনাবলির বিস্তারিত বর্ণনা করেন। সাহাবা হজরত হজাইফা বলেছেন যে, মহানবি উল্লেখিত সমাবেশে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব কিছুর খবর দিয়েছেন। তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই সেই সকল বর্ণনা মনে রাখতে পেরেছেন। মেশকাত শরিফ-এ আছে যে, সাহাবা হজরত সওবান বলেছেন যে, মহানবি বর্ণনা করেছেন, ‘আল্লাহ আমার (মহানবি) সামনে পৃথিবীকে এমনভাবে সংকুচিত করে দিয়েছেন যে, আমি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত হতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত কিছু অবলোকন করেছি।’ মেশকাত শরিফ-এ আছে যে, সাহাবা হজরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েয

বলেছেন যে, মহানবি বলেছেন ‘আমি আল্লাহকে সুন্দরতম আকৃতিতে দেখেছি।

তিনি (আল্লাহ) তাঁর কুদরতের হাত আমার বুকের উপর রাখেন, যে হাত পাকের সুশীতল পরশ আমি আমার অন্তরের অন্তস্থলে অনুভব করি এবং এর ফলে আমি আসমান-জমিনের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি।’ মেশ্কাত শরিফ-এ বর্ণিত আছে যে, হজরত উম্মুল ফজল ভবিষ্যদ্বাণী করে এরশাদ করেন, ‘খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমাতুজ জোহরা (আঃ)-এর কোলে একজন পুত্রসন্তানের আবির্ভাব ঘটবে এবং সে পুত্রসন্তান উম্মুল ফজলের কোলে লালিতপালিত হবেন।’ বুখারি শরিফ হতে সাহাবা হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন যে, ‘মহানবি একদিন দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কবর দুইটিতে আজাব হচ্ছিল। তিনি (মহানবি) সঙ্গী সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এই কবর দুইটিতে আজাব হচ্ছে। কিন্তু কোনো বড় গুনাহর জন্য নয়।’ তখন মহানবি একখানি খেজুরের কাঁচা ডাল নিয়ে সেটিকে ভেঙে দুই টুকরা করলেন এবং সেই দুইখানিকে একটি করে এক এক কবরে পুঁতে দিলেন এবং এরশাদ করেন যে, যতদিন পর্যন্ত এই খেজুরের ডাল শুকিয়ে না যাবে, ততদিন পর্যন্ত এদের কবরের আজাব কম হবে। মসনদে ইমাম হাম্বল হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবি তাঁদের কাছে এমনভাবেও বর্ণনা করেন যে, পৃথিবীতে একটি পাখির ডানা নাড়ার কথাও সেই বর্ণনা থেকে বাদ পড়ে নি। তিরমিযি শরিফ-এও এই বর্ণনাটি আছে,

মহানবি বলেন, ‘তখন প্রত্যেক কিছু তাঁর (মহানবি) কাছে এমনভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি (মহানবি) এইগুলি চিনতে পেরেছেন।’ আল্লামা জুরকানি এই হাদিসখানি সম্বন্ধে তাঁর শরহে মাওয়াহেব কিতাবে লিখেছেন যে, মহানবির সামনে দুনিয়াকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যার ফলে তাঁর (মহানবি) দৃষ্টি সেই সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করেছে। সুতরাং তিনি (মহানবি) পৃথিবীকে এবং যা কিছু কেয়ামত পর্যন্ত ঘটতে থাকবে এমনভাবে দেখতে পেয়েছেন যেমনভাবে তাঁর (মহানবি) হাত মোবারককে দেখতে পান। হাত মোবারকের তুলনা এই কারণেই দেওয়া হয়েছে যে, কোনোরকম দিব্যদৃষ্টি বা কল্পদৃষ্টি নয়, অতি বাস্তবতা দিয়েই তিনি (মহানবি) সেই সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন।

মেশকাত শরিফ-এর ‘মাসাজিদ’ অধ্যায়ে জলিল কদর সাহাবা এবং আসহাবে সুফ্ফার অন্যতম প্রধান আবু জর গিফারি হতে বর্ণিত একখানি হাদিসে উল্লেখিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের আগের দিন মহানবি কয়েকটি স্থান তাঁর হাত মোবারকের আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে এরশাদ করেন, ‘এইটা অম্বুকের (ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে) পতিত হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান। একই সঙ্গে তিনি ময়দানের আরও কতিপয় স্থান নির্দেশ করে দেখিয়ে বলেন, এখানে, এখানে।’ পরের দিন যুদ্ধ সংঘটিত হবার সময় দেখা যায় যে, তাঁর (মহানবি) নির্দেশিত স্থানসমূহে সাহাবাগণ শাহাদত বরণ করেন এবং পতিত হন— এর বাইরে একজনও নয়।

মেশ্কাত শরিফ-এর ‘মুজিজাত’ অধ্যায়ে হজরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, সে একদিন একটি নেকড়ে বাঘকে বলতে শুনেছে (নেকড়ে বাঘের জবান খুলে গিয়েছিল এর চাইতে আশ্চর্যজনক আর কী আছে!) যে, ওই দুই মরুপ্রান্তরে সম্মানিত ব্যক্তি (মহানবি) আছেন, যিনি তোমাদেরকে অতীত এবং ভবিষ্যৎ বিষয়সমূহ জ্ঞাত করাবেন।

দজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণকারীদের বিষয়ে আলোচনায় মহানবি বলেছেন যে, ‘আমি তাদের নাম জানি, তাদের বাপ-দাদাদের নামও জানি ও তাদের ঘোড়াগুলির রং সম্বন্ধেও জানি। তারাই হবেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার।’

মেশ্কাত শরিফ-এর ‘মানাকিবে আবি বাকারিন ওয়া উম্মারা’ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, উম্মুল মোমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা একদিন মহানবির নিকট আরজ পেশ করেন, ‘আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ! এমন কেউ আছেন কি, যার নেকিসমূহ আকাশের তারকারাজির সমসংখ্যক হবে?’ মহানবি বললেন, ‘হ্যাঁ, এবং তিনি হলেন ওমর।’

তফসিরে খাজেন-এ বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবি বলেছেন, মেরাজ রজনীতে ‘আম্মার উম্মতকে আপন-আপন মাটির আকৃতিতে হাজির করা হয়েছে, যেমনভাবে হজরত আদমের নিকট হাজির করা হয়েছিল। আম্মাকে বলে

দেওয়া হয়েছে কে আমার উপর ইমান আনবে, আর কে আনবে না।’ মহানবির এই ঘোষণা কাফেরদের গোচরীভূত হলে তারা বিদ্রোহাত্মক হাসিসহকারে বলেছিল, ‘মুসলমানদের নবি সমস্ত মানুষের জন্মের আগেই কে কাফের আর কে মোমিন ঘোষণা দিয়ে বসে আছেন, অথচ আমরা তার চারপাশে অবস্থান করি, আমাদেরকে তিনি চিনেন না।’ কাফেরদের এই উক্তি মহানবির নিকট পৌঁছালে তিনি মসজিদে নববিত্তে মিস্রের উপর আরোহণ করলেন এবং ঘোষণা করেন, ‘একমাত্র প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্য। এই সকল লোকদের এমন কী হলো যে, তারা আমার জ্ঞান নিয়ে সমালোচনা করে। এখন থেকে কাল কেয়ামত পর্যন্ত যে কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন, আমি অবশ্যই তাদের বলে দিব।’

ইফতার বিষয়ে কতিপয় হাদিস

আমরা সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ নামক বইটির তৃতীয় খণ্ডে ইফতার, সাওম (রোজা) ও অজুর (আধ্যাত্মিক) শরিয়তভিত্তিক মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশদ আলোচনার আশা রাখি। তাই এখানে ইফতার বিষয়ে মাত্র তিনটি হাদিস আপাতত তুলে ধরলাম। হনায়েনের যুদ্ধটি

ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ পৃথিবীর আনু সমরবিদেরা এই যুদ্ধে কেমন করে মুসলমানরা মহানবির নেতৃত্বে জয়লাভ করেছিলেন সেই বিষয়ে বিস্মিত। যখন কাফেররা মুসলমানদেরকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছিল তখন মহানবি একটি খচ্চর হতে অবতরণ করে একমুষ্টি বালু হাতে নিলেন এবং এই কালামটি : ইয়া শাতিল ওজুহ অর্থাৎ ‘হে চেহারা (মুখমণ্ডল)-গুলো, বিবর্ণ হয়ে যাও’ পড়ে বালুতে ফুঁ দিয়ে প্রতিপক্ষের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাতে সকলেই পাথরের মতো স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই বিষয়ের উপর বিশদভাবে আলোচনা করার আশা রাখি পরবর্তীতে। কেননা, এই বিষয়টি সম্পূর্ণ একটি আধ্যাত্মিক, অলৌকিক বিষয় বলে আনু সমরবিদেরা মন্তব্য করেছেন।

১. আন সাহলিন কালা কালা রসুলুল্লাহ (সা) কালান্ লাহ তায়াল্লা আহাবু, এবাদি ইলাইয়া আজালুহম ফেতরান। (তিরমিজি)। সাহাল হতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা’আলা বলিতেছেন, আমার নিকট আমার বান্দাদের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তিই সর্বপেক্ষা প্রিয় (আহাবু এবাদি ইলাইয়া) যে তাহাদের মধ্য হইতে ইফতারকে তাড়াতাড়ি করে (আজালুহম ফেতরান)।

২. আন সাহলিন কালা রসুলুল্লাহ (সা) লা ইয়াজালুন নাসু বেখায়রিন মা আজ্জেলুলী ফেতরান। (বুখারি ও মুসলিম)। সাহাল হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মানুষের উত্তম (দিকটি) দূরীভূত হইবে না,

(লা ইয়াজ্জালু) যদি তাহারা ইফতারে তাড়াহুড়া না করে (ম্না আজ্জেলুনা ফেতরান)।

৩. আন উম্মরিন কালা কালা রসুলুল্লাহ (সা) ইজ্ আক্বালাল্ লাইলু মিন হাহনা ওয়া আদবারান নাহারু মিন হাহনা ওয়া গারাবাতিশ শাম্সু ফাকাদ আফতারাস সায়েমু। (বুখারি ও মুসলিম)। ওমর হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, ‘যখন রাত্রি আমাদের নিকট হইতে (মিন হাহনা) অগ্নবর্তী হয় (আক্বালা) এবং দিবস যখন আমাদের নিকট হইতে পিছাইয়া যায় (আদবারা) এবং সূর্য ডুবিয়া যায় (গারাবাতিন) সুতরাং অবশ্যই রোজাদার (সায়েম) ইফতার করিবে।’

সুফিসাধক আল্লাম্মা জামির একটি কালাম-এর ভাবার্থ

তেরে ইশকে মে হ্যায় মেরা আব ইয়ে আলম।
 তোমার প্রেমে আমার সমস্ত সত্তা বিলীন হয়ে আছে।
 কাভি জাবান্নাব হু কাভি শেরুলে মাতম।
 কখনো আমি সৃষ্টির সৌন্দর্যে বিভোর থাকি, কখনো আমি বিচ্ছেদ কান্নায়
 বিবর্ণ হয়ে যাই।
 ইয়ে কাহকে কার কার ম্যায় তেরা খায়রে মাকদাম।
 এটা আমি কিভাবে বলব যে, আমি তোমার ভালোবাসায় ফিরে আসব?
 বানোকে সিন্নানাতে জিগার মি ফারোশাম।
 যগের আবর্তনে আমি তোমাকে কিভাবে ধারণ করব?
 বা তেগে আদায়ে তো সারাম ফারোশাম।
 আমার মাথার উপর তো উলঙ্গ তলোয়ার রয়েছে, আমি তোমাকে কিভাবে
 ধারণ করব?

ব'শাওকাতে জা বালার আমদ আমান্নী।
 সৃষ্টির সৌন্দর্যের গতিময়তা নিয়েই আমি আমার শেষ পরিণতিতেও
 তোমার নিকট ফিরে আসি।
 ফা কমকম হয় হাবিবী কাম তানাম্মী।
 সুতরাং হে রাজার রাজা বন্ধু আমার, আর কতকাল ঘুমাবে?
 হাম্মা পায়গামবারো দার জুসুতো জোয়াম্ম।
 আমার সংবাদদাতাকে আমি আর কত কাল খুঁজব?
 খোদা হাম্মাদ কে দো বারচে মাকাম্মী।
 খোদাই ভালো জানেন যে, আমার অবস্থানটি কোথায় হবে?
 হাম্মা মা বার সারে জাম্ম বাতানকো।
 আমার দেহের পোশাকটি কি আমার মর্যাদা অনুপাতে হবে না?
 ফাকাদ সারগুয়ে বা কখ মাহে তাম্মাম্মী।
 সুতরাং শেষ পরিণতিতে আমার মর্যাদাপূর্ণ চন্দ্রমুখটির কী হবে?
 তাম্মদে খালাতে শাহী না দারাম্ম।
 শাহী দরবারে বন্ধুত্ব ছাড়া প্রবেশের অনুমতি আশা করা যায় না।
 বা সারকারে সেদে গুহে গোলাম্ম।
 পারের দরবারে ফকিরিই একমাত্র গোলাম্ম।
 বা ইসনে এহতাম্মাদু ইয়ারে জাম্মী।
 হে জাম্ম, তাম্মি তো পারের সৌন্দর্যের মাঝেই অভিভূত হয়ে আছি।
 তোফায়েলে দীদ জুরা ইয়াবদ তাম্মাম্মী।
 আমার শেষ পরিণতিতে আমার প্রতি একটু দয়ার দৃষ্টিতে দেখিও।

হজরত বাবা আমির খসরু রচিত কালাম-এর ভাবার্থ

বুয়ে দিল আজ গুবারে ম্মি আয়েদ।
 আমার অন্তর তোমার সোঁরভে আজ সম্পূর্ণ ভরপুর, যখন আমি নিজেকে
 পেয়েছি তোমাতে।

শায়েদাঁ শাহ সাওয়াবে ম্মি আয়েদ।

আম্মাকে তোমার মাঝে বিক্রি করতে পেরেছি বলেই তো, রাজাধিরাজের
গুড আগমন হয়েছে।

খাবারাম্ম রাশিদে ইনশাব কে নিগায়ে খাহি আম্মদ।

আম্মার ধারণাও ছিল না যে, রাজাধিরাজের গোপন বাণী ধ্যানসাধনায়
আম্মিকে তাড়িয়ে দেবার পরেই আসবে।

সারে ম্মান ফেদায়ে রাহে কে সাওয়াবে খাহি আম্মদ।

সবটুকু ম্মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার পর দেখি পরম্ম আপনরূপে ম্মূর্তিম্মান হয়ে
আসেন আম্মারই মাঝে।

হাম্মা আ হয়া সেহেরা সারে খুদী নিহাদা কারদি।

পরম্ম তাঁর নূতন রূপে নববধূর ম্মতো আগমন করেন যখন আম্মিকে আম্মি
নাই করতে পেরেছি।

বাউদি কে আঁকে বুঁদে বাসিতারে খাহি আম্মদ।

পরম্মের আগমন আম্মারই মাঝে আসে যখন আম্মিটা আর আম্মার মাঝে
থাকে না।

কাশাসে কে ইশকে দারাদ্ না গুজারে তাক্মাদিদ্দা।

ইশকের বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণা হাসিমুখে বরণ করে নিতে না পারলে পরম্মের
দর্শন লাভ হয় না।

বাজানা নাজার আগার না আয়ি বা ম্মাজারে খাহি আম্মদ।

আম্মার মাঝে আন্নি থাকলে পরম আসেন না, আর না থাকলে আন্নি সবার
তীর্থস্থানে পরিণত হই।

বয়াক আহম্মদাল অজুদে দিল দুইনও সবরো খসরু
আম্মার অস্তিত্বের সবটুকু এমনকি খসরুর অন্তর এবং ধর্মটিও।

চে শাবাদ আগার বাগিসা দোসেদারে খাহি আম্মদ।

পরমের দরজায় আসলে পর সামান্য চাওয়া-পাওয়াটুকু সঙ্গে রাখা যায়
কি!

তিনটি কবিতা/শাহ সুফি সাইয়েদ মোহাম্মদ নাসিম

আম্মার প্রাণপ্রিয় বাবাজান শাহ সুফি সাইয়েদ মোহাম্মদ নাসিম সাহেবের
আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর রচিত তিনটি কবিতা তুলে ধরলাম। যদিও
বাবাজানের অনুমতি নিতে পারি নি। বাবাজান চট্টগ্রামের বিখ্যাত বারো
আউলিয়াদের প্রধান সাইয়েদ মাহী সাওয়ারের প্রত্যক্ষ বংশধর। উনার
পিতামহ বেলায়েতের পরশমণি সাইয়েদ শাহ সুফি বাবা আবদুল লতিফ
আম্মানটুলী, যিনি বিশ্ব দরবার শরিফ আম্মানটোলা খানকা শরিফের

প্রতিষ্ঠাতা। চট্টগ্রামের মীরেরসরাই উপজেলায় অবস্থিত এই বিশ্ব দরবার শরিফ।

ভেদ রহস্য-১

এ কি খেলা খেলছো তুমি, মাথায় চক্কর মারে তোমার মকরান্নি দেখে।
মকরের মকর তুমি, চক্করের গোলক ধান্দায় চোখে যে সরষে ফুল ফোটে।
কত দোষ দেখতে পাই, তবু তোমার দোষ নাই, কোরানে তার সাফ
জবাব পাই।

তুমি নিখুঁত, সৃষ্টিও নিখুঁত, ভুলের কিছু নাই, সূরা মুলকের বাণীতে সব
কিছু যে ভুলে যাই।

না বুঝে অবুঝ মন দেয় গালি, তর্কের খাতায় কথার কোনো উত্তর নাই।
আজাজিল ফেরেশতার সরদার, একটি হুকুম না মেনে হয় শয়তান,
না মানার কথাটি শেখালো কোন শয়তান? ভেবে হই পেরেশান।
শয়তানের আগে শয়তান নাই, নদীর মিলন সাগরে পাই।

খাল নদীতে মিশে, নদী সাগরে মিশে, সাগর কোথায় মিশে এর জবাব
চাই।

শয়তানের যত দোষ যে খাসা একটা নব্দ ঘোষ
শয়তানের আগে শয়তান কে ছিল প্রশ্ন করাটা যে বড় দোষ।
সব গোম্মর ফাঁক হয় সবার চোখ খুলে যায়

বুঝেও না বুঝার করি ভান, ভেদ রহস্য চক্কর খায়।
 আনা খায়রুম মিন হ, উত্তম আমি আদম হতে,
 কে শেখালো বাণীটি? খোদা তোমায় দোষ দেই কোন মতে।
 শাস্তির কথায় পরান কাঁপে, 'জি হ্যাঁ, হজুর' করি সবে।
 তোমার প্রেমিক ভয় করে না তাই বলে ফেলে সবার কাছে।
 সর্ব দোষে দোষী তুমি, কালান্ন পড়ে পরিষ্কার বুঝি
 ভীতু বলে তুমি দয়াল প্রেমিক বলে, ভেদ বুঝি না আমি।
 ঢাকনা দিয়ে ঢাকতে চাই, তবু কেন গন্ধ পাই?
 সুফি নাস্তি বলে এসব কথা বলতে নাই।
 প্রেমিক যদি হতে চাও আপন কাঁধে সব দোষ মাথা পেতে লও
 খোদাকে না দুখে আপনাকে দোষ, হাসি মুখে সব বিষ পান করে নাও।
 ঐ বিষের জ্বালায় মাওলা পরাবে আপন হবার ফুলমালা
 মনসুর কয় আনাল হক। এক বিনে দুই আর থাকে না তখন
 ফানার মোকামে পীর-মুরিদ এক হয় শের্ক-বেদাতের হয় মরণ।
 সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা ফা কানা কাবা কাওসাইনে আও আদনা
 আহাদ আর আহমদ এক হয়, ওহাবি আর শিয়া তো তা বোঝে না!

ভেদ রহস্য-২

রূপকথার গল্প শুনতে লাগে বড় মজা

সত্যকথার সত্য শুনতে লাগে তেমনি তিতা,
 যদি না থাকে মন ঘরে ভক্তি, ভণ্ড হয় কামেল পীর
 মনের ঘরে সোনা হয় পিতল এ ভেদ যে কত গভীর।
 আসল ফেলে নকল ধরে গলাবাজি করছে যারা
 তকদিরের লিখন কপালে নাচে খণ্ডাবে কেমনে তারা?
 লিখন-পড়ন জ্ঞান-গবেষণায় পাবে তুমি অনেক সভ্যতা
 হেরা গুহায় ধ্যানসাধনায় পাবে তুমি আপনার ঠিকানা।
 হাজার সালাম জানাই জ্ঞান-গবেষণার অবাক যত ফল
 তৃপ্তি আছে, শান্তি আছে, মরীচিকায় আছে মেকি জল!
 তা না হলে কি এত কিছু পেয়েও পায় না কিছু
 দেহঘরে আত্মা কাঁদে কেন ছোট্টে কামেল গুরু পিছু।
 আপনাকে চিনতে হলে হয় না দরকার জ্ঞান-বিদ্যার ধমক
 গুরুকে দ্রু-যুগলে, বাম্ন বুকে সদাই যদি রাখতে পারো
 সব রহস্যের জট খুলে দেখতে পাবি আপন চমক।
 ঈসা, মুসা, বুদ্ধ, কৃষ্ণ সবাই করেছে আপন সাধন
 মহানবির মহাবাণী আপন আর রবেতে থাকে না কোনো বাঁধন।
 দিস না ফেলে পুঁথির বিদ্যা একমনে গবেষণা চালিয়ে যা
 না হলে পিছিয়ে থাকবি এই দুনিয়ায় দাম্ন পাবি না এক পয়সা।
 ফিকির আর ফকির বাম্ন আর ডান হাত

একটা ফেলে আরেকটা ধরলে বোকার স্বর্গবাস।
 মন বাঁধ, শক্ত হও, কাঁধে লও ইঁবনে সিনা আর রুম্মি
 সুফি নাস্টম বলে এক কাঁধে আমার বিজ্ঞান, অপরটি সুফি।

ভেদ রহস্য-৩

গোপনের গোপন কথা মন দিয়া শোন জনগণ
 মাথায় হাত, চোখে জল, মনে ভাসে যত গুপ্তগোল।
 না মানিয়া হকুম আদম-হাওয়া গন্ধম খাইলো রে॥
 দোষ না করিয়া তাদের দোষে হইলাম দোষী যে।
 তালা বুলিয়ে দাও মুখে, যুগের ভাষায় ভেটো মারে
 তুমি আল্লা, আমি বান্দা, পারি না তোমার ভেদ বুঝিতে।
 সূরা মুলকের মা তারাফি খাল্কির রাহমানি মিন তাফাউত
 বাণীটি শুনে মানে বুঝি, ভেদ রহস্য ঘাঁটতে গিয়ে হই ফতুর।
 কামেল ওলিকে প্রশ্ন করলে হাসে মনে মনে
 এজিদকেও গালি দেয় না খাজা বাবা, শুনতে কেমন লাগে!
 বাবার পাপ ছেলেকে দাও না তুমি, পাপ-পুণ্যের হিসাব নেবে প্রতিজ্ঞের
 কাছে
 মরণ কেয়ামতে পাপ-পুণ্যের হিসাব দেখতে পাবে সবার হাতে হাতে।
 এ কী আজব খেলা খেলছো তুমি ভবের বাজারে?

ডেবে পাই না পার-কূল জ্বাবটি থেকে যায় আঁধারে।
 আদম-হাওয়া বারণ করা গাছের মজা নয় অবশেষে,
 দুনিয়া নামক জেলখানাতে ফেলে দাও সেই অপরাধে।
 জান্নাতে যাই নি আমরা, মানা করা গাছের মজা তো অনেক পরের কথা,
 তবে কেন আগমন এই দুনিয়ায় জীবন রহস্য পড়ছে না যে ধরা।
 যার যার হিসাব সে সে দেবে আমলনামা উঠে আসবে হাতে
 তবে কেন আদম-হাওয়ার হিসাব পড়ছে তোমার আমার কপালে?
 এই কথার উত্তর চাই, কোরানের বাণীতে এমন কথা নাই।
 উত্তরের উত্তর চাই, বিদ্যার খাল ডোবাতে ডুবিয়ে যাই।
 সুফি নাস্টম ডেবে হয় পেরেশান পাগল হবার পথে
 একজনের বোঝা বইবে না অন্য জনে এই কালামটি শুনে।
 তিনটি কবিতা/ অধ্যাপক জামাল

ইমাম হোসাইন
 শত কোটি প্রণাম, হে হোসাইন, তোমায়।
 তুমি জ্বালিয়ে দিচ্ছে প্রেমের অনল
 রক্তে রাঙানো হাহাকার করা কারবালায়।
 তোমার সেই অনল ছড়িয়ে গেছে বিশ্বময়
 জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে

সারা বিশ্বের প্রেমিকের হৃদয়।

তোমায় যারা শহিদ করেছে কারবালায়
 ছিল না তারা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান
 ছিল তারা দাড়ি-টুপিওয়ালা মুসলমান।
 এজিদের তাঁবুতে আজান হয়েছিল
 হুসাইনের তাঁবুতেও তা-ই,
 সীমারের তাঁবুতে রুকু-সেজদা
 হুসাইনের তাঁবুতেও তা-ই,
 কাকে বলিবে নামাজি জাহান
 কাকে বলিবে বেইমান?

সাহাবি বলিব কাকে আমি,
 মুসলমান বলিব কাকে?
 সেদিন হোসাইনের বিরুদ্ধে একুশ হাজার
 সাহাবি অস্ত্র ধরেছিল মার্চে,
 তারা ছিল মোহাদ্দেস, মোফাচ্ছেরে জামান,
 হাফেজ, কারী, মাওলানা,
 এখনও ফরমান মাওলানা সাহেব

করা যাবে না কোনো মন্তব্য
 সাহাবিরা যে আকাশের নক্সাতুল্য।
 হোসাইন বলেছিল কারাবালায়
 আমি কী অপরাধ করেছি
 যে হত্যা করবে আমায়?
 তোমাদের মধ্যে একজনও মুসলমান নেই
 যে সাহায্য করবে আমায়?
 বাণী শুনে এজিদ থেকে চলে এলেন
 হর, হরের ছেলের তেত্রিশ জন
 যুদ্ধ করে শহিদ হলেন তাঁরা
 মুসলমান তাঁরা, না সেই সাহাবারা?
 সেই সাহাবারা নবির বংশের রক্তে
 লাল করেছিল কারবালা
 তবু হোসাইন, তুমি মাথা নত করো নি,
 তোমার প্রেমিকেরাও করবে না
 জনম জন্মান্তরে।
 তুমি দেখিয়ে দিয়েছ সূক্ষ্মভাবে
 আসল আর নকলের কত ফারাক
 তুমি বুঝিয়ে দিয়েছ

দাড়িটুপি থাকলেই হয় না মুসলমান,
 নামাজ পড়লেই হয় না নামাজি,
 অনেক সময় হয়ে যায় এটাই
 দোজখের চাবি!

সাহাবিরা আমাদের মাথার তাজ ও আকাশের নক্সত্রতুল্য, কিন্তু তাদের
 কথা নয় যারা নবির বংশকে পদে পদে নির্যাতন করেছে।

খারেজিদের চেহারা

এরাই খারেজি।
 খারেজি মানে কী জানো?
 খারেজি হলো দলত্যাগী।
 কার দল ত্যাগ করেছিল তারা?
 ইতিহাস খুলে দেখ তোমরা
 দুমাতুল জন্মের রায়কে অমান্য করে
 আলির পক্ষ ত্যাগ করে
 বার হাজার সৈন্য মিলিত হয়
 হারুরা নামক প্রান্তরে

নেতা তাদের নির্বাচন করে
 আবদুল্লাহ বিন ওহাবকে।
 আলিকে ত্যাগ করে বলে :
 লা হকম্মা ইল্লাহ বিল্লাহ॥
 এরাই খারেজি।

আলি আছে সত্যের মাঝে,
 সত্য আছে আলির মাঝে॥
 তা কী দিয়ে বুঝানো যাবে?
 আলি যে দিকে যায়
 সত্য সে দিকে যায়
 মহানবির তা ফরমান,
 সেই সত্যকে ছেড়ে দিলে
 মিথ্যা ছাড়া কী পাওয়া যায়?
 খারেজিরা তো সেই সত্যকে ছেড়ে
 মিথ্যাকে বুকে নিয়েছিল,
 খারেজিরা সত্যের মাঝে হলে
 আলি মিথ্যার মাঝে পড়ে যায়,
 তা হলে যে নবির বাণী মিথ্যা হয়ে যায়

তা কী করে সম্ভব।
 সম্ভব বলে মেনে নেয় যারা
 এরাই খারেজি।

এরাই নাহওয়ানের প্রান্তরে
 শিবির স্থাপন করে আন্দোলনের তরে
 আলি সংবাদ পেয়ে তাদের ঘোলা পানি
 খাইয়ে ছাড়ে নাহওয়ানের প্রান্তরে
 তারপরও যত ঝামেলা করেছে
 যারা এই দুনিয়া জুড়ে
 এরাই খারেজি।

এরাই আলিকে ইসলামের শান্তি
 বিনষ্টকারী বলে, হত্যার ষড়যন্ত্র চালায়
 অবশেষে তারাই খারেজি সম্প্রদায়ের
 আবদুর রহমান ইবনে মুলযাজকে দিয়ে
 কুফার মসজিদে নামাজরত অবস্থায়
 শহিদ করেছে আলিকে
 হত্যা করেছে সত্যকে
 এরাই খারেজি।

এরাই হাদিস জালকারী
 যখন খুশি যেভাবে খুশি
 হাদিস বানাতে তারা
 প্রথম হাদিস জালকারী ছিল
 ইবনে লাহইয়া নামে পরিচিত
 লাহইয়া ছিল খারেজি দলভুক্ত
 কিতাবুল মওজুয়াত গ্রন্থে প্রমাণিত
 বিশ্বের ডেজাল হাদিসের জন্য দায়ী যারা
 খারেজি নামেই পরিচিত তারা
 এরাই খারেজি।
 মুসলিম জাহানে কম বিশ্বাসখলা
 সৃষ্টি করে নি তারা
 উমাইয়া আমলে বিশ্বাসখলা করেছে
 লাঠিপেটাও খেয়েছে
 আব্বাসি আমলেও করেছে
 লাঠিপেটাও খেয়েছে
 পেটা খাইতে খাইতে পালিয়ে
 মিশরে আসতে বাধ্য হয়েছে
 মিশরে এসেও মরেছে

ফাতেমীয়দের হাতে
 রাজনীতি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে
 বিপদে পড়ে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়েছে
 এরাই খারেজি।

আজ সত্যের দাওয়াত দেয় তারা
 সত্যকে হত্যা করে,
 আজ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তারা
 ইসলামকে বিভক্ত করে,
 আজ মানুষকে রং-বেরংয়ের
 হাদিস শোনায় তারা
 অর্থাৎ তাদের মাঝেই বর্তমানে
 ডেজাল হাদিসের কারখানা।
 এরা আলি মানে নাই
 আলি মানে না মাজার মানে না
 মরদুদের পথই তাদের বেহেশত খানা
 আমার কবিতার প্রাণে তাই দিয়েছি
 ইতিহাসে যা পেয়েছি
 গ্রহণ করবে তারা
 তকদির যাদের খাড়া

গ্রহণ করবে না তারা
তকদির যাদের মরা
এরাই খারেজি!

কী করে সাহাবি বলি তাকে
কী করে সাহাবি বলি তাকে
যে করেছিল সিফফিনের প্রান্তরে
হজরত আলি (আ.)-এর সাথে প্রতারণার খেলা!
বর্ষার অগ্রভাগে কুরআন বুলিষে
মানব কুরআনের সাথে করেছে বেইমানির খেলা।
যে আলি (আ.)-কে রসূল বলেছিল
আলি আম্মা হতে, আম্মি আলি হতে;
যে ভালবাসে আলিকে, সে বাসে আম্মাকে;
যে যুদ্ধ করে আলির সাথে, সে করে আম্মার সাথে।
মোয়াবিয়া যুদ্ধ তো করেছিল আলি (আ.)-এর সাথেই
না! না! এই যুদ্ধ আলি (আ.)-এর সাথে নয়
এই যুদ্ধ করেছিল স্বয়ং রসূলের সাথে
কী করে সাহাবি বলি তাকে!
যে করেছিল ইমাম হাসান (আ.)-এর সাথে চরম প্রতারণা

সারা আরব জাহানে সৃষ্টি করেছিল বিশ্বক্সলা।
 শান্তির জন্য ইমাম হাসান (আ.) সন্ধি করেছে তার সাথে
 তবুও সে অশান্তি সৃষ্টি করেছে সবখানে।
 সন্ধিতে লিখিত ছিল মোয়াবিয়া শায়িত হলে
 হাসান থাকবে আবারও সেই মসনদে।
 না থাকিলে হাসান এ ভুবনে
 হোসাইন বসবে সেই মসনদে।
 কিন্তু করেছিল সে কী?
 করেছিল জুমার খুৎবায় আলি (আ.)-এর
 বংশের উপর অভিশাপের প্রচলন।
 বেইমানি করে জহর খাওয়ায়ে
 ইমাম হাসান (আ.)-এর করেছে প্রাণনাশন।
 এই তো সেই নিষ্ঠুর মোয়াবিয়া,
 কী করে সাহাবি বলি তাকে।
 সে মৃত্যুর আগে, সন্ধিভঙ্গ করে
 মসনদে বসাইয়া গেছে কু-পুত্রজন।
 হোসাইন (আ.) তা মেনে নেয় নি বলে
 রক্তে লাল হয়েছে কারবালার প্রান্তর।
 হোসাইন (আ.) শহিদ হয়েছে কারবালায়

বিশ্ব কেঁদেছে, কাঁদছে, কাঁদতে থাকবে
 যতদিন থাকবে এ বিশ্ব ধরা।
 কাঁদে নাই তারা যারা ছিল মোয়াবিয়ার গোলাম।
 যাদের মাথায় টুপি ছিল, দাড়ি ছিল মুখে
 পড়িত পাঁচওয়াক্ত নামাজ।
 আজও কাঁদে না তারা হোসাইন (আ.)-এর জন্য
 ফতোয়া মারে আজও মোয়াবিয়ার বংশরা
 কাঁদিলে হোসাইন (আ.)-এর জন্য ফায়দা হবে না
 রহমত থাকবে না ধরায়।
 এরা তো তারই ফয়েজপ্রাপ্ত
 কী করে সাহাবি বলি তাকে!
 যার পিতা সুফিয়ান সারাটি জীবন
 রসুলকে করেছিল পদে পদে জ্বালাতন
 কালেমা পাঠ করেছিল মৃত্যু দেখেছে যখন।
 যার মাতা হিন্দা, রসুলের প্রাণের চাচা
 হামজার কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল।
 সেই ডাইনির সন্তান ভালো হয় কোন গুণে।
 আমি আমার মূর্শেদের কণ্ঠে
 কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই॥

দোজখে যদি যেতে হয় যাব
 তবু সাহাবির স্বীকৃতি কোন মুখে দেব?
 ইমাম বংশের উপর এত নিষ্ঠুরতার পর
 সাহাবির খাতায় নাম থাকে কী করে?
 সাহাবি হলে আলে মুহাম্মদের উপর
 নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার করে কী করে?
 তাই আমি

কী করে সাহাবি বলি তাকে!

উপরের ছবিটি য়ার, তিনি আমার শিক্ষাগুরু। পরম পূজনীয়। পীরপূজারি।
 সুফিবাদের আদর্শে জীবন ও দর্শন অবগাহন করেছেন। লা-মোকামে
 খোদার অবস্থান, এটা সবারই কমবেশি জানা। কিন্তু জিন ও মানুষ নামক
 দুটো প্রাণীর মাঝেই যে খোদা জাতরূপে লুকিয়ে আছেন, এটা বোঝা
 কষ্টকর। যারা বুঝতে পারেন তারা সুফিবাদে আসতে বাধ্য। কোরান-এ
 খোদা বলেন যে, আমরা তোমাদের জীবন-রগের (শাহারগের) নিকটেই
 আছি। এই থাকার জন্যই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। খোদা কখনো অন্য
 কোনো জীব-জন্তুর শাহারগের নিকটে থাকেন না এবং থাকবার আইনটি
 কোরান-এর একটি আয়াতেও নাই। এমনকি পাহাড়-পর্বত, নদী আর
 সাগরের নিকটে আছেন, খোদা এ কথাটিও বলেন নি। আর সমস্ত
 সৃষ্টিরাজ্য, তা যতই বিশাল ও ব্যাপক হোক না কেন, খোদা নিকটেই

আছেন-এ কথাটি বলা হয় নি। তাই সমস্ত সৃষ্টিরাজ্য সেফাত তথা গুণাবলি। খোদার এই জ্ঞাত ও সেফাতের ফর্মুলাটি জানা না থাকলে কেমন করে ইসলাম গবেষক হয় এবং পীর-ফকির হয় তা আমাদের জানা নাই। নফস তথা প্রাণ তথা জীবাত্মা আর রুহ তথা পরমাত্মা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। ইহা কখনোই এবং কোনো অবস্থাতেই এক বিষয় নয়। কারণ, নফস তথা প্রাণ তথা জীবাত্মা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে, কিন্তু রুহ তথা পরমাত্মার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার কথাটি কোরান বলে নি। নফস জন্মগ্রহণ করে, তাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। যে নফসটি জন্মগ্রহণ করে সেই নফসটি জন্ম দিতেও পারে। নফস জন্ম-মৃত্যুর অধীন যেহেতু, সেইহেতু বিশ্রাম, পরিশ্রম, ক্লান্তি, অবসাদ, ঘুম, খাদ্য-পানীয় গ্রহণ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি লোভনীয় বিষয়গুলো আর্কৈপৃষ্ঠে তথা গিরায় গিরায় বাঁধা থাকে। রুহ তথা পরমাত্মা এই জাতীয় সর্বপ্রকার বুটঝামেলা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাটা মোটেই ধ্বংস হওয়া নয়, বরং পরিবর্তন। নফসটি তথা প্রাণটি তথা জীবাত্মাটি দেহ নয় তথা শরীর নয়, বরং নফসটিকে তথা প্রাণটিকে তথা জীবাত্মাটিকে ধারণ করার পাত্র হলো শরীর। এই পাত্র হতে নফস তথা প্রাণটি বিদায় গ্রহণ করলে পাত্রটি সঙ্গে সঙ্গে নাম ধারণ করে লাশ। সুতরাং লাশটি মেজাজি কবরে যায় এবং হিন্দুদের লাশটি শ্মশানে যায়। মেজাজি কবরে আজাব হয় বলে মানতে হয়, কিন্তু নফস তথা প্রাণটিকে যে পাত্রটি ধারণ করে আছে সে পাত্রটি

তথা জীবন্ত দেহটিকেই প্রতিদিন কবরের আজাব ভোগ করতে হয়। এই ভেদ-রহস্যগুলো যিনি বা যারা জানতে পেরেছেন তারা সুফিবাদে আসতে বাধ্য। সুতরাং জনাব লুৎফর রহমান চৌধুরী এসব বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী। তাই উনি অধম লিখকের শিক্ষাগুরু।

বংশ পরিচয়ের প্রশ্নে এত উন্নতমানের বংশ সমগ্র কেরানীগঞ্জ উপজেলায় আর একটি আছে কি-না আমার জানা নাই। উচ্চশিক্ষা এবং ধনসম্পদ দুটোর একসঙ্গে এত সুন্দরভাবে অবস্থানটির কথা বিস্ময়কর। উনার পিতা হাজি আজিজুর রহমান চৌধুরী ওরফে জুলু চৌধুরী ছিলেন প্রাক্তন সংসদ সদস্য এবং এম্প্লয় পাস এবং সেইদিনের কোটিপতি। উনার দাদা হাজি ইব্রাহিম চৌধুরী মাদ্রাসা-শিক্ষায় শিক্ষিত এবং লাখপতি। উনার বড় বাবা জনাব খতিব চৌধুরীও মাদ্রাসা-শিক্ষায় শিক্ষিত এবং লাখপতি। আমার শিক্ষাগুরুর তিনটি মেয়ে : প্রথম কোহিনুর চৌধুরী, যিনি ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও এমএ; দ্বিতীয় মেয়ে শাহিনুর চৌধুরী, যিনি ভূগোলে অনার্স এবং এমএ; তৃতীয় মেয়ে সুরাইয়া চৌধুরী হোম ইকোনমিক্সে অনার্স ও এমএ। উনি ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার লঙ্করদিয়া গ্রামের অ্যাডভোকেট শাহ মুহাম্মদ ছাদেকুর রহমানের মেয়ে ফেরদৌসি বেগম চৌধুরীকে বিবাহ করেন। উনার স্ত্রী ফেরদৌসি বেগম চৌধুরীকে আমার দৃষ্টিতে তাপসী বলা যায়। কারণ আমার শিক্ষাগুরুর স্বপ্তরের বংশ হজরত শাহ সুফি সৈয়দ আবদুর রহমান দানেশমন্ড হতে আগত।

আম্মার চোখে যিনি অনেক বড় মাপের মানুষ, সেই শাহ সুফি সলিমুল্লাহ
সাহেবকে আম্মার রচনার দুয়ারে রেখে দিলাম

পরম শ্রদ্ধেয় শাহ সুফি সলিমুল্লাহ সাহেব একজন শিল্পপতি এবং পরিশ্রমী।
উনাকে পরিশ্রম এবং শৃঙ্খলার প্রতিমূর্তি বলা যায়। উনি কেবল
সুফিবাদেই বিশ্বাসী নন, বরং প্রচুর পড়াশোনা করেছেন এই বিষয়ে। উনি
বাংলার বিখ্যাত পীর সৈয়দ শাহ সুফি বাবা খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ
সাহেবের ভক্ত। উনি আম্মার রচিত প্রতিটি বই পড়েছেন এবং ওয়াজের
অডিও-ভিডিও ক্যাসেটগুলো শুনেছেন ও দেখেছেন। উনার মুখের প্রশংসা
এবং আম্মার শিক্ষাপ্রকৃ জনাব লুৎফর রহমান চৌধুরীর প্রশংসা প্রায় একই
রকম। উনারা এবং আরও অনেকে মনে করেন যে, বর্তমান বিশ্বে
সুফিবাদের উপর আম্মার রচনার আর কোনো তুলনাই হয় না। অংকের
হিসাবের মতো প্রতিটি বিষয় তুলে ধরার কথাটি তারা বলেন। তবে দুইটি
কথায় উভয়ে চমকে ওঠেন। প্রথম কথাটি হলো, লাহত মোকাম্মে প্রবেশ

করার সঙ্গে সঙ্গে আপন পীর ডানদিক দিখে চলে যান এবং বাম দিক দিখে খান্নাসরূপী শয়তান পালিয়ে যায়। তখন সাধক নিজের মধ্যে দেখতে পান যে, তার পীরও তিনি, মুরিদও তিনি। এখানে আসতে পারলেই তৌহিদ। কারণ, পীর ধরাটাও শেরেক। তবে ইহাই শেষ শেরেক। কারণ, তখনও দুইজন আছে। তৌহিদে বিধান নাই দুই থাকার, নতুবা আমরা সবাই হাকিকি শেরেকের মাঝে ডুবে আছি। কারণ, মেজাজি শেরেকটা হলো রূপক শেরেক, অনেকটা রূপক শয়তানের মতো।

দ্বিতীয় কথাটি হলো, মোরাকাবার ধ্যানসাধনা ছাড়া সিনার এলেন্ন হাসিল করা যায় না (মাদার জাত ওলির কথা আলাদা)। কতগুলো কথার বস্তা জানা যায় এবং এই কথার বস্তা দিখে চমক তৈরি করা যায়। কিন্তু রহস্যের জ্ঞান অর্জন করা যায় না। ছবিতে বাঘ-সিংহ দেখার মতো। বাস্তবে নয়। তা ছাড়া সুফিবাদ বাকিতে দিতে জানে না। জাহের-পরস্তরা সব কিছু বাকিতে পাবার কথাটি বলে, তথা মরে যাবার পর পাওয়া যাবে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অন্ধ সে আখেরাতেও অন্ধ। মহানবি হেরা গুহায় যে পনেরটি বছর ধ্যানসাধনা করেছেন তাতে বাকিতে নবুয়ত, বাকিতে কোরান এবং বাকিতে জিবরাইল আমিনকে পান নি, বরং সব কিছু নগদই পেয়েছেন। এই নগদ আর বাকির রহস্য যারা বুঝতে পারেন নি তাদেরও দোষ নাই। কারণ, ইহা পূর্বজন্মের কর্মফল নামক তকদির। ছাগল আর গাধাকে, ছাগল আর

গাধা বলে গালি দিয়ে লাভ নেই; কারণ, আল্লাহপাক এদেরকে ছাগল আর গাধাই বানিয়েছেন।

আমি (লিখক) মোরাকাবার ধ্যানসাধনা করার একটি ফর্মুলা দিয়েছি। আমার এই ফর্মুলা অনুসরণ করে মাত্র একশত বিশ (১২০) দিন ধ্যানসাধনা করে দেখুন, রহস্যলোকের কিছু না কিছু দেখতে পাবেন। যদি কিছুই না পান তো আমার সামনে এসে মন্থুক বলে যা মনে চায় গালাগালি করবেন। আমি মাথা নিচু করে থাকব। একজন খাস ওহাবি আলেম আমার এ রকম কথা শুনে ধ্যানসাধনায় বসে গেলেন। অবশেষে একটানা একটি বছর ধ্যানসাধনা করে সে কী করুণ কান্না! আমার এই রকম টাছাছোলা কথাগুলো পরম শ্রদ্ধেয় শাহ সুফি সলিমুল্লাহ সাহেবের কাছে ভাল লাগে বলেই তিনি ধ্যানসাধনা করার কথাটি বললেন। আল্লাহপাক উনাকে ধ্যানসাধনা করার সময় ও সুযোগ এবং বিশেষ রহমত দান করুন, এই কামনাই করি।

আমার লিখনীর পাশে গাউসুল আজম বাবা ভাণ্ডারীর মুরিদ বাবাজান
ইস্রাফিলকে অমর করে রাখলাম

যে-অমরতাটি তুনকো নয় যে ভেঙে যাবে, যে-অমরতার কথা কয়টি সবাই
না জানুক, কিছু যারা সুফিবাদে বিশ্বাসী তাদের হৃদয়ে চির-উজ্জ্বল হয়ে

থাকবে এবং হৃদয় হতে দু'হাত তুলে দোয়া করবে। কারণ, বইটি ছাপিয়ে পাঠকের হাতে তুলে দেবার মতো সামর্থ্য বর্তমানে আমার নাই বললেই চলে। আমি আগেই বলতাম এবং স্পষ্ট ভাষায় বলতাম যে, বর্তমান বাংলাদেশে মাত্র দুইজন ইচ্ছাকৃত গরিব পীর আছেন, যারা জীবন বাজি রেখে সুফিবাদটিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরছেন। প্রথমজন হলেন শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী এবং অপরজন অধম লিখক। কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই যে, দুইজনের লিখনী অত্যন্ত শক্তিশালী। দেখেছি, যারা সুফিবাদটি মেনে নিতে চান না তারাও দু'জনার লেখা পড়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খান। আর যারা আবু জাহেল-আবু লাহাব মার্কী মানুষ তাদের শত সমালোচনায়ও কিছু যায়-আসে না। মনে করে নিই যে, এ রকম মানুষ আগের যুগেও ছিল এবং এখনও আছে এবং পরেও থাকবে। বাজারে আজ সুফিবাদের উপর রচিত বইয়ের বড়ই অভাব। বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী রচিত সিররে হক জামে নূর, মাতলা উল উলুম আর নূরে হক গঞ্জে নূর এই তিনটি অপূর্ব বই পাই। সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ রচিত নূরুল আসরার তথা নূর তত্ত্ব বইটি, দুই খণ্ডে রচিত, চন্দ্রপাড়া দরবারে পাই। মানিকগঞ্জের গড় পাড়ার পীর সাহেব রচিত শরফুল ইনসান বইটি পাই। আরও কিছু কিছু যে সুফিবাদের উপর রচিত বই কিছু কিছু দরবার হতে বের হয়েছে তা-ও দেখতে পাই। শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীর রচিত বইগুলো তাঁর মুরিদ এবং ভক্তদের

অনুদানে বাজারে পাওয়া যায় এবং আমার বেলাতেও তাই। সবচেয়ে বড় কথাটি হলো যে, কোনো লিখক তাঁর রচিত বইয়ের স্বত্বটি (কপি রাইট) দিতে চান না, কিন্তু অধম লিখক একটি বইয়ের স্বত্বও (কপি রাইট) ধরে রাখি নি। বরং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছি যে, যে কেউ বইটি ছাপিয়ে বিক্রি অথবা প্রচার করতে পারবেন। এখানেই শেষ নয়, বরং লিখে দিয়েছি যে, লেখকের নামটি বাদ দিয়ে নিজের নামে প্রকাশ করতে পারবেন। কেন এ রকম কথাটি লিখলাম? যাতে সুফিবাদটি কী ও কেমন মানুষ জানুক এবং যারা প্রচার করতে চান তারা যেন কোনো আইনি বাঁধায় না পড়েন তারই নিশ্চয়তা।

খাজা গরিব নেওয়াজ আসরারে হাকিকি নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, যারা গোলাম তাদের জাকাত নাই। যারা নফসের গোলামি করছে তাদেরকে নফসের গোলামি হতে মুক্ত করতে জাকাত দাও। এটাই হাকিকি। আপনাদের জাকাতের টাকায় এই ছাপানো বই পড়ে যদি চৈতন্য আসে, অন্ধকার হতে আলো আছে বলে ধারণা জন্মায়, তো জাকাত দিতে দোষটি কোথায়? ম্লেজাজি জাকাতের আইনি মারপ্যাচ আর আরবি ব্যাকরণের দোহাই দেনেওয়ালাদের খপ্পরে যদি পড়ে যান তাতে বলার কিছুই নাই। কারণ, তকদির নীতি নির্ধারণ করে।

এইসব বাধা-বিঘ্ন পরওয়া না করে যে দুইজন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদেরকে ভক্তরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবে। সহসা আমার পাশে

এসে দাঁড়িয়েছেন ইস্রাফিল মিয়া। উনার আদি বাড়ি হলো গোপালগঞ্জ জেলার মোকসেদপুর থানার আলীপুর গ্রামে। উনার বাবা হাজি মন্সাজ মিয়া। বাবা ইস্রাফিল মিয়াই ছেলেদের মধ্যে বড়। উনি বর্তমানে ফরিদপুর সদরে গুহ লক্ষ্মীপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। উনি গাউসুল আজম বাবা ভাণ্ডারীর আওলাদ শাহ সুফি বাবা সৈয়দ মজিবুল বশর ভাণ্ডারীর মুরিদ। বাবা ইস্রাফিল যত বড় ধনী তার চেয়ে বহুগুণে ধনী তার হৃদয়। এ রকম হৃদয়বান মানুষ কমই দেখা যায়। সর্বঅবস্থায়, এমনকি প্রতিটি ওরসে, সাহায্যের হাত নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ান। অবশ্য উনার স্ত্রী, রাজবাড়ি জেলার মজলিসপুর গ্রামের সম্মানিত আবদুস সাত্তার মিয়ার কন্যা নাজমা পারভীন, আমার মুরিদ ও সাধক খলিফা। বাবা ইস্রাফিল মিয়ার দুই ছেলে : বড় জনের নাম নাজমুল হাসান আসাদ এবং ছোট ছেলের নাম শাহ মখদুম নাহিদ।

যার সার্বিক সহযোগিতায় ইতিহাস নয় সুফিবাদের রহস্য লিখতে পেরেছি
সেই রিয়া আক্তার জ্বাকে পাঠকের চোখেই রেখে দিলাম

ঐ উপরের ছবিটা যার দেখতে পাচ্ছেন, ওর নাম রিয়া আক্তার জ্বা। দর্শনে অনার্স পড়ত। জন্মভূমি বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার ডুলডিয়া ইউনিয়নের আটখোলা গ্রামে। পিতার নাম হাবিবুর রহমান এবং মাতা মল্লিকা বেগম। উচ্চ শিক্ষিত একটি পরিবার এবং

সুফিবাদে বিশ্বাসী। আমি নিজ হাতে আমার প্রাণপ্রিয় সাধক-খলিফা ডা. সোহেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি। এতগুলো কথা কেন লিখলাম? প্রয়োজন আছে কি? হয়তো হ্যাঁ, নয়তো না। আমি (লিখক) আমার সত্তর বছর ধর ধর বয়সে এত ত্যাগী, এত আদর্শবাদী, এত পীরপূজারি আর দেখি নি এবং সহজাত যে হিংসার্টুকু থাকে তার মধ্যে তার একটি ফোঁটাও দেখতে পাই নি। ইতিহাস নয় সুফিবাদের রহস্য লিখতে চাই নি। ওকে বলতাম, ছাপাবার পয়সা নাই। কারণ, হাত পাততে জানি না। কিন্তু এই রিয়া নামক মেয়েটি আমাকে অনেকটা জোর করে লিখিয়েছে। আমি রাত দুইটার পর বই লিখি। কাগজ, কলম এবং সাজানোর বিষয়গুলো আমার সামনে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতো। বিছানায় উপুড় হয়ে বুকে বালিশ দিয়ে বই লিখি। টেবিল-চেয়ারে বসে লিখতে পারি না। বই লিখার সময় পায়ের তলায় মৃদু তেল মালিশ করত আর আমি আরামে বই লিখতাম বাকি রাতটুকু। কখনও কফি গরম করে খাওয়াত, কখনও একটু সময় আমার প্রিয় একটি বাংলা গান রবি ঠাকুরের রচিত দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো তারে শোনাত। তারপর আবার লিখতাম। লজ্জায় বলছি যে, আমি কোনো বাংলা গান শুনি না; শুনি কেবল ফারসি ভাষায় আমার খসরু, বু আলী শাহ কলন্দর, হাফিজ সিরাজি, আল্লামা জামি, শামসে তাব্রিজ ও বেদম ওয়ারসির গানগুলো। রবি ঠাকুরের গানগুলো প্রায় সবই নেগেটিভ তথা না-সূচক এবং নেগেটিভ গান সবাই রচনা করে গেছেন। একমাত্র আমার

খসরুর গানগুলোই পজ্জিটিভ তথা হ্যাঁ-সূচক। নিজে ভালো আর প্রেমিকার
 মাঝে সংশয়ের বিলাপ পায় সব কবি। ‘ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা
 দায়’- এই নেগেটিভ তথা না-সূচক গান সবাই পছন্দ করে, কিন্তু কেউ
 যদি পজ্জিটিভ তথা হ্যাঁ-সূচক গান ‘ভবের নাট্যশালায় নিজেকে চেনা দায়’
 গায় তো পছন্দ না হবারই কথা। মানুষ সৃষ্টির মাঝে নেগেটিভ তথা না-
 সূচক খোঁজে। কারণ, মানুষ জানে না যে তারই সঙ্গে শয়তানকে খান্নাসরূপে
 দিয়ে দেওয়া হয়েছে। খান্নাস সব সময় নেগেটিভ তথা না-সূচক কথা-
 কবিতা-গান পছন্দ করে। সুতরাং যখনই পজ্জিটিভ তথা হ্যাঁ-সূচক
 বিষয়গুলো পছন্দ করবে তখনই সুফিবাদের দিকে ধাবিত হয়। হজরত
 আমির খসরুতে পাই প্রেমিকাকে দেবতার আসনে বসিয়ে নিজেকে ছোট
 করার করুণ কান্না আর প্রেমিকাকে বুকে তুলে নেবার দার্শনিক শৈলীর
 কতো রকম ঠং। রিয়া আক্তার জ্বা, তুমি আমার নারী-দর্শনের উপর
 একটি হালকা অথচ শক্ত আঘাত করে ঝাঁকুনি দিয়েছ। ধন্য হোক তোমার
 জীবন। অমর হয়ে থাকো আমারই পাশে।

অন্ধ পীরপুজারি নেওয়াজ আলী,
 তুমি তো আমারই আরেক কায়া

হজরত আমির খসরু বলেছেন, পীর পারাস্তি হক পারাস্তি, হজরত মুজাদ্দের আল ফেসানি সিরহিন্দ বলেছেন, পীরে তাস্ত আউয়াল মাবুদ তাস্ত; এই অতি উচ্চমানের দর্শন খুব অল্প সংখ্যক মানুষই বুঝতে পারে। যেমন, আইনস্টাইনের $E=mc^2$ দর্শনটি পৃথিবীর হাতেগোনা কয়েকজন বিজ্ঞানী বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং যে বা যারা এই উচ্চ দর্শনটি বুঝতে না পেরে বিকল্প মন্তব্য করেন তাদেরকেও দোষ দিতে নাই। কারণ, পূর্বজন্মের কর্মফল নামক তকদিরটি বদলায় না।

জীবনটা যার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে, ছোটবেলায় বাবা হারিয়ে মায়ের আদরে অসম্ভব কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে অল্প বয়সে সৌদি আরবে গিয়ে বৈষয়িক উন্নতির প্রশ্নে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে আজ নেওয়াজ আলী একজন সফল ব্যবসায়ী এবং কোটিপতি। পঁচিশটি বছর তুমি রিয়াদে আছ। আমার উপর এতটি বছর যে ভক্তির প্রকাশ ফুটেছে তা বইতে লিখা যায় না। যদিও অনুষ্ঠানের ধর্ম বিষয়ে তোমার-আমার যথেষ্ট শৈথিল্য আছে, কিন্তু অবহেলা করি না। তোমার দুই-তিনটি কথা মনে হলেই অবাক হই। তুমি প্রায়ই বলো যে, আল্লাহ মানা সহজ, কিন্তু পীর মানা খুবই কঠিন। তুমি বলো যে, ধূমপান হতে বিরত হতে আল্লাহ বলবেন না, বরং আপন পীরই মানা করবেন এবং তখনই মোচড়ামুচড়ি (টালবাহানা) শুরু হয়ে যাবে। বই ছাপানোর জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছ বলেই তোমার

ছবিসহ এই কথাগুলো লিখলাম। টাকা না দিলে বইতে ছবিও যেত না, এই কথাগুলিও লিখতাম না। শুনতে স্বার্থপরতার একটি বিকট গন্ধ আসে, কিছু উপায় নাই। কারণ, সমস্ত মুরিদানের সিদ্ধান্তটি হলো যে, পঞ্চাশ হাজার টাকা যিনি দান করবেন তারই ছবি দেওয়া হবে ও তার সম্পর্কে কিছু কথা লিখতে হবে। মানুষের ভেতর খান্নাসরূপী শয়তানটি জাতসাপের মতো এই কথাগুলো শুনে বারবার ফণা তুলে ছোবল মারার সুযোগ খুঁজবে।

কেরানীগঞ্জ উপজেলার বাম্বা ইউনিয়নের ভাওয়ারভিটি গ্রামে তোমার জন্ম এবং নিজ গ্রামে সবার কাছে কমবেশি ইজ্জত পাওয়াটা সহজ কথা নয়। এদিক দিয়ে তুমি ভাগ্যবান। আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া করি, তোমার জীবনটি আরও সুন্দর, আরও সার্থক হোক।

বাবা ফয়েজ- তুমি তো আমারই

হাতের আঙুল যেমন আয়না দিয়ে দেখতে হয় না, সে রকম তোমার উপর কোনো কথা চলে না। অনেক কিছুই হয়তো একটু গুছিয়ে লিখতাম, কিছু লিখতে গেলে শরম করে। কারণ, আমার প্রাণপ্রিয় মেয়ে ইরমকে তোমার হাতেই তুলে দিয়েছি। কেবল একটি কথাই লিখলাম আর সেটা হলো, আমার মেয়ে ইরম যখন আমেরিকা হতে আসলো তখন অনেক ছোট-বড় বিয়ের কাজ এসেছে, কিছু কোনো দিকে না তাকিয়ে তোমারই হাতে তুলে

দিয়েছি। হাজার হাজার কোটি টাকার ওহাবি মালিকের একমাত্র ছেলের হাতেও আমার মেয়ে তুলে দিব না, এটা তুমি ভালো করেই জানো। অবশ্য আর একটি কথা বলতেই হয়, আর সেটা হলো : ম্যাট্রিক হতে এমএ পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছি। সুফিবাদ এবং অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে তোমার প্রচুর পড়াশোনা আছে এবং এত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলো যে, আমি নিজেই চমকে যাই। তুমি বলেছিলে একটি কথা আর সেটা হলো, যারা আগাছামারকা মুরিদ, ওদের চলে যাওয়াই ভালো। কারণ, এই আগাছামারকা মুরিদরাই সুফিবাদের দুয়ারে পায়খানা-প্রস্রাব করে সুফিবাদকে নষ্ট করে দেয় এবং অনুষ্ঠানের অনেক রকম অলঙ্কার পরাতে চায়। নীতিশাস্ত্র আর প্রেম মোটেই এক বিষয় নয়, বরং দুই মেরুতে অবস্থান করে এবং এই দুটোকে এক করে লাবড়া পাকিয়ে তারা অনেক ভক্ত মুরিদকে বিভ্রান্ত করে।

তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা বই ছাপাতে সাহায্য করেছে বলেই ছবি ও কিছু কথা লিখলাম। ছবি ও কিছু কথা না লিখলে সমস্ত মুরিদানের সিদ্ধান্তটির অপমান করা হয়। অন্য চার মেয়ের জামাই বইতে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে, কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয় নাই; তাই ছবি ও কিছু কথা লিখার প্রশ্নই ওঠে না। তোমার পিতা শ্রদ্ধেয় মহিউদ্দিন ভাইজান এবং তোমার দাদা আনসার উদ্দিন আহমদ সবাই সুরেশ্বরীর মুরিদ। তোমাদের

বাড়ি ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার সুতারপাড়া ইউনিয়নের মুসিকান্দা গ্রামে।

আমার প্রাণপ্রিয় খলিফাদের মাঝে সিরাজ বাবাজান একজন

আপনাকে দশটি বছর ঘরবার পর মুরিদ করেছিলাম। কত রকম কথা বলে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছি, কিন্তু পারি নাই। কারণ, সংকল্পে অটল ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পার মাওলানা জাকির শাহ ফকির আল-সুরেশ্বরীর একটি কথা বারবার মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন যে, যে তোমার খাস মুরিদ, তাকে তাড়াতে পারবে না; যেমন ছোটা বিভাল এটা-সেটায় মুখ দেবার কারণে গৃহিণী বস্তায় ভরে অনেক দূরে ফেলে দেয়, কিন্তু আবার সে ফিরে আসে। আর যে থাকবে নয় সে দশ-বারো বছর সেবা করার পরও সামান্য কারণে চলে যাবে। সিরাজদিখানের বাবাজান সিরাজ আমার সে রকমই খলিফা। বই ছাপার ঢাকা তো তুচ্ছ : হাতখরচ, তিনটি ওরসের খরচ, বস্তা বস্তা আলু, মাছ, সবজি হতে আচার পর্যন্ত দিয়ে যান। জাকাতির কাপড় আর লুঙ্গির একটি অংশ আমার মাধ্যমে দান করেন। যা বলব তাই করবে। যদি বলি দাঁড়িয়ে থাকেন, তো অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকবেন। এ জন্য খব সাবধানে কথা বলতে হয়। অদ্ভুত এক ভুরু সিরাজ বাবাজান। উনার দাঁদাজান হতে সবাই সুরেশ্বরীর ভুরু। ওহাবিদের গরম বাতাস তাদের গায়ে লাগে নি। আর লাগবে বলে, তো মনে হয় না। খনার একটি বচন : 'মন দেখে ধন দেয়, দিয়া ধন দেইখা মন কাইডা নিতে কত কষ্ট।' বাবাজান সিরাজকে সব রকম বাটখামেলা হতে মুক্ত রাখ, আল্লাহপাক-এই দেয়াই করি। আর একটি অনুরোধ আর উপদেশ দিয়েই শেষ করছি। অনুরোধটি হলো, যদি কোনোদিন পাবেন তো একটি একশত বিশ দিনের মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করুন, দেখতে পাবেন রহস্যজগতে কত খেলা। কারণ মোরাকাবার ধ্যানসাধনা ছাড়া দুনিয়ার উন্নতি হতে পারে, কিন্তু আইনুল ইয়াকিনটি হবে না। আর হক্কিল ইয়াকিনের মোকামে গেলে দেখতে পাবেন যে, আপন সত্তার সঙ্গে আপন ইমানটিও ফানা হয়ে গেছে। ছবির বাঘ আর সিংহ দেখার ইমান হতে বাস্তবে বাঘ আর সিংহ দেখার মতো। আর উপদেশটি মনে রাখবেন : এই দুনিয়ার মানুষের জন্য সবচাইতে বড় ত্যাগটি আপনাকে উপহার দেবে সবচাইতে বড় শাস্তি।

ডা. ইউসুফ, তোমার ভালোবাসার গভীরতা সবাইকে অবাক করে

প্রথমেই বলতে হয় যে, তোমার পীর-ম্মা বেগম্ন রোকেয়া আল মাইজ্জভাগারীর চোখের মণি ছিলে। অনেক উচ্চ শিক্ষিত ইউরোপ-আমেরিকার বাঙালি ভক্তদের মাঝেও তোমার আসনটি ছিল সবার উপরে। এটা সবাই কমবেশি জানে। ধর্মের অনুষ্ঠানটি নিয়ে যারা মত্ত থাকে, তারা তো আমার মুরিদ কমই হয়। তবে কিছু হয়। কারণ, একটি বোবা চ্যালেঞ্জ দিয়েছি। আর সেই বোবা চ্যালেঞ্জটি হলো : আসো, বসো, মুরিদ হও অথবা শিক্ষাপ্ররূপে গ্রহণ করে আমার কথা মতো মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করে দেখো সুফিবাদ সত্য কি-না। সুফিবাদ নগদ কি বাকি এটাও বুঝতে পারবে। কথার বস্তু শিখা ভালো, তবে কথার মাঝে দর্শন হয় না, বরং অপরকে জ্বল করে আদ্বিত্যের আনন্দটি উপভোগ করা যায়। কথার মাঝে খোদা নাই আর খোদার মাঝে কথা নাই। চোখ খুলে বইপড়া বিদ্যাটি সুফিবাদ নয়, বরং চোখ বন্ধ করে মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করাই হলো সুফিবাদ। হেরা গুহার ধ্যানসাধনাটিতে আমাদেরকে এই শিক্ষাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। কেউ মানে, কেউ মানে না। কত রকম নষ্ট কথার মারপ্যাচ। মাথাটি খাইতে চায় এবং অনেকের মাথা নষ্ট করে দেয়। তবে যারা বুঝতে পারে তারাই মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটির দিকে অগ্রসর হন। তাই তো আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় একটি পঁচিশ বিঘা জমির উপর

মোরাকাবার স্কুল খুলেছি। অহংকার করে বলছি না, বরং অপ্রিয় সত্য কথাটি বলছি যে, বাংলাদেশের পরম পূজনীয় পীর-ফকিরেরা আজ পর্যন্ত একটি মোরাকাবার ধ্যানসাধনার স্কুল খোলা প্রয়োজন মনে করেন নি। তবে যারা বুঝতে পারেন, তারাই মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটির দিকে অগ্রসর হন। তাই তো তোমাদের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায় একটি পঁচিশ বিঘা জমির উপর মোরাকাবার স্কুল খুলেছি। মোরাকাবার স্কুলের প্রথম এবং প্রধান শর্তটি হলো একদম নির্জন স্থান। বর্তমানে মোলটি ঘর আছে। সবার দান হয়তো এ রকম বিষয়ে আল্লাহপাক গ্রহণ করেন না। বাবা ডা. ইউসুফ, তোমার দানটিও বুঝতে দেও না। দাতার নামফলকটি লাগাতে মানা করেছে। অথচ বই ছাপার প্রশ্নে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করার মুরিদানের বিধান অনুসারে ছবিটি দিলাম। যদিও এটাও চাও নি, কিন্তু আপন পীরের অনুরোধটি রক্ষা করেছে। আল্লাহপাক তোমাকে সর্বপ্রকার বিপদ এবং শত্রু হতে মুক্ত রাখুন।

তোমার দেশের বাড়িতে চার বার গিয়েছি। এমনকি তোমার পীর ভাই-বোনেরাও গিয়েছে। নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার মতইন ইউনিয়নের পলতি নামক গ্রামের বাড়িতে থেকেছি। তোমার বাবা শ্রদ্ধেয় চান মিয়া সাহেব দাগন ভূঞার জয়লস্কর দরবারের মুরিদ। তোমার ছোট ভাই ডা. ইব্রাহিম ও ইসমাইল আমার মুরিদ ও খলিফা। কানকির হাট,

জরতুলা, বাবুপুর, শ্রীপুর, বীরকোট এবং গাজি বাবার মাজারে গিয়েছি—
সেই স্থিতিটি কি ভুলতে পারি?

সালাউদ্দিন : পীরপূজার একটি উলঙ্গ নাম

হাফেজ সিরাজি, বু আলী শাহ কলন্দর, মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি,
শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই, বাবা বুল্লে শাহ, হজরত আমির খসরু,
আল্লামা জামি, সোমনুন মোহেব, বশরে হাফি, বাবা মটকা শাহ, হাজি
মেলান্দ শাহ বিসমিল— ঐরা যেমন পীরপূজারি, আমার প্রাণপ্রিয় বাবাজান
সালাউদ্দিনও তেমনি। একটি কথা নাই, একটিও প্রশ্ন নাই; কেবল প্রতিটি
কাজের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে পীরপূজার কথা। এইসব কথা শুনে ওহাবিদের
গরম বাতাস আরও গরম হয়ে উঠবে। কারণ সুফিবাদ ওহাবিদের দুই
চোখের বিষ। তিনদিন বয়সে ইসা নবি তথা যিশুখ্রিস্টের কথা বলার
কথাটি কত চমৎকার করে ওহাবিরা অস্বীকার করে, নীলনদের পানি ভাগ
হয়ে যাবার কথা, মহানবির মেরাজে গমন, মহানবির এলম্নে গায়েব জানা—
এইসব বিষয় কী সুন্দর যুক্তি দিয়ে তুলে ধরে, তা পড়লে অবাক হতে হয়।
ইসলামের এক অঙ্গে কত প্রকার যে তালি পরানো হয়েছে তা দেখে ও পড়ে
অবাক হই। অবাক হই এই কারণে যে, মহানবি এই জাতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি
আগেই করে গেছেন এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীটিই কি এলম্নে গায়েব জানার

একটি দলিল নয়! সূরা কাহাফটি ওহাবিদের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত। কারণ, মুসার মতো জাঁদরেল নবির ধৈর্য ধারণের অঙ্গীকার আর আল্লাহর ওলি খিজিরের এলম্বে গায়েব জানার তিনটি জ্বলন্ত প্রমাণ নিয়ে ওহাবিরা ভীষণ মুশকিলে পড়ে যায়।

এই সালাউদ্দিনকে আমি কবির বলে ডাকি। আমার ভক্ত, মুরিদ এরাও কবির ভাই বলে ডাকে। ওর বাবা সুলতান উদ্দিন এবং মাতা রায়হানা বেগম সুফিবাদে বিশ্বাসী। বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার দত্তের বাজার ইউনিয়নের পাঁচুলি গ্রামে। কবিরের জীবনটি সার্থক ও সুন্দর হোক। মোরাকাবার ধ্যানসাধনা করার সময় ও সুযোগ করে দাও, সত্যসাগরে অবগাহন করার রহমত দান করো, আল্লাহপাক।

দোহারের মোফাজ্জল

ফিতা দিয়ে যে কয়জন মুরিদের দিল মাপা যায় না এবং যে কয়জন মুরিদের পীরের প্রতি সামান্যতম সন্দেহ থাকার প্রশ্নই ওঠে না তাদেরই একজন মোফাজ্জল হোসেন। আমার জীবনে কোনো মুরিদকেই কোনো বিশেষ টাইটেল দিই নি, একমাত্র মোফাজ্জল হোসেনকে ছাড়া। সুধন বৈষ্ণব বলে ডাকি। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে দাতা কর্ণ ছিলেন বিপক্ষে। সুধন বৈষ্ণব ছিলেন নিছক একজন সাধক। দাতা কর্ণের পক্ষে যুদ্ধ করে অর্জুনের বাণে মাথা কাটা যায়। প্রতিটি রক্তফোঁটাকে মাটিতে পড়ার আগে ‘হরে কৃষ্ণ’ বলতে দেখে অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে প্রশ্ন

করেছিলেন, ‘প্রভু, কাকে হত্যা করলাম?’ ভগবান কৃষ্ণ বললেন, ‘ওরে অর্জুন, ও যে আমাতেই ফানা হয়ে গেছে। তাই তুমি নিজ হাতে বাতুনি কৃষ্ণকেই হত্যা করলে।’ এই রকম উচ্চ আসনে বসা বেশ কয়েকজন মুরিদ আছে আর তাদেরই একজন হলো মোফাজ্জল হোসেন। যারা সেজদাও করে আবার পীরের কথামতো চলে না, তারা মুরিদ বটে তবে আলো আর অন্ধকারের মতো পার্থক্য। যারা পীরের দোষ খুঁজে বেড়ায় তাদের সুফিবাদে না এসে ওহাবি হওয়াটাই ভালো। কারণ তাজিমি সেজদা ফেরত নেওয়া যায়, কিন্তু রহস্য জগতের কিছু দেখা ভক্তদের সেজদাটি চিরস্থায়ী। এলমুল একিন তথা বিশ্বাসের ইম্যান আর নিজ চোখে দেখা রহস্যলোকের দর্শন লাভ করা আইনুল একিন নামক ইম্যান এক কথা নয়। একটি ছুটে যেতে পারে আর অপরটি ছুটে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। যারা সাধক মুরিদ তাদের ইম্যান হারাবার প্রশ্নই ওঠে না। ঢাকা জেলার দোহার নামক উপজেলার নারিশা ইউনিয়নের দক্ষিণ শিমুলিয়া গ্রামের ছেলে আমার প্রাণপ্রিয় বাবাজান মোফাজ্জল হোসেন সুধন, তোমার জীবন সার্থক হোক। পীরের নামে গান লিখেও অন্ধ মুরিদ চলে যেতে পারে, কিন্তু সাধক মুরিদ কী করে যায়! কারণ চোখের দেখাটি অস্বীকার করতে পারে না।

বাবা রাফিউল আলম, কী দিব ভেবে পাই না

কেউ চমকে গেলে আর কাঁদতে পারে না। তোমার ভালোবাসায় চমকে গিয়েছিলাম। বোবার মতো চেয়ে থাকি যখন দরবারে আসো। ফারসি ভাষায় রচিত ওলিদের কাওয়ালি, লালনের মুরশিদি গান, হাসন রাজা, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, মনোমোহন, দ্বিজদাশ, জগদীশ, জিগার মুরাদাবাদি, কামার জালালবাদি, শাকিল বাদাউনি, কাতিল শাফায়ি, বেদম ওয়ারসি, আরজু শাহারানপুরি, সানজার গাজিপুরি, নাতেক, ইনশা, তাবিশ, নাজা শোলাপুরি, আনোয়ার বেহেজাজ, মীর তকি মীর, আমির মিনাই, দাগ, আশর, নাদিম, মুমিন, সাকিব, মাস্ত, গালিব, আল্লামা ইকবাল এবং আরও অনেকের সুফি সঙ্গীত, পল্টনের বাজনা আর সুফি নৃত্য ও জিকিরের মধ্য দিয়েই আমাদের ওরসের শুরু ও শেষ। যে মিলাদের অনুষ্ঠানটি আহলে সুন্নাত আল জাম্মাতের অনুসারীরা অবশ্যপালনীয় মনে করেন, উহাও আমরা করি না। কারণ আমরা কলঙ্কর। আনুষ্ঠানিকতার বিদ্রোহী অনুষ্ঠান আমাদের দরবারে হয় না। যদি কারও পছন্দ না হয় তো চলে যেতে পারে। আবার যারা সব রকম অনুষ্ঠান পালন করেন তাদেরকেও সম্মান-শ্রদ্ধা করি। সবাই একঘেয়ে গৎবাঁধা বৃত্তে অবস্থান করে না, এটাই মহান আল্লাহর সৃষ্টির নৈপুণ্য। তারাই বিরূপ মন্তব্য করবে যারা অবুঝ : জ্ঞানের প্রসারতার অভাবে অথবা নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা খান্নাসরুপী শয়তানের কুমন্ত্রণায়। শয়তান প্রতিটি মানুষের ভেতরে অবস্থান করে, অথচ

তাকে বাহিরে খোঁজে। মৃগনাভির উৎকট গন্ধ হরিণেরই ভিতরে, অথচ বাহিরে খোঁজে। যত বুদ্ধি, জ্ঞান, আর চালাকি করি না কেন, আল্লাহ হাসেন। কারণ, তিনি সবই জানেন।

বাবা রাফিউল, তোমার দেওয়া ভিডিও ক্যামেরা, টেলিভিশন, সিডি-প্লেয়ার, দামি স্পিকার আরও কত কী! দরবার হলটি বানানোর পেছনে তোমার অবদান কম নয়। তুমিই সর্বপ্রথম বলেছিলে, ‘বাবাজান, লিখে যান, কেউ পাশে থাক চাই না থাক, আমি অধম রাফিউল আছি।’ তুমি থাকো চাই না থাকো, কিন্তু অম্মন আশার বাণীটি কেবল তুমিই প্রথম শুনিয়েছ।

ধন্য হোক তোমার জীবন। সুখে থাকো স্বা, পুত্র আর বাবা-মাকে নিয়ে, এই দোয়াই করি।

আফরোজা মালিক, তুমি আর এক মা

সই সাতাশ বছর আগে, আশি সালে, চিকিৎসার জন্য এসেছিলে। ডাক্তার-রোগী সম্পর্ক ডিঙিয়ে মা আর ছেলের অবস্থান। কখন যে ভিজিট আর ঔষধের টাকার কথাটি উধাও হয়ে গেল, কেউ টেরও পাই নি। আমার পাঁচ

মেনে আর দুই ছেলেও দাদি বলে ডাকে। দেখামাত্র দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করে। ধর্মদর্শনের প্রতি দুর্বলতা আছে বলেই আনুষ্ঠানিকতার অনুষ্ঠানগুলো পালন করো। আমি কারো ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এতটুকু হাত বাড়াতো ঘণা করি। তুমি দেখতে, আমার খ্রিস্টান, হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা আমাকে ভক্তি করছে। কোনোদিন আমার লিখা বই পড়ার অনুরোধটুকু করি নি। তুমিই চেয়ে নিলে। দিলাম মারফতের গোপন কথা বইটি। পড়লে, অবাক হলে, তারপর আর একটা। এ রকম করে সবগুলো। তারপর কোরান-এর শুধুমাত্র অনুবাদ। তাও পুরো নয়। একদম হুবহু অনুবাদ, তাই অনেকবার লিখে দিয়েছি যে, এই আয়াতের অর্থটি জানা নাই। ভূমিকায় লিখেছিলাম, অন্য দশটা কোরান-এর অনুবাদ সামনে রেখে পড়ুন, দেখতে পাবেন ব্যবধানটা কতটুকু।

তারপর পড়তে দিলাম শাহ সুফি সৈয়দ সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী রচিত কোরান-এর তফসির, তিন খণ্ডে, কোরান দর্শন নামে। বললে, ‘এ তো সাগর!’ বললে, ‘অনেক ভুলের মেঘ কেটে গেল।’ একদিন কথায় কথায় বললাম যে, ‘খাজা মইনুদ্দিন চিশতি বলেছেন, মোনাম্মে গোলাম্মে গোলাম্মানে হুসায়েন তথা “ইমাম হুসায়েনের গোলাম্ম যিনি, আমি (খাজা বাবা) তারই গোলাম্ম।” খাজা বাবার এই কথাগুলো ওহাবিদের কাছে বিষ এবং শেরেক।’ অবাক হয়ে বললে, ‘কেন?’ বললাম, ‘ওহাবিরা বলবে, “আমি আল্লাহর গোলাম্ম।” শুনতে ভালোই লাগে। কারণ, এক লাফে

আল্লাহ। আল্লামা জাম্বি বলেছেন যে, “ইয়া মোহাম্মদ, আমি কেবল আপনারই গোলাম নই বরং আপনার বংশধরদেরও গোলাম।” বাসাদ কো সাদা গাশতা বেচারায় জাম্বী- গোলামে গোলামানে আলে মোহাম্মদ। ওহাবিরা চুটকি দিয়ে আল্লামা জাম্বিকে উড়িয়ে দিয়ে বলবে যে, “এই কথাগুলো ঠিক নয়, কারণ আমরা সবাই আল্লাহর গোলাম।” শুনতে ভালোই লাগে, তাই সাধারণ মানুষ এদের ফাঁদে পড়ে যায়।’

অবশেষে আমার প্রাণপ্রিয় বাবাজান শ্রদ্ধেয় আতিয়ার রহমান মালিককে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন আর পরম স্নেহের দুই ভাই আতাউস সোপান মালিক এবং আতাউর রিপন মালিক এবং দুই বোন ডা. ইসরাত মেহজাবিন মিল্কি আর মুশরাত মেহজাবিন হুদা, তোমাদেরকে আমার এই ক্ষুদ্র রচনার পাশেই রেখে দিলাম। যতকাল পাঠক বাবা ও মায়েরা বইটি পড়বে ততকাল তোমাদের পরিচয়টুকু জানুক, এটাই অধর্মের মনের বোবা তৃপ্তি।

আমার প্রাণপ্রিয় খলিফা এনায়েত হোসেন বাবাজান

আজব এক ভক্ত। আজব আচরণ। আজব চালচলন। আজব ভালোবাসা। ফিতা দিয়ে জায়গাজমি মাপা যায়, কিন্তু প্রাণপ্রিয় বাবাজান এনায়েতকে মাপা যায় না। আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের অনুসারী পরিবার-পরিজন। রূপগঞ্জ উপজেলার বিরাবো ইউনিয়নের হাটাবো গ্রামটাই আহলে হাদিস। কিন্তু আপনি সুফিবাদের অনুসারী এবং উচ্চ শিক্ষিত। কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে ব্যবসায়ে নেমেছেন এবং বৈষয়িক উন্নতির একটি মর্যাদাকর অবস্থানে আছেন। কোরান-এর প্রথম খণ্ডের প্রকাশে বেশিরভাগ টাকা আপনিই দিয়েছেন। অবশ্য বইতে দান, গুরুর বাড়ির উঠানটি বড় করতে প্রায় তিন লক্ষ টাকা দান করেছেন, অথচ কেউ জানে না। আমি বিবেকের ধাক্কায় কৃতজ্ঞতাটুকু জানালাম। আপনার দেশের বাড়িতে এক দিন এক রাত থেকেছি এবং যথেষ্ট আপ্যায়ন করেছেন। যত সুন্দর নকশি করা সিরামিকের দামি বাসনই হোক না কেন, যদি অপরিষ্কার অবস্থায় থাকে তো পরিষ্কার করেই খাদ্য পরিবেশন করা হয়। কারণ অপরিষ্কার বাসনে কেউ খাদ্য পরিবেশন করে না। তেমনি আল্লাহপাক দিলের বাসনটি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত রহমত ঢেলে দেন না, তা বাসনটি যত সুন্দর আর দামি হোক না কেন। সুন্নতি লেবাস আর যত প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানই পালন করুক না কেন, যদি দিলের বাসনটি অপরিষ্কার থাকে তো আল্লাহপাকও রহমত ঢালেন না। কারণ হৃদয়ের বাসনটি অপরিষ্কার এবং অপরিষ্কার বাসনে বান্ধাও খাদ্য রাখতে চায় না তো আল্লাহ কী করে অপরিষ্কার

দিলের বাসনে রহমত ঢালবেন? সেই জন্যই আল্লাহ কেবল নিয়তটাই দেখেন, উপরের চেহারা-সুরত যত সুন্দরই হোক না কেন। সালমান ফারসি বর্ণিত বুখারি শরিফ-এর প্রথম হাদিসটি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহপাকের দরবারে অধমের এই ফরিয়াদটুকু রইল যে, বাবা এনায়েত হোসেনকে বিপদমুক্ত, শত্রুমুক্ত, উন্নত একটি মর্যাদাকর অবস্থানে অধিষ্ঠিত করুন।

বাঞ্ছারামপুরের প্রাণপ্রিয় দুই খলিফা জামালউদ্দিন আর মাদনউদ্দিন

আম্মার চোখে দুইটি নাম যেন দুইটি ফুল। সহসা কয়েক বছর আগে বাড়িতে দেখা করতে এলেন। বললাম, ‘কী করতে পারি?’ বললেন, ‘আপনার বই ছাপার জন্য কিছু টাকা দান করতে এসেছি।’ কথা হলো বেশ কিছুক্ষণ। অনেক প্রশ্ন, অনেক উত্তর। এভাবে কিছুদিন আসা-যাওয়া। তারপর মুরিদ এবং পরে খলিফা। চমৎকার মানুষ। চমৎকার হৃদয়। নিম্নমধ্যবিত্ত, কিন্তু হৃদয় উচ্চবিত্ত। একদিন আম্মাকে চমকিয়ে দিয়ে বলে ফেললেন যে, বাড়ির চারতলাটা আম্মরা করে দেব, কারণ ভক্তের থাকার স্থান হয় না। আল্লাহ, তোমার দরবারে অধমের ফরিয়াদ : বিত্তবৈভব,

বিপদমুক্ত-শত্রুমুক্ত জীবন রহস্যরূপে দান করো। অধম তোমার ওলি হতে পেরেছি কি-না তা তুমিই জানো। তোমার দরবারে ওলির ফরিয়াদ ফিরে যায় না যেমন, অভিশাপও ফেরত যায় না। জোর করে বাড়ির জায়গা দখল করেছে। চেয়ে দেখেছি, কিন্তু কিছু বলি নি। আড়াইশত বছরের একমাত্র বাড়ির রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, তাতেও কিছু বলি নি। জরুরি অবস্থার সময়ে সেনা ক্যাম্পে সামান্য একটি অভিযোগও করি নি। কারণ কুমিরের ডিম দিয়ে হাঁস বাহির হয় না, যদিও উপাদান একই।

জীবনযুদ্ধে যত কষ্টই হোক, কিন্তু হারব না-র নামটি নওগাঁর জমাদার খান সাহেবের পুত্র মহসিন আলী খান- আম্মারই এক অবাক করা খলিফা

কত কষ্ট, কত যাতনা, কতো জীবনযুদ্ধে মানুষের মতো বেঁচে থাকার সংগ্রাম আর ধৈর্য নিয়ে একটি সার্থক সফল মানুষ হয়েছে, তা যদি কেউ জানে তো বলবে, এটাও কি সম্ভব! একদিকে উচ্চশিক্ষিত, অপরদিকে গুরুর প্রতি ভক্তি এবং গুরুর বাণীগুলো সমাজের বুকে কেমন করে প্রচার করা ও তুলে ধরা যায় তারই একটি স্থায়ী পরিকল্পনার নকশা বিজ্ঞাপনের আকারে ভক্তদের হাতে তুলে দিয়েছ। সবাই অবাক হয়েছে তোমার এই পরিকল্পনাটি পড়ে এবং সমর্থন দিয়েছে। তবে বাস্তবে কতটুকু সফলতা পাবে তা পরে বোঝা যাবে। তবে আশার একটি আলো কমবেশি সবার চোখেই ফুটে উঠেছে।

লিখনীর চলমান গতি অনেক সময় হেঁচট খায়। লিখকের লেখার উৎসাহটির মাঝে ভাটা পড়তে চায় : কিছু তুমি, মহসিন বাবাজান, আমার লিখনীতে উৎসাহ যুগিয়েছ সব সময়। বলেছ : লিখে যান, ফারসি ভাষায় রচিত পুরনো দিনের গুলিদের দিওয়ানগুলোর অনুবাদ— প্রয়োজনে মূল ও উচ্চারণ এবং অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ। বাংলাদেশের বড় বড় পীর-ফকিরদের দরবার এই কাজগুলো করার দরকার মনে করে নি, কিছু আমরা মনে করি বলেই আপনি লিখে যান। হতাশ হবার কিছু নাই। আজ হোক আর দু’দিন পরে হোক, আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ছাপাতে পারব। বাবা মহসিন, তোমার কথাগুলো যে বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত হচ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তুমিই বলেছ, ‘বাবা, আপনি এবং আপনার পুত্র কন্যারাও যদি একটি বই নিতে চায় তো মূল্য দিতে হবে।’ এবং তোমার এই কথা আজ সবাই অক্লরে অক্লরে পালন করে চলছে। তুমি একটা কথা বলতে— বলতে, ‘ধনী হতে হলে একটু না একটু ধূর্ত হতে হয়। তা সেই ধূর্তামিটা ভদ্রই হোক আর নোংরাই হোক। তাই ধনী মুরিদদের আশায় বুক না বেঁধে আমরা গরিব মুরিদরাই একত্র হয়ে একটি কমিটি করে এগিয়ে যাব।’ আর সেই এগিয়ে যাবার সফলতাটুকুর আলো একটু হলেও দেখতে পাচ্ছি। আর এ সব কিছুর মূলেই তো তুমি, বাবাজান মহসিন। আর তোমার পেছনে উৎসাহ দিচ্ছে তোমারই স্ত্রী, ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী, পাবনার শালগারিয়ার জাকির হোসেনের কন্যা ফাতেমা আক্তার লিজা।

বৈষয়িক স্বার্থটা মানুষকে অনেক সময় পশুর চেয়েও খারাপ করে।

প্রচুর আছে, কিছু আরও চাই। এই ‘আরও চাই’ নামক নেশাটা মরণনেশার চেয়েও ভয়ঙ্কর দানবীয় নেশা। মানুষের বুকের উপর দিয়ে হেঁটে চলে

এই নেশা। কোরান-এর সূরা তাকাসুর পড়লেই কিছুটা বোঝা যায়। তাই ওলিরা বলেন যে, তোমার চাহিদাগুলো তুমি যত ছোট করতে পারবে, তত সুখী হতে পারবে।

হজরত বাবা শরফুদ্দিন বু আলি শাহ কলন্ডর পানিপথির ফারসি ভাষায়
রচিত দিওয়ান হতে সামান্য কিছু অংশ তুলে ধরলাম

তুলে ধরলাম এ জন্যই যে এই বিশাল দিওয়ান-টির মূল ফারসি ভাষা, বাংলায় উচ্চারণ এবং অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে গেলে বিরাট তথা চারপ্তন বইটির আকার ধারণ করে এবং ইঁহা ছাপাতে গেলে অর্থের প্রয়োজন হয় এবং এই দিওয়ান-টি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে বই আকারে প্রকাশ করলে ওহাবিদের চিন্তাধারার ওপর একটি প্রচণ্ড আঘাত আসবে। তাই যারা সুফিবাদে বিশ্বাসী তথা ফকিরি লাইনের অনুসারী তাদের কাছে অনুরোধ করে গেলাম, তারা যদি আর্থিক সাহায্য এবং কোরবানির পশুর চামড়াটি বিক্রির টাকা দান করেন তা হলে আমরা একে একে দিওয়ান-এ আমির খসরু, দিওয়ান-এ শামসেতাব্রিজ, দিওয়ান-এ কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি ইত্যাদি মহামূল্যবান গ্রন্থগুলো বাংলায়

অনুবাদ করে প্রচার করার আশা রাখি।

হাস্তে দার সিনায়ে মা জলু জানানায়ে মা

বুত পরম্বলম দিল মাসাত সানাম খানায়ে মা।

আম্মার বুক আম্মার মাগুকের নূরে ভরপুর। বুত পরম্বলম তথা আমি কেবলই
পীরপূজা করি। কেননা আম্মার হৃদয়টি হলো, তথা অন্তরটি হলো,
পীরপূজার সনমখানা।

গুফতে উখানদা জানানো গারিয়া চুঁ কারদাম বদরশ

বু আলী হাস্তে মাগার আশিকে দিওয়ানায়ে মা।

যখন আমি মাগুকের দরজায় লুটিয়ে পড়লাম তখনই আম্মার মাগুক
বললেন : বু আলী আম্মারই প্রেমিক, আম্মারই দিওয়ানা।

আযানে সারি কে বাহ্ মাহবুব দারম

খাবার না'বুদ কেরামান কাতিবিন রা।

মি নাগানজাদ বু আলী হারগিজ খোদা আন্দার খুদি

তু হামি খোদাই বারি দার কাবায়ে বাজ আসনামোরা।

আমি ও আম্মার মাগুকের মাঝে যে গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে উহা
কেরামান কাতেবিনও জানে না।

হে বু আলী, খোদাকে খুদির মাঝে কখনও সম্পূর্ণ ধরে রাখা যায় না, তাই
তো খুদিকে পুনরায় কাবার দিকে নিয়ে যেতে চায়।

কলন্দর বু আলী আজাদে গাশ্তাম

নাদানাম রুসম্বেও রাহ কুফুর দীনেরা।

ধর্ম ও কুফুরির মত ও পথের আমার আর কোনো দরকার নাই, যখন বু
আলী কলন্দর মুক্তি পেল।

যারা আমাদের প্রকাশনার জন্য সাহায্য করতে চান

তাদের জন্য বলছি

যদি আপনারা মনে করেন যে, সুফিবাদের উপর রচিত বইগুলোর ব্যাপক
প্রচারের প্রয়োজন এবং সুফিবাদই দিতে পারে অস্থির জীবনে একটি আত্মার
শান্তি, তা হলে আপনারা আমাদেরকে আর্থিক সাহায্য করতে পারেন। সেই
সাহায্যটি যদি কোরবানির চামড়ার দাম্পটি হয় তা হলে আমরা আরও
এগিয়ে যেতে পারব। কোরবানির চামড়াটি আপনার জন্য যেমন নাজায়েজ,
সে রকম আমাদের জন্য ডবল নাজায়েজ। কিন্তু আপনাদের ছোট ছোট
দানে আমরা আরও প্রচার করতে পারব। আমরা ইতিমধ্যেই আখাউডায়
অবস্থিত কল্যাণ শহরের মাজারের ওরস শরিফে এক হাজার বই বিনামূল্যে
বিতরণ করেছি। আমার ছোট ছেলে বেদম ওয়ারসিকে অনেকেই বইয়ের
দাম্প দিতে চেয়েছেন, কিন্তু দাম্প না নিয়ে আর্থিক সাহায্য করার আবেদন
জানিয়েছে। বেদম ওয়ারসি বাংলাদেশের অনেক মাজার জেয়ারত করতে
যায়। আমার কিছু ভক্ত সঙ্গে নিয়ে বইয়ের বোঝা নিজেরাই বহন করে
মতলবের বেলতলিতে অবস্থিত হজরত বাবা সোলায়মান শাহ আবদুল
মাজার, বাস্তারামপুরে অবস্থিত হজরত বাবা রাহাত আল্লা শাহের মাজার,
হজরত বাবা গণি শাহের মাজার, নবীনগরের দুবাচাইলের জিন্দা ওলি
হজরত বাবা মোখলেস শাহ, শানিগরের ফলকটির বাবা আবদুল শাহ,
সিরাজদিখানের নিজামউদ্দিন মস্তান (নিমচান শাহ), বাবা চান মস্তান,
ভাওরভিটির জন ফকিরের মাজার, বাঘাইরের জিওন ফকির, ভাগনার
জবার ফকির, দাগভণ্ডার শাহা পার চিশতি নিজামা, সেনবাগের গাজী
বাবার মাজার, রাইপুরার মিসকিন শাহ, মারেরগরার আমানটলি
দরবার, বগুড়ার মহাস্তানগড়, জয়পুরহাটের কালাই থানায় অবস্থিত বাবা
গফর শাহ চিশতি, কৈতলালের শাহ জামালের মাজার, কক্টিয়ার লালন
শাহ, পাঞ্জ শাহ, খোদা বকশ, মতীন শাহ, দুদু শাহ, রাজশাহীর বাবা শাহ
মখদুম, বাঘার বাবা দানেশমন্ড, চাপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদের বাবা

নিয়ামত শাহের মাজার, কাহালুর বাবা কালু শাহ, নরসিংদীর বাবা কবুল শাহ, বাবা দেওয়ান শরিফ, বাবা পেশোয়ারী, বাবা ইউসুফ চিশতি, বাবা কফিল উদ্দিন শাহ, মনোহরদীর বাবা মোজাফ্ফর মস্তান (পাগলা মৌলবি), বেলাবোর বাবা শাহ ইরানীর মাজার, কলিয়ার চরের বাবা আব আলী আখতার শাহ কলন্দর, ভৈরবের কালিকাসাহেব বাবা সিরাজ মস্তান, শিবপুরের গরিবলাহ কারী, বরমার রাজামাটির গরিবলাহ শাহ সিরাজী, টঙ্গীর পাগারের বাবা হায়দার শাহ, বারইচাঁর বল্লবল শাহ, শিবপুর থানা সংলগ্ন বাবা নিধমিয়া শাহ, নরসিংদীর লক্খাটের কাছেই পাগলা মৌলবির মাজার, আড়াইহাজারের বেনজীর হক চিশতি, পটিয়াখালীর কলাপাড়ার নিশানবাড়িয়া দরবার শরিফ, নরুলাপুরের সমাল ফকির, বাহুমাড়ার দাগন শিকদার, বাস্তার পিরানি ফকির, গুজাপুরের বাকী মৌলবি, বিটকার কসের শাহ, জিন্দা শাহ, রশীদ শাহ, বাহুমাড়ার আফা পাগলা, মানতার কান পরামানিক, বজারনগরের পাট ফকির, ককরাটার তবির রহমান, আলালপুরের বাবা সালাম ফকির, সাতকানিয়ার মাজাখিল দরবার শরিফ, কাকুন নগর দরবার শরিফ, কয়ারশাহী দরবার শরিফ, আড়লিয়াপুরের বাবা কালু শাহ দেওয়ান, আমতলীর কতবপুর দরবার শরিফ, পটিয়াখালীর হক দরবার শরিফ, মাজাপুরের গোড়াই খানকা শরিফ, কিশোরগঞ্জের বাড়তি শরিফ, বগুড়ার তনতনিয়া দরবার শরিফ, পটিয়ার আমীর ভাণ্ডার শরিফ, কমিলার দুরুল আমান দরবার শরিফ, সিরাজগঞ্জের ওয়ারসি দরবার শরিফ, সিরাজদিখানের দরবারে শাহী কুদ্দুসী— এভাবে বহু পীর সাহেবদের মাজারে ওরসের সময় বিনামূল্যে বহু বিতরণ করে চলায়। যারা কেবলমাত্র ফকিরি লাইনের তাদের হাতেই তলে দিচ্ছিল। এভাবে সারা বাংলাদেশে বহু বিতরণ করতে গেলে কত বইয়ের প্রয়োজন তা আপনারা ভালো করেই বুঝতে পারেন। ফকিরদের কথা ফকিরেরাই বোঝে, অন্যরা হাঙ্গামে। তাই ফকিরি লাইনে যারা বিশ্বাসী এবং শুদ্ধ যদি মনে করেন যে, বইগুলোর প্রচার হওয়া প্রয়োজন তা হলে কি কিছু দান, কিছু খয়রাতি চাইবার সামান্য অধিকারটি দাবি করতে পারি না? এতগুলো কথা বলার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, যার যার বিবেকের উপর একটি হাল্কা বোঝার দায়িত্ব মনে করিয়ে দেওয়া।

শাহ সুফি লকবপ্রাপ্তদের নামের তালিকা

সর্বনিম্ন একটানা চার মাস যারা মোরাকাবার ধ্যানসাধনা করেছেন তাদের প্রত্যেকের নামের আগে শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা এবং নামের শেষে আল-সুরেশ্বরী লকব দেওয়া হয়েছে।

১. শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা আজম শাহ আল-সুরেশ্বরী, পিতা-ইউসুফ আলী, গোয়াল চামট বাসস্ট্যান্ড, ফরিদপুর। ২. সৈয়দ তারিক, পিতা-সৈয়দ ওয়ারিস হোসেন, ১৭১, উত্তর বাড়ডা, ঢাকা। ৩. ময়েজ উদ্দিন মো. আবদুর রশিদী, পিতা-আবদুল হাই, পশ্চিম ঘাটলা, বড়বাড়ি, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। ৪. ডা. মোহাম্মদ আলী, পিতা-ফজর আলী মোল্লা, নিজুরী, রডাইত বাজার, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ৫. আনোয়ার মুন্সি, ডোলারহাট, চাপাই নবাবগঞ্জ। ৬. শাহ আলম মোল্লা রিপন, পিতা-আবু হোসেন মোল্লা, সদর রোড, জয়পুরহাট। ৭. খোরশেদ আলম, পিতা-ইয়াকুব আলী খান, রাজামেহার, দেবীদ্বার, কুমিল্লা। ৮. কারী মো. সুলতান ওয়াদুদ, পিতা-শেরের উদ্দিন চিশতী, মেজভালাম, পবা, রাজশাহী। ৯. আলী হোসেন, পিতা-হাফেজ আলী বেপারী, পূর্ব লালপুর, কালীপুর বাজার, মতলব, টাঁদপুর। ১০. আবদুল গণি মাতব্বর, পিতা-গগন মাতব্বর, খাম্মারপাড়া, বান্দবদৌলতপুর, মাদারীপুর। ১১. আবদুল কুদ্দুস কারী, পিতা-আজমত আলী, মোয়াইল, বোনকুয়া,

ভালুকা, ময়মনসিংহ। ১২. ইয়াকুব আলী শেখ, পিতা-ইউনুস আলী শেখ, বগাজান, বড়াইত, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ১৩. জাহিদুল ইসলাম, পিতা-নুরুল ইসলাম, মেজডালা, পবা, রাজশাহী। ১৪. মাওলানা কাজি আফহার উদ্দিন, পিতা-কাজি বদরউদ্দিন, চাকুলিয়া, নগরকুণ্ডা, সাভার, ঢাকা। ১৫. ইসহাক মিয়া, পিতা-আবদুর রাজ্জাক মিয়া, বাউশিয়া, বাউশিয়া বাজার, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ। ১৬. মাওলানা আবুল বাশার, পিতা-আবদুল কুদ্দুস, কালিয়ার ভান্ডা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ। ১৭. মমতাজ মাস্টার, পিতা-হাজি মিয়াজান আলী, দুগাচী, দরগাতলা হাট, জয়পুরহাট। ১৮. আবুল হোসেন, পিতা-নিজাম উদ্দিন মৌল্লা, বিদুপাড়া, রামেশ্বরপুর, বগুড়া। ১৯. নজরুল ইসলাম, ডোলারহাট, টাঙ্গাইল নবাবগঞ্জ। ২০. আতাউর রহমান, পিতা-সেফাতুল্লাহ প্রামাণিক, বালুবাজার, মান্দা, নওগাঁ। ২১. মোমেনজা খাতুন, পিতা-ওয়াহিদ উদ্দিন মণ্ডল, দুগাচী, দরগাতলা, জয়পুরহাট। ২২. জুলহক আলী, পিতা-হাজি আবদুস সাত্তার মণ্ডল, আঁচলগাতি, পূর্ব বংকিরাট, লাহিড়ী মোহনপুর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। ২৩. নজিবুর রহমান, পিতা-ইসা মাস্টার, কাহালুবাজার, কাহালু, বগুড়া। ২৪. মাওলানা আনোয়ার হোসেন, পিতা-মাফেল হাওলাদার, চরপুরসন্ধি, বাগদি, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ। ২৫. আবদুল খালেক, পিতা-মো. ইসহাক সর্দার, চরপুকুরিয়া, উদয়কাঠী, পিরোজপুর। ২৬. মো. শাহীনুর আহমদ চৌধুরী,

পিতা-সারাজ চৌধুরী, শ্মশানঘাট রোড, হবিগঞ্জ। ২৭. মো. মঈনউদ্দিন
 খান, পিতা-মো. সিরাজ খান, কালিয়ারভাঙ্গা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ। ২৮.
 শ্রী প্রকাশ চন্দ্র রায়, পিতা-জ্যেষ্ঠ নাথ রায়, গোহারা, ছাতনী,
 হাকিমপুর, দিনাজপুর। ২৯. মোহাম্মদ আলী, পিতা-মো. আইউব আলী,
 হাকিমপুর, হাজিপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। ৩০. বসিরউদ্দিন, পিতা-
 আবদুল লতিফ মিয়া, বারঘরটোলা, জিনজিরা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৩১.
 শাহজাহান, পিতা-গোলাম মোস্তফা, মধ্য আংগার পাড়া, রামগঞ্জ,
 লক্ষ্মীপুর। ৩২. মো. কবির হোসেন, পিতা-আবদুল লতিফ, শারশিয়া,
 কচুয়া, সফিপুর, টাঙ্গাইল। ৩৩. আশরাফুল হক, পিতা- আবদুল ছেয়াদ,
 বাগপুর, বড় বিল, গঙ্গাচড়া, রংপুর। ৩৪. এনামুল হক, পিতা-হাবিবুর
 রহমান, বীরপাল্লা, মুরাইল, কাহালু, বগুড়া। ৩৫. কামাল উদ্দিন
 আপেল, পিতা-কলিম উদ্দিন সরকার, মাচাবান্দা, চিলমারী, কুড়িগ্রাম।
 ৩৬. ডা. ইব্রাহিম ইবনে নুর, পিতা-আলী নুরে হসাইন, বলিয়া,
 হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর। ৩৭. আবুল কালাম আজাদ, পিতা-আলিম উদ্দিন
 মণ্ডল, সুলতানপুর, পীরগঞ্জ, নাটোর। ৩৮. মমতাজ উদ্দিন সরদার,
 পিতা- আছের আলী, বালুবাঙ্গার, মান্দা, নওগাঁ। ৩৯. মাওলানা হারুন
 অর রশীদ (ডবল টাইটেল), পিতা- আবুল হারেজ মিয়া, আশেক মঞ্জিল,
 শরিফাবাদ, ঘারুয়া, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।